অদৃষ্ট-চক্র

উপন্যাস

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

প্রণীত।

উইলকিন্স মেসিন প্রেস—কলিকাতা।

১৩২০

২০১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরি হইতে

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

উইলকিন্স মেশিন প্রেসে

কে এন বসুর দ্বারা মুদ্রিত।

উপক্রমণিকা।

দর্শন।

উপক্রমণিকা।

কে সে?

ভাদ্রের গঙ্গা; অঙ্গে পরিপূর্ণ যৌবনের ললিত লাবণ্য ঢল ঢল করিতেছে। নদীমধ্যে বালুকায় গঠিত চর ডুবিয়া গিয়াছে; দুই কূলে বিস্তৃত সৈকতের অর্দ্ধাংশের অধিক জলতলে। ভাগীরথী যেন পূর্ব্বের বিস্তৃতি ফিরিয়া পাইয়াছে। পূর্ব্বকূলে গ্রাম; এককালে জনাকীর্ণ ও সমৃদ্ধিশালী ছিল; এখন হৃতসম্পদ, গতগৌরব। বাঙ্গালার সর্ব্বত্রই পল্লীগ্রামের এই দশা; নগর-দানবের সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা তৃপ্তির জন্য গ্রামবাসীরা সুখশান্তিময় পল্লীবাস ছাড়িয়া কর্ম্মকোলাহলবহুল নগরে গিয়াছে। গ্রামের উচ্চ সৌধচূড়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে; গৃহাগ্রে কাশতৃণ জন্মিতেছে; জনহীন গৃহে শৃগাল কুক্কুর-বিষধর আশ্রয় পাইয়াছে; পুণ্যকামীর পুণ্যকীর্ত্তি সরোবর শৈবালসমাচ্ছন্ন; দেবমন্দিরের জীর্ণসংস্কার হয় না; বাঁধা ঘাটে ইষ্টক খসিতেছে, ইষ্টকের মধ্যে মধ্যে বৃক্ষ জন্মিতেছে। যাহারা ধনে, বিদ্যায়, গুণে প্রধান—তাহারা গ্রাম ত্যাগ করিয়া গিয়াছে। গ্রামের উন্নতি হইবে কিরূপে? নদীপথে গতায়াতে নৌকা হইতে দেখিলে ইচ্ছাপুর পরিত্যক্ত পল্লী বলিয়াই মনে হয়; কেবল ঘনপল্লব বৃক্ষরাজির মধ্যে মধ্যে দুই একটি গৃহ ইহার পূর্ব্বগৌরবের সাক্ষ্য দিতেছে। গ্রামের অবস্থা যেমন, নদীর অবস্থাও তেমনই। পূর্ব্বে গ্রাম

নদীতীরে ছিল ; এখন নদী বহুদূর সরিয়া গিয়াছে। বর্ষার পর হইতে জল সরিতে আরম্ভ হয় ; তখন গ্রাম হইতে প্রায় এক পোয়া পথ বালুকাকীর্ণ তীরভূমি অতিক্রম করিয়া জলে আসিতে হয়, নদীর মধ্যভাগেও চড়া পড়িয়াছে।

এখন ভাদ্রের নদী ; কূলে কূলে ভরা। তাই জল আবার গ্রামের নিকটে আসিয়াছে। শিবমন্দির হইতে যে সোপানশ্রেণী পূর্ব্বে জলে নামিয়া গিয়াছিল, এখন বৎসরের অধিকাংশ সময় তাহার ও নদীর মধ্যে যে দীর্ঘ ব্যবধান থাকে, এই সময় তাহা কমিয়া আসিয়াছে।

অপরাহ্ণ ; কিন্তু সায়াহ্নের বিলম্ব আছে ; তাই এখনও স্নানের ঘাটে জনতা নাই। নদীবক্ষে ধীবরগণ নৌকা বাহিয়া মৎস্য সংগ্রহ করিতেছে ; নৌকায় দাঁড়াইয়া জাল ছড়াইয়া ফেলিতেছে, যখন গুটাইয়া তুলিতেছে, তখন জালে রজতধবল মৎস্যগুলি মুক্তিলাভের চেষ্টায় দারুণ চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতেছে। সেগুলিকে নৌকার খোলে ফেলিয়া ধীবরগণ আবার কিছুদূর অগ্রসর হইয়া জাল ফেলিতেছে। আকাশে লঘু মেঘ ভাসিয়া যাইতেছে ; কেহ ধূসরাভ শ্বেত, কেহ কুন্দশুভ্র। দুই একটি মাছরাঙ্গা আহার-সন্ধানে জলে ডুব দিতেছে, যেবার মৎস্য ধরিতে পারিতেছে সেবার উড়িয়া যাইয়া বৃক্ষশাখায় বসিয়া আহার্য্য আত্মসাৎ করিতেছে ; তাহাদের বর্ণবৈচিত্র্যমনোরম দেহ রবিকরে সমুজ্জ্বল দেখাইতেছে। মধ্যে মধ্যে এক এক দল জলচর বিহগ গগনে উড়িয়া যাইতেছে ; রবিকরদীপ্ত নদীজলে

তাহাদের ছায়া পড়িতেছে; পবনে তাহাদের পক্ষাঘাতশব্দ দূরাগত ঝটিকাগর্জ্জনের মত শুনাইতেছে।

গ্রামের স্নানের ঘাটে জনতা নাই; এখনও ঘাট রমণীমণ্ডলীর কথায় ও কলহাস্যে গুঞ্জনমুখর মধুচক্রের মত হয় নাই। ঘাটে কেবল দুইজন রমণী। প্রথমা ষোড়শী, দ্বিতীয়ার বয়স দ্বাদশের অধিক হইবে না। প্রথমা ঘাটে স্নানার্থীদিগের সুবিধার জন্য রক্ষিত বৃহৎ কাষ্ঠখণ্ডের উপর অলক্তকরাগরেখাঙ্কিত দক্ষিণ চরণ তুলিয়া গাত্রমার্জ্জনী দিয়া মার্জ্জিত করিতেছিলেন। দ্বিতীয়া একটু অধিক জলে গিয়াছিল। সে কিছুক্ষণ আগ্রীব জলমগ্ন থাকিয়া সন্তরণের আয়োজন করিতেছিল। সে কেবল জলের উপর পদ্মাভ দেহ ভাসাইয়া প্রসারিত করে জল সঞ্চালিত করিয়াছে, এমন সময়ে প্রথমা বলিলেন, "সরোজা, আবার সাঁতার দিতেছিস্?"

বালিকা বলিল, "দিদি, তোমার বড় ভয়।"

"তোমার আর সাহস দেখাইয়া কায নাই। ভাদ্রের নদী। এই স্রোতের টানে কি কখনও সাঁতার দিতে আছে?"

বালিকা ফিরিয়া আসিল।

নদীর মধ্যভাগে একখানি লালডিঙ্গি উজান বাহিয়া যাইতেছিল। দাঁড়ীরা সবেগে দাঁড় টানিতেছিল; নৌকা নদীর উজান স্রোত অবহেলা করিয়া দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছিল। নৌকার আরোহী চারিজন যুবক; তিন জন সমবয়স্ক—বয়স ঊনবিংশ হইতে একবিংশের মধ্যে, কেবল একজনের বয়স সপ্তবিংশ বা

অষ্টাবিংশ হইবে। যাহার বয়স অপেক্ষাকৃত অধিক সে কিছু গম্ভীর। কিন্তু সে গাম্ভীর্য্য যে কৃত্রিম তাহা একটু চেষ্টা করিলেই বুঝা যায়। সে সঙ্গীদিগের "মুরুব্বির" পদ লইতেছিল; অত্যন্ত চলিত কথা—অতি সাধারণ মত—এমন গম্ভীর ভাবে ব্যক্ত করিতেছিল, যে সহসা মনে হয়, যেন লোকটা প্রকৃতই সূক্ষ্ম-পর্য্যবেক্ষণশক্তিসম্পন্ন দার্শনিক; তাহার কথিত মত যেন একান্তই মৌলিক। সে আপনার অল্প বিদ্যাকে প্রচুর দেখাইবার কৌশলে অভ্যস্ত।

নৌকামধ্যে যুবকগণ ঘাটে রমণীদ্বয়কে দেখিল। একজন বলিল, "দেখ, কি সুন্দরী!"

আর একজন দাঁড়ীদিগকে নৌকার বেগ হ্রাস করিতে বলিল। দ্রুতগতি নৌকা মন্দগতি হইল।

বালিকা পূর্ব্ব হইতেই নৌকা দেখিতেছিল। যুবতী চরণ-মার্জ্জন শেষ করিয়া ফিরিয়া নৌকা দেখিতে পাইলেন।

তিনি দেখিলেন, নৌকা হইতে যুবকগণ তাঁহাদিগের দিকে চাহিয়া আছে। তিনি একবার তাহাদিগের দিকে চাহিলেন। তাঁহার মুখে বিরক্তি ও বিস্ময় সপ্রকাশ হইল। তখন দুই ভগিনীর মুখে অপরাহ্নের রশ্মিকর পড়িয়াছে। নৌকাযাত্রী যুবকদিগের নয়নে উভয়ের মূর্ত্তি সমুজ্জ্বল সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

যুবতী ত্রস্তে কবরীর উপর অবগুণ্ঠন তুলিয়া দিলেন, বালিকাকে বলিলেন, "সরোজা, বাড়ী চল।"

বালিকা ফিরিয়া দাঁড়াইল; রবিকরে তাহার প্রচুর কেশ-মধ্যস্থ স্বর্ণাম্বরাবৃত প্রসাধনী ঝক্‌ঝক্‌ করিতে লাগিল। সে বিস্মিত ভাবে জ্যেষ্ঠাকে বলিল, "সে কি? তুমি যে জলে নাম নাই!"

"দেখিতেছিস না, নৌকা হইতে কতকগুলি ছোক্‌রা আমাদিগকে দেখিতেছে?"

বালিকা সরল ভাবে বলিল, "দেখিলই বা?"

যুবতী দৃঢ় স্বরে বলিলেন, "না।"

তিনি গৃহাভিমুখগামী হইলেন। বালিকা তাঁহার অনুসরণ করিল। সিক্ত বসন তাহার অঙ্গে জড়াইয়া রহিল। তাঁহারা যখন সৈকত অতিক্রম করিয়া যাইতে লাগিলেন, তখন নৌকা-মধ্যে অপেক্ষাকৃত অধিকবয়স্ক যুবক বলিল, "এইরূপ চলন দেখিয়াই কালিদাস সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতিকার সহিত উমার তুলনা করিয়াছিলেন।"

যুবকদিগের মধ্যে এক জন বলিল, "এই দুইজনের মধ্যে কে অধিক সুন্দরী?"

আর এক জন বলিল, "বালিকা।"

"কেন?"

"যে ফুল ফুটিয়াছে তাহার আর গৌরব কি? যে ফুটিবে তাহারই আদর অধিক।"

"যে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহারই গৌরব। যে ফুটিবে তাহার পথ ত বিঘ্নবহুল।"

"কিন্তু সে-ই ত স্পৃহণীয়।"

অপেক্ষাকৃত অধিকবয়স্ক যুবক এতক্ষণ রমণীদ্বয়ের দিকে চাহিয়া ছিল, এখন গম্ভীর ভাবে বলিল, "কিন্তু বালিকার কথাতেই কালিদাস বলিয়াছেন, ঃ—

'অনাঘ্রাতং পুষ্পং কিসলয়ম লুনং কররুহৈ
রনাবিদ্ধং রত্নং মধু নবমনাস্বাদিতরসম্।
অখণ্ডং পুণ্যানাং ফলমিব চ তদ্রূপমনঘং
ন জানে ভোক্তারং কমিহ সমুপস্থাস্যতিবিধিঃ॥' *

কি বলেন, যতীশ বাবু?"

যে যুবক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইল, তাহার বয়স ঊনবিংশ বৎসর অতিক্রম করে নাই। সে একটু হাসিল। তাহার ভাবে বোধ হয়, সে স্বভাবতঃ একটু লাজুক; এই সকল প্রগল্ভ ও উচ্ছৃঙ্খল যুবকদিগের সংসর্গে পড়িয়াও এখনও স্বভাবিক লজ্জা-শীলতা পরিত্যাগ করিতে পারে নাই।

একজন যুবক বলিল, "অমূল্য বাবুর সংস্কৃত সাহিত্যটি ভাল-রূপই পাঠ করা আছে।"

---

* এই অনবদ্যদেহ অনাঘ্রাত কুসুম, নখরে অচ্ছিন্ন কিশলয়, অনাবিদ্ধ রত্ন, অনাস্বাদিতরস নব মধু, পুণ্যের পূর্ণ পুরস্কার—জানি না কে ইহা ভোগ করিতে পাইবে?

অমূল্যচরণের অভিমান তৃপ্ত হইল। সে বলিল, "এক কালে কেবল সংস্কৃত সাহিত্যেরই আলোচনা করিয়াছিলাম; এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সাহিত্য আর নাই।" অমূল্যচরণ এমন ভাবে এ কথাটা বলিল যেন জগতের সকল সাহিত্যের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। বাস্তবিক তাহার পরিচয় আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠ, সংস্কৃতের সহিত অল্প, ইংরাজীর সহিত নগণ্য। অন্য কোন সাহিত্যের সহিত তাহার কোন রূপ পরিচয় নাই। অপরের নিকট হইতে সংগৃহীত মতকে মৌলিকতার আবরণ দিতে তাহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল।

যে যুবক তর্কে যুবতীর সৌন্দর্য্যের প্রাধান্যকীর্ত্তন করিয়াছিল, সে বলিল, "কালিদাসের কথায় আমাদের কায কি?" ভাবে বোধ হইল, সে শ্লোকটির অর্থ বুঝিতে পারে নাই।

অমূল্যচরণ বলিল, "আমি বলিতেছি, জানি না কে এই সৌন্দর্য্য ভোগ করিবে।"

যুবক বলিল, "যতীশের বিবাহের চেষ্টা হইতেছে। দেখ না?"

অমূল্য বলিল, "তাহা হইলে ত পিতৃগৃহ হইতে পতিগৃহে আগতাকে দেখিয়া কালিদাসেরই মত বলিতে ইচ্ছা হইবে—যেন গুণানুরাগিণী লক্ষ্মী পুরাতন পদ্ম হইতে প্রস্ফুটিত উৎপলে আসিলেন।"

যতীশ বলিল, "এইবার নৌকা ফিরাইয়া গৃহে যাওয়া যাউক।"

নৌকা ফিরিল। যুবকগণ নানাকথার আলোচনা করিতে লাগিল।

প্রথম খণ্ড।

গ্রহণ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পরিচয়।

শা'নগর গ্রাম গঙ্গার পশ্চিম কূলে অবস্থিত। বহুদিনপূর্ব্বে বাঙ্গালায় মুসলমানের শাসনকালে এই গ্রামে একজন সমৃদ্ধ মুসলমান বাস করিতেন। এখন লক্ষ্মীর কৃপায় বঞ্চিত হইয়া শাহ-সাহেবের বংশধরগণ এই গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিয়াছেন। ধনবলে ও জনবলে প্রধানরূপে যে স্থানে বাস করা যায়, তথায় হীনবিত্ত হইয়া বাস করা বড়ই কষ্টের কারণ। তবে এখনও গ্রামস্থ মসজেদে, বারিশূন্য দীর্ঘিকায়, গৃহের ও গৃহবেষ্টন-প্রাচীরের ভগ্নাবশেষে এবং গ্রামের নামে শাহসাহেবের স্মৃতি রহিয়াছে। এখনও গ্রামের কোন কোন অধিবাসী গুপ্ত ধন পাইবার দুরাশায় শাহসাহেবের ভিটা খনন করিয়া থাকে। গ্রামখানি পুরাতন; সুতরাং গ্রামে সকল বর্ণের বাস। হিন্দু গ্রাম আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ থাকিত; গ্রামেই গ্রামবাসী-দিগের সকল অভাব পূর্ণ করিবার উপায় থাকিত, তাহাদিগকে সেজন্য পরমুখাপেক্ষী হইতে হইত না। আবার সমৃদ্ধ মুসল-মানের বাসহেতু গ্রামে মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যাও অল্প নহে; পল্লী দুই ভাগে বিভক্ত; দুই ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে সদ্ভাবের অভাব নাই।

এই গ্রামে মাতুলালয়ে ধরণীধর মুখোপাধ্যায়ের জন্ম হয়। ধরণীধরের জন্মের দুই মাস পরে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়।

তাঁহার মাতামহ একমাত্র সন্তান কন্যাকে ও দৌহিত্রকে স্বীয় গৃহেই রাখিয়াছিলেন। সুতরাং ধরণীধর মাতুলালয়ে প্রতিপালিত। মাতুলালয়েই তাঁহার বাস। মাতামহের মৃত্যুতে তিনিই তাঁহার উত্তরাধিকারী হইয়াছেন।

ধরণীধরের মাতামহ বাঙ্গালী গৃহস্থ ছিলেন। তখন"গৃহস্থ" বলিলে লোক বুঝিত, লোকটির অন্নসংস্থান আছে—দুই চারি বিঘা জমীও আছে। ঘরে শালগ্রামশিলা, গোশালায় গাভী ও গোলায় ধান্য তখন সকল গৃহস্থেরই ছিল। বাস্তবিক তখন লোকের অভাব ও আকাঙ্ক্ষা উভয়েরই পরিমাণ অল্প ছিল—উভয়েরই তৃপ্তি সহজসাধ্য ছিল। ধরণীধরের মাতামহ সাধারণ গৃহস্থ হইলেও দৌহিত্রের শিক্ষার জন্য ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। তাঁহারই সাহায্যে ধরণীধর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পাঠ করিয়া পূর্ত্তবিভাগে চাকরী পাইয়াছিলেন।

ধরণীধরের কতকগুলি বিশেষত্ব ছিল। তিনি সহৃদয় ও পরোপকারী ছিলেন; কিন্তু প্রথম পরিচয়ে তাঁহাকে কঠোর বলিয়াই বোধ হইত। তিনি ঘনিষ্ঠ বন্ধু ব্যতীত অন্যের নিকট অল্পভাষী ছিলেন; তাঁহার ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সংখ্যাও অধিক ছিল না; তাই লোক তাঁহাকে অসামাজিক মনে করিত। তিনি পঠদ্দশায় যে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহা ক্ষীণস্বাস্থ্য লোকের স্বাস্থ্যভঙ্গের কারণ হইত। তাহাতে তাঁহার ব্যায়ামাভ্যস্ত সুগঠিত দেহে অন্য কোনরূপ অপকার হয় নাই বটে, কিন্তু তাঁহার শ্রবণেন্দ্রিয়ের স্নায়ু দুর্ব্বল হইয়াছিল; সেই জন্য তিনি

গোলমাল সহ্য করিতে পারিতেন না। পারিবারিক জীবনেও তিনি যে সুখী ছিলেন, এমন নহে। তাঁহার যৌবনে—প্রথম সন্তান যতীশচন্দ্রের জন্মের দুই বৎসর পরে তাঁহায় পত্নীর মৃত্যু হয়। তিনি বিদেশে—কর্ম্মস্থানে ছিলেন। পত্নী গৃহে ছিলেন। একদিন প্রত্যুষে তাঁহার পত্নীর বিসূচিকা দেখা দিল। তাঁহার জননী প্রথমে বধূর পীড়ায় বড় মনোযোগ দিলেন না; পরে রোগ বাড়িয়া উঠিলে ডাক্তার ডাকাইলেন। এ দিকে ধরণীধরের নিকট টেলিগ্রাম করা হইল। টেলিগ্রাম পাইয়া ধরণীধর গৃহাভিমুখগামী হইলেন। তিনি তৃতীয় দিনে যখন গৃহে উপনীত হইলেন, তখন তাঁহার পত্নীর অবস্থা শোচনীয়। স্বামীকে দেখিয়া পত্নীর নয়নদ্বয় একবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্ট পতির গলদেশে দক্ষিণ বাহু বেষ্টিত করিয়া তাঁহাকে আরও নিকটে আনিয়া কি বলিবার চেষ্টা করিলেন। সেই চেষ্টাতেই তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইল; শেষ কথা আর বলা হইল না। সে কথা ধরণীধর ভুলিতে পারেন নাই; সে স্মৃতি তাঁহার হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া ছিল। জননীর ও মাতামহীর অশ্রু, বন্ধুবান্ধবের উপদেশ, কন্যাদায়গ্রস্তদিগের অনুরোধ কিছুই তাঁহাকে আর বিবাহ করাইতে পারে নাই। তিনি বিদেশে চাকরী করিতেন, অবসরকালে গৃহে আসিতেন; আর পুত্রের জন্য অর্থ সঞ্চয় করিতেন, যেন তাহাকে অর্থের অভাবে একাকী বিদেশে থাকিতে না হয়।

ধরণীধরের ধনসঞ্চয়চেষ্টা ব্যর্থ হয় নাই। আয়ের আতিশয্য

অপেক্ষা ব্যয়ের অল্পতাতেই অধিক অর্থসঞ্চয় হইয়া থাকে। ধরণী-ধরের ব্যয়বাহুল্য ছিল না। তিনি স্বয়ং বিলাসবর্জ্জিত জীবন যাপন করিতেন। গৃহেও তাঁহার জননী ও মাতামহী কখন বিলাসে অভ্যস্তা ছিলেন না। কাযেই তিনি যথেষ্ট অর্থসঞ্চয়ে সমর্থ হইয়াছিলেন।

যতীশচন্দ্র ধরণীধরের মাতার ও মাতামহীর স্নেহে লালিত হইয়াছিল। ধরণীধরের মাতামহী তাহাকে কিছু অতিরিক্ত আদর দিতেন। সেই আদরে সে বাল্যকালে কিছু দুরন্ত হইয়াছিল, পাঠেও তাহার যথেষ্ট মনোযোগদান ঘটে নাই। কিন্তু যতীশ-চন্দ্রের সপ্তমবর্ষবয়ঃক্রমকালে তাঁহার মৃত্যু হয়। পিতামহীরা স্বভাবতঃ পৌত্রপৌত্রীদিগকে অত্যন্ত স্নেহ করিয়া থাকেন। জগতে এমন লোক দেখা যায়, যাহারা আসল অপেক্ষা সুদ অধিক ভালবাসে; পিতামহীরা সেই শ্রেণীর লোক। যতীশচন্দ্রের পিতামহী যে তাহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, তাহা বলাই বাহুল্য; কিন্তু তিনি স্নেহাতিশয্যহেতু কখনও তাহাকে আবশ্যক শাসন করিতে কুণ্ঠিতা হইতেন না। তাহাকে শাসন করিতে তাঁহার আপনার হৃদয় ব্যথিত হইত; কিন্তু পৌত্রের ভবিষ্যতের বিষয় ভাবিয়া তিনি সে কর্ত্তব্য পালন করিতেন। বরং তাঁহার জননীর শাসনহীন স্নেহে পৌত্রের যে অনিষ্ট হইয়াছিল, তিনি তাহার সংশোধনে সচেষ্ট ছিলেন।

এদিকে ধরণীধর পুত্রের সুশিক্ষার জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা করিয়া-ছিলেন। গ্রামের নিকটে একটি বিদ্যালয় ছিল। যতীশচন্দ্র সেই

বিদ্যালয়ে পাঠ করিত। ধরণীধর সেই বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষককে আপনার গৃহে রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন শিক্ষক গৃহে যতীশচন্দ্রকে পড়াইতেন; যতীশচন্দ্র তাঁহার সহিত বিদ্যালয়ে যাইত ও বিদ্যালয় হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইত। এতদ্ব্যতীত গ্রামের টোলের অধিকারী পণ্ডিত মহাশয় যতীশচন্দ্রকে সংস্কৃত পড়াইতেন। সংস্কৃতের প্রতি ধরণীধরের অত্যন্ত অনুরাগ ছিল। তিনি অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সে, কার্য্য গ্রহণের পর, সংস্কৃত শিখিয়াছিলেন, সংস্কৃতসাহিত্যে সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন। পুত্রকে সংস্কৃতে সুশিক্ষিত করিবার জন্য তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। ধরণীধরের এই ব্যবস্থার সুফলও ফলিয়াছিল। তিনি যখনই গৃহে আসিতেন, পুত্রের পাঠে উন্নতি লক্ষ্য করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিতেন। সপ্তদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে যতীশচন্দ্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল বলিলেই সব কথা বলা হইল না; কারণ, সে যে বিভাগ হইতে পরীক্ষা দিয়াছিল, সে বিভাগের উত্তীর্ণ বালকদিগের মধ্যে সে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া বৃত্তি লাভ করিয়াছিল।

তাহার পর যতীশচন্দ্র কলিকাতায় পড়িতে আসিল। তাহাকে প্রতি শনিবারে এবং অন্য সময় ছুটী পাইলেই বাড়ী আসিতে হইত। ধরণীধর সেইরূপ ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন।

আশৈশব পিঞ্জরে আবদ্ধ বিহগ যদি সহসা পিঞ্জরের বাহিরে আসিয়া দেখে যে, সে স্বাধীন, তবে সে যেমন সেই নূতন অবস্থা সম্যক উপভোগ করিবার জন্য মুক্ত আকাশে উড্ডীয়মান হয়—

বিপদের আশঙ্কাকে মনে স্থানদান না করিয়া যথেচ্ছ বিচরণ করে—কলিকাতায় আসিয়া যতীশচন্দ্র তেমনই নব-প্রাপ্ত স্বাধীনতা সাগ্রহে উপভোগ করিতে লাগিল। পুত্র কখন বিদেশে যায় নাই; পাছে তাহার কোন অসুবিধা ঘটে এই আশঙ্কায় ধরণীধর স্বভাবতঃ মিতব্যয়ী হইয়াও পুত্রকে প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ দিতেন। বুদ্ধিমান লোকেরও ভুল হয়। বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন, সর্ব্ববিষয়ে সাবধান ধরণীধর স্নেহবশতঃ এই ভুল করিলেন। অর্থ সর্ব্বত্র—বিশেষতঃ সমাজে ছাড়পত্রের কায করে। সভায়, সমিতিতে, সম্মিলনে যোগ দিয়া যতীশচন্দ্র ছাত্রদলে এবং ছাত্রদল হইতে ক্রমে অন্য দলেও পরিচিত ও সমাদৃত হইতে লাগিল। সে যখন বাটীতে যাইত তখন সময়ে সময়ে দুইচারিজন বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যাইত। তাহার পিতামহী তাহাদিকে পরম সমাদরে সমাদৃত করিতেন। ধরণীধর এ সব কথা জানিতে পারিতেন না।

এবার বন্ধুদগের সহিত গৃহে আসিয়া যতীশচন্দ্র জলপথে ভ্রমণে বাহির হইয়াছিল। এই ভ্রমণকালে ইচ্ছাপুরে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। এই ঘটনার পর যতীশচন্দ্রের বন্ধুবর্গের মধ্যে একজনকে আরও দুই দিন শা'নগরে দেখা গিয়াছিল।

যতীশচন্দ্রের বন্ধুও নানারূপ। পিতার ব্যবস্থাগুণে সে ইংরাজী ও সংস্কৃতসাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিল—সাহিত্য-রসে রসিক হইয়াছিল। তাহার রচিত প্রবন্ধের খ্যাতি বিস্তা-

লয়ের তর্কসভা হইতে ক্রমে বাঙ্গালা মাসিক পত্রের কার্য্যালয়ে পৌঁছিয়াছিল। যশোলাভের স্পৃহাদমন পরিণতবয়স্কের পক্ষেও সহজসাধ্য নহে। অপরিণামদর্শী তরুণবয়স্ক যুবক যে সেই স্পৃহাহেতু আপনার ভবিষ্যৎ মঙ্গলবিষয়ে অন্ধ হইবে, তাহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই। কাযেই যতীশচন্দ্র দুর্ব্বোধ অঙ্কশাস্ত্রের ও নিরস ন্যায়ের চর্চ্চা ছাড়িয়া সাহিত্য চর্চ্চায় ও প্রবন্ধরচনায় অতিরিক্ত মনোযোগ দিতে লাগিল।

এই কারণে তাহার কতকগুলি সাহিত্যিক বন্ধুও সংগৃহীত হইয়াছিল। ইহাদের সংসর্গে যতীশচন্দ্রের ভবিষ্যৎ উপকারের সম্ভাবনা ছিল কি না সন্দেহ ;—কারণ, অপরিণতবুদ্ধি, অল্পবিদ্য যুবকের সাহিত্যচর্চ্চা প্রায়ই স্থায়ী সুফল প্রদান করে না। তাহার সাহিত্যকীর্ত্তি একান্ত অপরিণত অবস্থায় সংগৃহীত ফলের মত বিস্বাদ ও অব্যবহার্য্য হয়। কিন্তু ইহাতে যে যতীশচন্দ্রের বর্ত্তমানে ক্ষতি হইতেছিল, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই ; কারণ, ইহাতে তাহার পাঠে অত্যন্ত অবহেলা হইতেছিল। এই অবহেলার আনিবার্য্য ফলের বিষয় চিন্তা করিবার অবকাশ বা প্রবৃত্তি কিছুই তাহার ছিল না।

তাহার সাহিত্যিক বন্ধুদিগের মধ্যে অমূল্যচরণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যতীশচন্দ্রের তরুণ হৃদয়ে অমূল্যচরণের প্রভাবফলে তাহার জীবনের গতি নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল,—সেই প্রভাবফল তাহাকে অভিনব পথের পথিক করিয়াছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

গৃহে।

সরোজাকে সঙ্গে লইয়া তাহার জ্যেষ্ঠা গৃহে ফিরিলেন। গৃহখানি নাতিবৃহৎ—সুসংস্কৃত। গৃহের তিন দিকে ফলতরুর বাহুল্যে গৃহে আলোকের গমনপথ বিঘ্নসঙ্কুল হইয়াছে। গৃহের কতক অংশ দ্বিতল—কতক অংশ একতল। গৃহের পশ্চাৎভাগে রন্ধনগৃহ, ভাণ্ডারঘর প্রভৃতি। সে অংশ একতল। সেই দিকে গৃহের "খিড়কীদ্বার" ও "খিড়কীর বাগান"। সেই বাগানে একটি সরোবর। যুবতী গৃহে ফিরিয়া সরোবরে গাত্র ধৌত করিবেন, স্থির করিয়া আসিয়াছিলেন।

তিনি গৃহে প্রবেশ করিয়া যখন পুনরায় উদ্যানে আসিবার জন্য অগ্রসর হইলেন তখন হারার মা—দাসী তাঁহাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল, "ও কি, দিদিমণি! ঘাটে গিয়াছিলে, কাপড় ভিজে নাই!"

হারার মা'র কণ্ঠস্বর কখন মৃদু হইত না; সে যখনই কথা বলিত, তখনই পাড়া জানাইয়া বলিত। সে বিষয়ে কেহ কিছু বলিলে সে আরও উচ্চস্বরে বলিত, "বলি, আমি কি কাহারও ধার করিয়া খাইয়াছি যে, চোরের মত কথা বলিব?" আজ বিরজার প্রতি তাহার প্রশ্নে ভাণ্ডার ঘর হইতে ও অন্যান্য কক্ষ হইতে বিরজার পিতৃব্যপত্নী ও তিন ভ্রাতৃবধূ আসিয়া রোয়াকে

উপনীত হইলেন। প্রথমেই পিতৃব্যপত্নী প্রশ্ন করিলেন, "কি রে, বিরজা?"

যুবতী বলিলেন, "বাগানের পুষ্করিণীতে যাইতেছি।"

যুবতীর উত্তর শেষ হইতে না হইতে তিনি বিপুল দেহভার লইয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিছুদিন হইতে তিনি বায়ুরোগে আক্রান্ত হইয়া ছিলেন। স্বামীর দীর্ঘকালব্যাপী পীড়ার সময় রোগের সূত্রপাত। এখন রোগ আরও বাড়িয়াছে। সময় সময় রোগের কোন লক্ষণই প্রকাশ পায় না, আবার সময় সময় রোগিণীর বুদ্ধির বিকার দেখা যায়। এই সময় সেইরূপ বিকার দেখা যাইতেছিল।

কাকীমা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলে বধূরা ননন্দাকে লক্ষ্য করিয়া বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। জ্যেষ্ঠা বলিলেন, "কি ঠাকুরঝি, বরের কথা ভাবিতে ভাবিতে কি জলে নামিতে ভুলিয়া গিয়াছিলে?"

মধ্যমা বলিলেন, "তাহাতে আর বিস্ময় কি আছে? ঠাকুর জামাই তিন মাস এ দিকে আইসেন নাই; ঠাকুরঝিকেও পরীক্ষা শেষ না হইলে লইয়া যাইবেন না। আর কেহ কি পরীক্ষা দেয় না?"

যুবতী বলিলেন, "মেজ বৌদিদি, তোমার যে মাস দিন সব মুখস্থ দেখিতেছি! তিথি নক্ষত্র ঠিক আছে ত?"

মধ্যমা উত্তর করিলেন, "তিথির জন্য ভাবনা কি? ঠাকুর জামাই যে দিন আসিবেন, সেই দিনই ত তোমার পূর্ণিমা।

চন্দ্রের উদয় না হইলে ত কেবলই অমাবস্যা। কি হইয়াছে, ঠাকুরঝি ?”

যুবতী বলিলেন, “এখন তোমরা—অমাবস্যার চাঁদরা একটু অপেক্ষা কর—আমি আসিয়া সব বলিতেছি।”

তৃতীয়া এতক্ষণ কিছু বলে নাই, সে বলিল,—“ঠাকুরঝি, তুমি শুষ্ক বস্ত্রে ঘাট হইতে ফিরিলে, ব্যাপারটা কি ?”

যুবতী বলিলেন, “তোমাদের আর বিলম্ব সহিবে না! তবে শুন।”

যুবতী ঘাটের ঘটনা বিবৃত করিলেন।

শুনিয়া প্রথমা বলিলেন, “কি লজ্জা!”

দ্বিতীয়া বলিলেন, “তাহারা কি ভদ্রলোক ?”

যুবতী বলিলেন, “এখন ত ধোপা কাপড় হইলেই ভদ্রলোক। আবার তাহাদের মধ্যে যে সকলের অপেক্ষা বড় সে দূরবীক্ষণ দিয়া দেখিতেছিল—সে-ই, সেবার কলিকাতার থিয়েটারে কয়জন যুবককে যেমন যন্ত্র দিয়া দেখিতে দেখিয়াছিলাম।”

প্রথমা দশনে ঈষৎ প্রসারিত জিহ্বা দংশন করিলেন।

যুবতী বলিলেন, “এখন আমাকে ছুটী দাও; আমি পুষ্করিণীতে যাই।”

দ্বিতীয়া বলিলেন, “তুমি যাও। আমিও যাইতেছি। বেলা গেল—বাবার খাবার সাজাইতে হইবে।”

যুবতী চলিয়া যাইলেন।

সেই সময় একজন যুবক তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

দেখিয়া বোধ হয়, যুবক কিছু পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে। তাহার ললাটে স্বেদবিন্দু, জুতায় ধূলি। তাহাকে দেখিয়া প্রথমার ও দ্বিতীয়ার মধ্যে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিবিনিময় হইয়া গেল। তাহার পর প্রথমা তৃতীয়াকে দেখাইয়া বলিলেন, "এই যে, ঠাকুরপো, তোমার সাত রাজার ধন—এক মাণিক।"

যুবক ও তৃতীয়া উভয়েই কিছু লজ্জা বোধ করিল।

তৃতীয়ার কর্ণমূল লোহিত হইয়া উঠিল; সে মাথায় কাপড় টানিয়া দিল। যুবক বিদ্রূপবাণে বিদ্রূপবাণ ব্যর্থ করিবার প্রয়াসে বলিল, "তোমাদের অধিকারে আসিলে আর নিস্তার নাই। স্বয়ং অর্জ্জুন যখন নারীরাজ্যে আসিয়া বিপন্ন হইয়াছিলেন, তখন অন্যের কথা ত ছার।"

প্রথমা বলিলেন, "আচ্ছা, ঠাকুরপো, সত্য সত্য বল দেখি—সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র এ কয় দিন তুমি কেমন করিয়া কলিকাতায় থাক? শনিবারে না হয় দড়ি ছিঁড়িয়া ছুটিয়া আইস।"

যুবক বলিল, "আমিই দড়ি ছিঁড়ি বটে; দাদারা সব ভাল মানুষ! মেজ দাদা ত আমার সঙ্গে এক গাড়ীতেই আসিয়াছেন; বড় দাদাও বোধ হয় সন্ধ্যার মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইবেন।"

যুবক চলিয়া গেল।

তৃতীয়াও কক্ষে প্রবেশ করিল।

তাহার পর প্রথমা ও দ্বিতীয়া পুষ্করিণীতে চলিলেন। পথে প্রথমা দ্বিতীয়াকে বলিলেন, "যাহাই বল ভাই সেজ ঠাকুরপোর

মত বেহায়া আর দ্বিতীয় নাই। বাড়ী আসিয়াছ ; কাপড় ছাড়া নাই, মুখে জল দেওয়া নাই—ছুটিয়া স্ত্রীকে দেখিতে আসিয়াছ! আমাদের না হয় লজ্জা না করিলে,—কাকীমা, পাগল হউন আর যাহাই হউক, তিনি ত রহিয়াছেন! সুন্দরী স্ত্রী কি আর কাহারও হয় না?"

দ্বিতীয়া বলিলেন, "যাহাই বল, ভাই, সেজ বৌয়ের খুব জোর কপাল।"

"লোক যাহাতে নিন্দা করে, সে কপালে লাভ?"

"লাভ যাহার তাহার। লোকের কথায় কি আইসে যায়?"

"লোকের কথার জন্যই সব।"

এইরূপ আলোচনা করিতে করিতে উভয়ে পুষ্করিণীর ঘাটে উপস্থিত হইলেন। যুবতী তখন আকর্ণ জলমগ্না। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি, বড় বৌদিদি, কাহার কথা লইয়া আলোচনা করিতেছ?"

বড় বৌ বলিলেন, "তোমারই ভ্রাতার গুণের কথা বলিতেছি।

যুবতী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ ভ্রাতার—জ্যেষ্ঠের না মধ্যমের?"

"যাহাদের তিন কাল যাইয়া এক কালে ঠেকিয়াছে, তাহাদের কথা কে-ই বা বলে, আর কে-ই বা শুনে? এখন যাহারা নিত্য নূতন দেখাইতেছে, তাহাদের কথাই বলিতেছি।"

"কে নিত্য নূতন দেখাইতেছে?"

"কেন, তোমার সেজ দাদা।"

"সেজ দাদা আসিয়াছে ?"

"তোমার সেজ বৌদিদির আঁচল খুঁজিয়া দেখ। সপ্তাহ-পরে বাড়ী আসিয়াছেন ; কাহারও সঙ্গে দুইটা কথা বলা নাই, মুখে হস্তে জল দিবার বিলম্বও সহে নাই, একেবারে গৃহিণীর কুঞ্জে আসিয়া উপস্থিত ! এমন ত কখনও দেখি নাই !"

যুবতী হাসিয়া বলিলেন, "যাহা দেখ নাই, তাহা কি কখন দেখিবে না। জানই ত, যাবৎ বাঁচি তাবৎ শিখি।"

প্রথমা বলিলেন, "তোমরা অনেকই দেখাইলে, অনেকই শিখাইলে।"

"তোমাকে শিখাই এমন সাধ্য কি আমাদের আছে ? বরং তুমিই আমাদের কত শিখাইতে পার।"

"তোমার শিখাইবার লোকের অভাব কি ? তবে ঠাকুর জামাই পড়া লইয়া কিছু অতিরিক্ত ব্যস্ত। তা, ঠাকুরঝি, সবুরে মেওয়া ফলে।"

"সেজ দাদা একটু 'বৌ-পাগলা' বটে।"

"একটু ! আপনার ভাই বলিয়া কি রাত্রিকে দিন করা চলে ?"

"ও সব থাকিবে না।"

"তাহা কি বলা যায় ? মুড়কীর রস মরে বটে, কিন্তু আমার মোয়াও ত পাকায় ! আর একটা কথা বলি, ঠাকুরঝি, তোমার ও ভাইটির লিখাপড়া কিছুই হইবে না।"

"কেন ?"

"সেজ ঠাকুরপো যে কয় দিন কলিকাতায় থাকে, সে কয় দিন উহার মন সেজ বৌএর খাটের ক্ষুরায় বাঁধা থাকে। ঠাকুরপো বইএর পাতায় বৌএর ছবি দেখে। বরং এবার সেজ বৌকে কলিকাতায় পাঠাইবার ব্যবস্থা কর।"

এই সময় একটি সপ্তম বা অষ্টমবর্ষ বয়স্কা বালিকা ঘাটে আসিল; যুবতীকে বলিল, "দিদি, বড় দাদা আসিয়াছেন—আর তাঁহার সঙ্গে মেজ জামাই বাবু।"

মধ্যমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "সত্য?"

বালিকা বলিল, "হাঁ।"

তখন প্রথমা একটু দুষ্ট হাসি হাসিয়া ননন্দাকে বলিলেন, "চল, ঠাকুরঝি, বাড়ী যাই—

'সই লো—সই
তোমার মদনমোহন এল ঐ।'

কি ভাগ্য যে ঠাকুরজামাই আসিয়াছেন!"

মধ্যমা বলিলেন, "চল, দিদি, সন্ধ্যা হইয়া আসিল।"

তখন সূর্য্য পশ্চিম দিক্‌চক্রবালসমীপস্থ। দিনান্তের লোহিতাভ কিরণ উদ্যানের বৃক্ষচূড়ায় পড়িয়াছে। আকাশে খণ্ড খণ্ড মেঘে নানা বর্ণের বিকাশ। সরোবরতীরে বিকশিত কুসুমসৌরভে সুরভিত কেতকীকুঞ্জে ডাহুক ডাকিয়া সন্ধ্যার সূচনা সূচিত করিতেছে।

সকলে সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া উপরে উঠিলেন। পবনে কেতকী কুসুমের সৌরভ। মধ্যমা প্রথমাকে বলিলেন,

দিদি, কেতকীফুল ফুটিয়াছে। এই সময় খদিরে মিশাইয়া াইলে হয়। ঠাকুর বড় ভালবাসেন।"

বড় বৌ বলিলেন, "ভাল কথা মনে করিয়াছ! গতবৎসর কলিকাতা হইতে ফুল আনাইতে হইয়াছিল। চল, বাড়ী যাইয়া শিবুকে পাঠাইয়া দিব—তুলিয়া লইয়া যাইবে।"

সকলে গৃহাভিমুখগামী হইলেন।

পথে বড় বৌ ননন্দাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন, "চল, াকুরঝি, দ্রুত চল। মন চলে ত চরণ চলে না।"

যুবতী বলিলেন, "কেন, বড় বৌদিদি, একা কি আমারই দ্রুত যাইবার কথা? তোমার গতিও ত বড় মন্থর দেখিতেছি না।"

"আজ ঠাকুরঝির মুখ ফুটিয়াছে।"

"কেন—ইটটি মারিবে আর পাটকেলটি সহিবে না? এ কেমন বিচার?"

সকলে গৃহে উপনীত হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জামাতা।

মহেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গৃহে এই জামাতার আগমন সত্য সত্যই কিছু অসাধারণ ঘটনা। কারণ, জামাতা ব্রজেন্দ্র প্রায়ই শ্বশুরালয়ে আসিত না, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও জামাতাকে আনিতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন না। তাঁহার পত্নী জীবিতা থাকিতে তিনি সময় সময় পতির ও বৈবাহিকীর মতের প্রতিবাদ করিয়া বলিতেন, "তোমাদের সবই সৃষ্টিছাড়া। মেয়েও শ্বশুরবাড়ী যাইবে না, জামাতাও শ্বশুরালয়ে আসিবে না। কেন আর কাহারও ছেলে কি জামাতা কি লিখাপড়া করে না?" দুই বৎসর হইল তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে; আর সেই সময় হইতে ব্রজেন্দ্রের শ্বশুরালয়ে আগমন আরও বিরল হইয়া পড়িয়াছে।

মহেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজের টোল-বিভাগে কাব্য ও স্মৃতি অধ্যয়নের পর পিতার মৃত্যুতে কুলক্রিয়ায় মনোনিবেশ করেন। তাঁহার পিতা বহু ধনী পরিবারের কুলগুরু ছিলেন। তিনি সেই কার্য্যে ব্রতী হয়েন। সে আজ বিংশ বর্ষের কথা। তখন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বয়স ত্রিশ বৎসরমাত্র। তাঁহার একমাত্র ভ্রাতা তখন কলেজে অধ্যয়ন করিতেছেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কোন শিষ্যের চেষ্টায় তিনি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছিলেন। কিন্তু পর-পর কয়টি অস্বাস্থ্যকর স্থানে যাইয়া

ও শরীরের প্রতি অযথা অত্যাচার করিয়া তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। শেষে তিনি পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হয়েন ও দীর্ঘ সপ্ত-বর্ষকাল জীবন্মৃত অবস্থায় থাকিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। স্বামীর জীবদ্দশায়—পীড়ার সময় হইতে—তাঁহার পত্নীর বায়ু-রোগের সূচনা হয়। তাঁহার এক পুত্র ও এক কন্যা। পুত্র রাধাচরণ কলিকাতায় থাকিয়া অধ্যয়ন করিতেছে। পুষ্করিণীতে যুবতীরা তাহারই স্ত্রীর প্রতি অতিরিক্ত আসক্তির বিষয় আলোচনা করিতেছিলেন। কন্যা শৈলজা স্বামীর ঘর করিতেছে; মধ্যে মধ্যে পিতৃগৃহে আসিয়া থাকে। ভট্টাচার্য্য মহাশয় পুত্র-কন্যাদিগের অপেক্ষা ভ্রাতুষ্পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রীকে অধিক স্নেহ করেন। ইহাতে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কিছু অসন্তুষ্ট। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের এই জ্যেষ্ঠ পুত্র কলিকাতায় থাকেন।

পুত্রদিগের জন্য ও ভ্রাতুষ্পুত্রের শিক্ষার জন্য তিনি কলিকাতায় একটি বাসা রাখিয়াছেন। তথায় তাঁহার বিধবা ভগিনীর কর্তৃত্ব। ভট্টাচার্য্য মহাশয়কেও প্রায়ই কলিকাতায় যাইতে হয়; কারণ, তাঁহার অধিকাংশ শিষ্যের বাস কলিকাতায়। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কলিকাতায় একখানি দোকান খুলিয়াছেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বহু ধনী শিষ্যের কৃপায় দোকান ভালই চলিতেছে; জ্যেষ্ঠ পুত্র বামাচরণ কিন্তু তাহা স্বীকার করেন না; ভয়—পাছে তাঁহাকে সংসারে কিছু দিতে হয়। ভট্টাচার্য্য মহাশয় ইহাতে মনে মনে বিরক্ত হইলেও মুখে বিরক্তি প্রকাশ করেন না। বামাচরণের ব্যবহারে ভট্টাচার্য্য মহাশয় মনে মনে ব্যথিত।

তিনি বুঝিয়াছেন, তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সংসার ভাঙ্গিয়া যাইবে। তিনি তাহার জন্য গোপনে আবশ্যক ব্যবস্থাও করিয়াছেন। মধ্যম পুত্র পার্ব্বতীচরণ সংস্কৃত কলেজে কিছু দিন অধ্যয়নের পর এখন পিতার কার্য্যে তাঁহার সাহায্য করিতেছেন। কনিষ্ঠ দেবীচরণ ও ভ্রাতুষ্পুত্র রাধাচরণ অধ্যয়ন করিতেছে। পুত্রবধূদিগের মধ্যে মধ্যমা বাড়ীতেই অবস্থান করেন। জ্যেষ্ঠা মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় আসিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র তারাচরণ পিতামহের অত্যন্ত আদরের, পিতামহ তাহাকে ছাড়িয়া অধিক দিন থাকিতে পারেন না। সেই জন্য তাঁহাকে সময় সময় বাড়ীতেও থাকিতে হয়। মধ্যমার সন্তান জন্মে নাই; দুই বৎসর হইল রাধাচরণের বিবাহ হইয়াছে। ভট্টাচার্য্য মহাশয় অধিক বয়সে বিবাহের বিরোধী। তিনি দেবীচরণেরও বিবাহ দিবেন, স্থির করিয়াছেন। কিন্তু তৎপূর্ব্বে কন্যা সরোজার বিবাহ দেওয়া আবশ্যক। উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান করিতে করিতে কন্যা দ্বাদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহার বিবাহের জন্য কিছু ব্যস্ত হইয়াছেন। তিনি স্থির করিয়াছেন, অগ্রহায়ণ মাসে কন্যার বিবাহ দিবেন; তাহার পর মাঘ বা ফাল্গুন মাসে দেবীচরণের বিবাহ দিবেন। এখন পাত্রপাত্রীর সন্ধান চলিতেছে। ভ্রাতুষ্পুত্রী শৈলজা ও পুত্রী বিরজা উভয়েরই বিবাহে ভট্টাচার্য্য মহাশয় অনেক পাত্র বাছিয়াছিলেন। শৈলজার স্বামী মথুরানাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কোন শিষ্যের সুপারিশে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছেন। বিরজার

স্বামী ব্রজেন্দ্র প্রবেশিকা হইতে আরম্ভ করিয়া এম. এ. পর্য্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া এবার রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তি লাভের জন্য পরীক্ষা দিবে। ব্রজেন্দ্রের পিতা ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাল্যবন্ধু ছিলেন। দুই পরিবারের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সংস্থাপনের জন্য উভয়েই লালায়িত ছিলেন। স্থির ছিল, ব্রজেন্দ্রের সহিত বিরজার বিবাহ হইবে। কিন্তু বিবাহ সম্পন্ন হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু ঘটিল। তাঁহার মৃত্যুতে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত সে পরিবারের ঘনিষ্ঠতা যেন আরও বর্দ্ধিত হইল; তিনি সর্ব্বদাই বন্ধুপুত্রের ও বন্ধুপত্নীর সংবাদ লইতেন। ব্রজেন্দ্রের জননীও বৈষয়িক ব্যাপারে তাঁহারই পরামর্শ লইতেন। বন্ধুর মৃত্যুর পর কিছু দিন ভট্টাচার্য্য মহাশয় আর বিবাহের কথা উত্থাপিত করিলেন না; পাছে এমন সন্দেহের অবকাশ হয় যে, তিনি ব্রজেন্দ্রের সহিত কন্যার বিবাহের চেষ্টাতেই বন্ধুপরিবারের তত্ত্বাবধান করিয়াছেন। ক্রমে এক বৎসর কাটিয়া গেল। বিরজা একাদশ হইতে দ্বাদশ বর্ষে পদার্পণ করিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় অন্য পাত্রের সন্ধান করিতে লাগিলেন। এই সময় এক দিন কথায় কথায় ভট্টাচার্য্য মহাশয় ব্রজেন্দ্রের জননীকে বলিলেন, তিনি বিরজার বিবাহের জন্য চিন্তিত হইয়াছেন; কন্যা বড় হইয়াছে; আর বিলম্ব করা তাঁহার অভিপ্রেত নহে। শুনিয়া ব্রজেন্দ্রের জননী বলিলেন, "কর্ত্তার বড় ইচ্ছা ছিল, বিরজাকে পুত্রবধূ করেন। আমার অদৃষ্ট মন্দ। আমি আর সে কথা কেমন করিয়া বলিব?" ভট্টাচার্য্য মহাশয়

বলিলেন, "আমি সেই আশায় নিশ্চিন্ত ছিলাম। কিন্তু এখন আর তাহা বলিতে সাহস করি নাই। আজ আপনি সে কথা তুলিয়াছেন, তাই আমি আবার সেই প্রস্তাব করিতে সাহস করিতেছি। আমরা দুই জন বহুদিন হইতেই এ সম্বন্ধ স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম।" বন্ধুর কথা স্মরণ করিতে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল। ব্রজেন্দ্রের সহিত বিরজার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়া গেল।

ব্রজেন্দ্র এ কথা শুনিল। পিতামাতার কথায় প্রতিবাদ করা ব্রজেন্দ্রের স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। সে কেবল বলিল, "মা, তুমি এখন এ ব্যবস্থা করিলে কেন?"

মা বলিলেন, "ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মত হিতার্থী আমাদের আর নাই। এ বিবাহ হইলে তিনি তোমার ইষ্টচেষ্টা করিবেন। আমি নিশ্চিন্ত হইব।"

"মা, ভট্টাচার্য্য মহাশয় যথার্থই আমাদের হিতার্থী। তিনি নিঃস্বার্থ ভাবে আমাদের মঙ্গল সাধন করেন ও করিবেন।"

"কর্তা বহুদিন পূর্ব্বে এ বিবাহসম্বন্ধ স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাই—তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য আমিই উদ্যোগী হইয়া এ কথা বলিয়াছি।"

ব্রজেন্দ্র আর কোন আপত্তি করিল না।

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিবাহে তোর আপত্তি কেন?"

ব্রজেন্দ্র বলিল, "আমার ইচ্ছা ছিল, পাঠ শেষ করিয়া তবে সংসারে প্রবেশ করিব।"

"বাবা, ভগবান যে ইহারই মধ্যে তোর স্কন্ধে সংসারের ভার দিয়াছেন! যত দিন তোর পাঠ শেষ না হয়, আমি বধূকে আনিব না।"

ব্রজেন্দ্র আর কিছু বলিল না; বরং মনে করিল, যাহাতে পিতার ইচ্ছা ছিল, মাতার আগ্রহ আছে—তাহাতে আপত্তি জানাইয়া অন্যায় কার্য্য করিয়াছে।

শুভ দিনে বিরজার সহিত ব্রজেন্দ্রের বিবাহ হইয়া গেল। এ বিবাহে ব্রজেন্দ্রের জননীও যেমন সুখী হইলেন, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও তেমনই সুখী হইলেন।

বিবাহের প্রস্তাবকালে বধূকে আনিবার সম্বন্ধে ব্রজেন্দ্রের জননী যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহা প্রায় রক্ষিত হইয়াছে বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ রক্ষিত হয় নাই; চারি বৎসরে বিরজা মধ্যে মধ্যে পতিগৃহে গিয়াছে,—ব্রজেন্দ্রও কয়বার শ্বশুরালয়ে আসিয়াছে।

তবে তুই-ই দীর্ঘ দিনের ব্যবধানে—অল্প দিনের জন্য। এখন পতি পত্নী—যুবক যুবতী। ইহার হৃদয় স্বতঃই উহার জন্য ব্যাকুল হইত। বাঞ্ছিতকে নিকটে পাইবার বাসনা যৌবনে স্বাভাবিক; যৌবনে হৃদয় যখন প্রেমপুলকে পূর্ণ হইয়া উঠে—আপনার প্রেম দিবার জন্য ও অপরের প্রেম পাইবার জন্য হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠে—তখন—সেই অনাবিল সুখের সময়—বাঞ্ছিতকে বক্ষে রাখিয়াও তৃপ্তি হয় না;—যেন তবুও ব্যবধান রহিল—মনে হয়। যৌবনে—স্বার্থের আবর্জ্জনায় হৃদয় কলুষিত হইবার পূর্ব্বে—বিষয়বুদ্ধি প্রবল হইবার পূর্ব্বে প্রেমতৃষ্ণা যেমন প্রবল থাকে,

প্রেমপুলক উপভোগ করিবার শক্তিও তেমনই প্রবল থাকে। তখন হৃদয় প্রেমকেই শ্রেষ্ঠ আসন দেয়। যে যৌবনে প্রেম-পুলকে হৃদয় পূর্ণ করিতে পারিল না, সে দুর্ভাগ্য। এই যৌবনে ব্রজেন্দ্রের ও বিরজার হৃদয় স্বভাবতঃই পরস্পরকে নিকটে চাহিত। ব্রজেন্দ্র সে বাসনা সংযত করিত; সে ভাবিত, অধ্যয়ন শেষ করিয়া প্রেমসুখে হৃদয় পূর্ণ ও প্রফুল্ল করিবে। সে পূর্ণিমার জ্যোৎস্নালোকের আশায় দ্বাদশীর চন্দ্রকরোজ্জ্বল রজনীর সৌন্দর্য্য-সম্ভোগ হইতে স্বেচ্ছায় আপনাকে বঞ্চিত করিত। বিরজার সেরূপ আশা বা আকাঙ্ক্ষা ছিল না; তাই সে মধ্যে মধ্যে স্বামীর উপর অভিমান করিত। কিন্তু তাহার সে অভিমান স্থায়ী হইত না। সে যখন সকলের মুখে, বিশেষ তাহার পিতার মুখে, স্বামীর অধ্যয়ন-স্পৃহার প্রশংসা শুনিত—তখন সেই প্রশংসার রবিকরে তাহার হৃদয়ে সঞ্চিত অভিমানের তুষাররাশি বিগলিত হইয়া যাইত, তাহার হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠিত। বিশেষ স্বামীর সহিত যখন তাহার সাক্ষাৎ হইত তখন তাহার পিপাসিত দৃষ্টি স্বামীকে দেখিয়া কিছুতেই তৃপ্তি লাভ করিতে পারিত না। সে মুগ্ধনেত্রে স্বামীকে দেখিত— স্বামীকে সর্ব্ব সুখের নিলয় বলিয়া মনে করিত; তাহার অভিমান কোথায় মিলাইয়া যাইত।

আজ প্রায় তিন মাস পরে বিরজার সহিত ব্রজেন্দ্রের সাক্ষাৎ হইল। আজও বিরজার হৃদয়ের এক কোণে—সূর্য্যকরোজ্জ্বল শারদ অম্বরের দূর পার্শ্বে স্বচ্ছ—শুভ্র মেঘখণ্ডের ন্যায় একটু অভি-মান লাগিয়া ছিল। সে অভিমান তাহার মুখে ও নয়নে সপ্রকাশ

আনন্দকিরণ নির্ব্বাপিত করিতে পারে নাই সত্য; কিন্তু তাহা ব্রজেন্দ্রের প্রেমতীক্ষ্ণ দৃষ্টি অতিক্রম করিতেও পারে নাই। বিরজাকে দেখিয়াই ব্রজেন্দ্র বলিল, "বিরজা, আমার পরীক্ষার আর ছয় মাসমাত্র বিলম্ব আছে।"

বিরজা বুঝিল, যে মিলনতৃষ্ণা তাহার হৃদয় পূর্ণ করিয়া ছিল—তাহা স্বামীর হৃদয়ও জুড়িয়া রহিয়াছে। রবিকরে কুজ্ঝটিকার মত তাহার অভিমান দূর হইয়া গেল - মিলনানন্দে যুবতী-হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল।

তাহার পর স্বামিস্ত্রীতে কত কথা হইতে লাগিল। প্রায় তিন মাস পরে স্বামিস্ত্রীতে সাক্ষাৎ। মিলনব্যাকুল যুবকযুবতীর কথা কি ফুরায়? যখন কথা কহিতেই আনন্দ—কথা কহাইতেই আনন্দ, তখন কথা প্রত্যক্ষআগতপ্রায় আপনি আইসে। তখন কথার স্রোতে ভরা জুয়ার, তাহাতে ভাঁটা পড়ে না। যখন নিমেষালসপক্ষ্মপংক্তি পত্নী পতির মুখে চাহিয়া আর সব ভুলিয়া যায়েন,—যখন পতির পিপাসিত নয়ন প্রিয়ার আননে সর্ব্বসুষমা-সমন্বয় দেখিয়া বিপুল পুলকে আকুল হইয়া উঠে, তখন দীর্ঘযামা যামিনী যেন ক্ষণমাত্রে অতিবাহিত হইয়া যায়। কিন্তু যখন মিলনে কথা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, যখন নয়নের তৃষ্ণা মিটিয়া যায় তখন জানিবে প্রেমের পূর্ণ প্রবাহ মন্দীভূতবেগ হইয়াছে, সুখলতা এ জীবনে আর সুমনঃ-সুষমায় শোভাময়ী হইবে না। তখন জীবন মৃত্যুর নামান্তরমাত্র।

বিরজা ও ব্রজেন্দ্র কত কথা কহিতে লাগিল, উভয়ে সেই

কথায়—মিলনানন্দে এমনই তন্ময় যে বাতায়নপার্শ্বে তাহাদের প্রেমালাপশ্রবণলোলুপা প্রথমা ও দ্বিতীয়া বধূর অলঙ্কার-শিঞ্জিত বা মৃদুস্বরে কথোপকথন কাহারও কর্ণগোচর হইল না।

কথায় কথায় ব্রজেন্দ্র বলিল, "মা আজ কাল আমার উপর প্রায়ই রাগ করেন।"

বিরজা বিস্মিতা হইল; জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?" সে তাহার শাশুড়ীকে যাহা জানিত তাহাতে তাঁহার পক্ষে পুত্রের উপর ক্রুদ্ধ হওয়া সে অসম্ভব বলিয়াই বিবেচনা করিত।

ব্রজেন্দ্র হাসিয়া বলিল, "তোমাকে লইয়া যাইতে পরিতেছেন না বলিয়া।"

বিরজার মনে হইল বলে, "সে দোষ কাহার?" কিন্তু সে কথা বলিতে তাহার লজ্জা হইল। সে নীরব রহিল।

ব্রজেন্দ্র বলিল, "মা বলেন, 'আমি আর কত দিন একাকী থাকিব?' আমি যদি উত্তরে বলি, 'মা এত দিন ত আমাকে লইয়াই সন্তুষ্ট ছিলে'—তবে মা বলেন, 'এত দিন আমার একটি ভিন্ন সন্তান ছিল না—এখন যে দুইটি'!"

বিরজা যখনই স্বামিগৃহে গিয়াছে, তখনই শাশুড়ীর যে যত্নের ও স্নেহের পরিচয় পাইয়াছে তাহাতে সে আপনাকে সৌভাগ্যবতী মনে করিয়াছে। আজ এই কথায় তাহার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইল। সে তাহার স্বামি-সৌভাগ্যের কথা স্মরণ করিল, শাশুড়ীর স্নেহের কথা মনে করিল;—তাহার মনে হইল তাহার মত সৌভাগ্য কয় জনের আছে? তাহার পক্ষে জগৎ

মধুময়। মানুষের মনের এই দুর্লভ অবস্থা যদি স্থায়ী হইত, তবে সংসার সত্য সত্যই নন্দনে পরিণত হইত।

এ দিকে স্বামিস্ত্রীর মৃদুস্বরে পরিচালিত কথোপকথন শ্রবণের আশায় হতাশ হইয়া বধূদ্বয় যে যাহার কক্ষে চলিলেন। মধ্যমা জ্যেষ্ঠাকে বলিলেন, "দিদি তোমার চুড়ীর শব্দ শুনিয়াই ঠাকুরঝি সাবধান হইয়াছিল।" জ্যেষ্ঠা বলিলেন,—"কখনই নহে। ঠাকুরঝি কি কম চালাক? ঠাকুরঝি সন্দেহ করিয়াছিল, আমরা 'আড়ি পাতিব'। ঠাকুর জামাইও কম নহেন; দেখিতে ভাল মানুষটি, যেন ভাজা মাছটি উল্‌টাইয়া খাইতে জানেন না। ও যেমন হাঁড়ি তেমনই সরা।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ঘটক।

আশ্বিনের মধ্যভাগ। অপরাহ্নে ভট্টাচার্য্য মহাশয় ও প্রতিবেশী শিবরতন চট্টোপাধ্যায় ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গৃহের সম্মুখস্থ চাতালে মাতুরের উপর বসিয়া আছেন। শেষ আশ্বিনে দুর্গোৎসব—বাঙ্গালার মহোৎসব; বাঙ্গালীর জীবনে মিলনের—আনন্দের উৎসব। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের চণ্ডীমণ্ডপে প্রতিমার গঠনকার্য্য প্রায় শেষ হইয়া আসিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রতিমাগঠনের তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন, চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আসিলে উভয়ে বাহিরে আসিয়া বসিয়াছেন। আকাশে ধূসর মেঘ। এবার বর্ষা বিলম্বে আরব্ধ হইয়াছিল, আজও শেষ হয় নাই; এক দিন যদি আকাশ মেঘশূন্য হয়—পরদিন হইতে আবার বর্ষণ হইতে থাকে। দুই এক বিন্দু বৃষ্টি পড়িল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "মা কি এবার কাঁদিতে কাঁদিতে পিত্রালয়ে আসিবেন?"

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলে, "তাহাই সঙ্গত। পূর্ব্বে এই শরতে বাঙ্গালার উৎসব ছিল; এখন শরতে ঘরে ঘরে শ্মশান রচিত হয়। দেশে স্বাস্থ্য নাই--সুখ নাই—আনন্দ নাই। এ অবস্থায় মা'র কাঁদিতে কাঁদিতে পিত্রালয়ে আসাই সঙ্গত।"

"চলুন ঘরে যাই।" বলিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় উঠিলেন ও মাতুরটি লইয়া যাইবার জন্য হুকা লইয়া আগত ভৃত্যকে আদেশ করিলেন।

এমন সময় একজন যুবক তথায় উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এই কি মহেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাটী?"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "হাঁ। কাহাকে চাহ?"

"তাঁহারই সহিত একটু কাযের কথা কহিতে আসিয়াছি।"

"আমারই নাম মহেশ্বর ভট্টাচার্য্য। বৃষ্টি পড়িতেছে, ঘরে চল।"

তিন জনে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। গৃহে প্রবেশ করিয়া দক্ষিণ দিকে প্রথম কক্ষে দুইখানি তক্তপোষের উপর সতরঞ্চি ও তদুপরি চাদর বিস্তৃত ছিল। তিন জন তাহাতে উপবিষ্ট হইলেন। যুবক এক পার্শ্বে পদদ্বয় ঝুলাইয়া বসিল দেখিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "উঠিয়া ভাল করিয়া উপবেশন কর।"

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন, "একালের ছেলেদের বান্ধা জুতা খুলা সহজ নহে।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় হাসিয়া বলিলেন, "আমরা বন্ধন ছাড়াইতে পারিলে নিশ্চিন্ত হই, আর ইহারা কেবল বন্ধনের উপর বন্ধনে পক্ষপাতী।"

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন, "সেটা বয়সের ধর্ম্ম। যে বয়সে বন্ধনেই সুখ, সে বয়সে বন্ধনমুক্ত হইতে চাহিলে সংসার চলিবে কিরূপে?"

যুবকের দিকে চাহিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন "আমার কাছে কি প্রয়োজন, বাবা?"

যুবক বলিল, "আপনার একটি বিবাহযোগ্যা কন্যা আছে।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে যুবককে ভাল করিয়া দেখিলেন ; বলিলেন, "হাঁ।"

"এখন বিবাহ দিবেন ?"

"ভাল পাত্র পাইলেই দিব ”

"আমার সন্ধানে একটি পাত্র আছে। পাত্রের পিতা পশ্চিমে এঞ্জিনিয়ার ; পাত্র পিতার একমাত্র পুত্র ; এণ্ট্রান্স পাস করিয়া—"

বাধা দিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "ভাল ও সকল কথা পরে হইবে। আমি স্বয়ং বন্দ্যোপাধ্যায়। পাত্র কি ?"

যুবক সপ্রতিভ ভাবে বলিলেন, "আমি কি তাহা না জানিয়া আসিয়াছি ? পাত্র মুখোপাধ্যায়।"

"মুখোপাধ্যায় ?—যোগেশ্বর পণ্ডিতের কাহার সন্তান ?"

যুবক এত কথা জানিয়া আইসে নাই ; বলিল "আমি সে সংবাদ লইয়া আসি নাই। আপনি এখন বিবাহ দিবেন কি না জানিতে আসিয়াছিলাম : সব সংবাদ লইয়া আর এক দিন আসিব।"

"ভাল। কোন্ গাঁই জান ?"

যুবক মস্তক কণ্ডূয়ন করিতে করিতে বলিল, "তাহা আমি বলিতে পারি না।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কোথা হইতে আসিতেছ ?"

"কলিকাতা হইতে।"

"বাবা, ঘটকালী তোমার কায নহে। তুমি ঘটক হইলে

পাত্রের পরিচয় না জানিয়া বুড়া মানুষের বাড়ী সম্বন্ধ করিতে আসিতে না।"

যুবক বিব্রত হইল; বলিল, "আমি নূতন ব্রতী।" তাহার পর সে নমস্কার করিয়া উঠিল।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "বৃষ্টিতে কোথায় যাইবে? একটু অপেক্ষা কর।"

"বিলম্ব হইলে ট্রেণ পাইব না।"

"এখন ত কোন ট্রেণ নাই।"

যুবক অপ্রতিভ হইল; কিন্তু অপ্রতিভ ভাব কাটাইয়া বলিল "পথ ভাল নহে একটু অগ্রে যাই।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বুঝিলেন, যুবক অপ্রতিভ হইয়াছে, আর কিছুক্ষণ থাকিলে পাছে আরও অপ্রতিভ হয় এই আশঙ্কায় যাই-তেছে। তিনি আর কিছু বলিলেন না।

যুবক চলিয়া গেল।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন, "ব্যাপারটা কি?"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "বুঝা গেল না। আজকালকার ছেলেদের বুঝা আমাদের সাধ্যাতীত।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় উঠিয়া বাহিরে যাইয়া যুবককে লক্ষ্য করিলেন। তাঁহার গৃহ হইতে কিছু দূরে রাজপথ দুই দিকে গিয়াছে। যে পথ ষ্টেশনের দিকে গিয়াছে যুবক সে পথে না যাইয়া যে পথ ঘাটের দিকে গিয়াছে সেই পথে গেল।

ঘাট হইতে কিছু দূরে তীরে একখানি নৌকা বদ্ধ ছিল। যুবক যাইয়া সেই নৌকায় উঠিল। সবন্ধু যতীশচন্দ্র সেই নৌকায় ছিল। যুবক উপস্থিত হইতেই দুই তিন জন জিজ্ঞাসা করিল, "সংবাদ কি?

যুবক বলিল, "এমন বিপদেও মানুষ পড়ে। আর একটু হইলেই ধরা পড়িতাম।" এই বলিয়া যুবক ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত কথোপকথনের সারাংশ বিবৃত করিল। শুনিয়া অমূল্য-চরণ বলিল, "তোমাদের যেমন কর্ম্ম তেমনই ফল ফলিয়াছে। আমি বুঝিয়াছিলাম, সুরেশ্বর একটা অনর্থ ঘটাইবে।"

একজন যুবক বলিল. "কিন্তু আপনি ত সে দিন সুরেশ্বরের বুদ্ধির প্রশংসা করিতেছিলেন!"

অমূল্যচরণ বলিল "তাহাতে কি? কেহ বুদ্ধিমানের কায করিলে তাহাকে বুদ্ধিমান্ বলিয়াছি বলিয়া কি সে নির্ব্বোধের কায করিলে তাহার বুদ্ধির নিন্দা করিব না?"

"এক জন লোক কি কখন বুদ্ধিমান্ এবং কখন নির্ব্বোধ হয়?"

"কথাটা ভাল করিয়া বুঝিয়া তবে তর্ক করা ভাল। ইংরা-জীতে একটা কথা আছে, শয়তানকেও তাহার যাহা প্রাপ্য তাহা দিবে। কোন লোক যদি কখন সুবুদ্ধির কার্য্য করে, তবে তাহার প্রশংসা করিতে কুণ্ঠিত হওয়া উদারতার পরিচায়ক নহে। তদ্ভিন্ন 'কর্ম্মণা বাধ্যতে বুদ্ধি।' সুরেশ্বর কি কখন এরূপ কার্য্য করিয়াছে যে, এ কার্য্যে সে দক্ষ হইবে? এরূপ কার্য্য শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা-

সাপেক্ষ, এরূপ কার্য্যে অশিক্ষিত লোক পটুত্ব লাভ করিতে পারে না।"

কথাটা ক্রমে তর্কের বিষয় হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া একজন যুবক বলিল, "যাহা হইবার হইয়াছে, সে বিষয় লইয়া তর্ক করা বৃথা; সুরেশ্বর যে ধরা পড়ে নাই, ইহাই সৌভাগ্য। আশা করি, ইহাতে আমাদের বন্ধুবরের ভবিষ্যৎ সৌভাগ্য সূচিত হইতেছে।"

অমূল্যচরণ বলিল, "আমিও সর্ব্বান্তঃকরণে সেই আশা করিতেছি। সুরেশ্বর যে ধরা পড়ে নাই, সেটা দৈবাৎ ঘটিয়াছে। কিন্তু তাহার ধরা পড়ার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল। আজকার এই অভিজ্ঞতা হইতে আমরা যেন ভবিষ্যতে সাবধান হইতে শিখি; অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত না হই।"

যে যুবক অমূল্যচরণের বাক্যে বিরক্ত হইয়াছিল, সে জনান্তিকে বলিল, "সদুপদেশ পিতামাতার নিকট, গুরুমহাশয়ের নিকট, এমন কি পাঠ্যপুস্তকেও অনেক পাইয়াছি। সে জন্য বন্ধুজনের সহিত প্রীতিভ্রমণে আসিবার প্রয়োজন ছিল না। অমূল্য বাবুর ভাবটা এইরূপ যে, পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডারের চাবি তাঁহারই হস্তগত; আমরা সব অজ্ঞান।"

তাহার পর নানা কথা হইতে লাগিল। কিন্তু যতীশচন্দ্র সে কথোপকথনে যেন সম্পূর্ণরূপে যোগ দিতে পারিতেছিল না; সে কেমন অন্যমনস্ক। সে কি ভাবিতেছিল। তাহার ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া এক জন রহস্য করিয়া বলিল, "ভায়া কি ইহারই

মধ্যে নিরাশ হইলে?" সকলে হাসিল। যতীশচন্দ্র সে হাসিতে হাসি মিশাইল। কিন্তু যতীশচন্দ্র সত্য সত্যই সরোজার কথা ভাবিতেছিল। শরতের অপরাহ্নে উজ্জল রবিকরে উদ্ভাসিতা—অসমগ্রভূষণা—হারদ্যোতিতবক্ষা—উদ্ভেদোন্মুখযৌবনার রূপ তাহার তরুণ হৃদয় মুগ্ধ করিয়াছিল। তাহার সঙ্গীদিগের কথায় তাহার হৃদয়ে যে আশাবীজনিক্ষিপ্ত হইয়াছিল বালিকার কুলপরিচয়ে সে বীজ ক্রমে অঙ্কুরিত হইয়াছিল। তাই আজ সে সরোজার কথা ভাবিতেছিল।

———

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

দুর্ভাবনা।

ধরণীধরের কতকগুলি বিশেষত্ব ছিল। তাঁহার মত বিষয়ী ব্যক্তির চরিত্রে তাহার কতকগুলি বিস্ময়কর বোধ হইত। তিনি অত্যন্ত মাতৃভক্ত ছিলেন, জননীর কথার প্রতিবাদ করা তাঁহার অভ্যাস-বিরুদ্ধ ছিল। তিনি যে স্থানেই থাকুন না কেন—যত ক্ষতি হয় অকাতরে সহ্য করিয়া শারদীয়া পূজার সময় গৃহে আসিতেন; বলিতেন, বিজয়ার দিন যে জননীকে প্রণাম করিতে না পারে, সে অতি দুর্ভাগ্য। একবার পূজার সময় তিনি কোন খরস্রোতা তরঙ্গিণীর উপর সেতু নির্ম্মাণ-কার্য্যের তত্ত্বাবধানে একজন ইংরাজের সহকারী ছিলেন। পূর্ত্তবিভাগের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া নদী দুইবার অর্দ্ধনির্ম্মিত স্তম্ভাদি ভাঙ্গিয়া আপনার স্রোতঃপথের বাধা দূর করিয়াছিল। দিনরাত্রি মজুর খাটাইয়া কায চলিতেছিল। এই অবস্থায় ধরণীধর পূজার ছুটীতে বাড়ী যাইতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার উপরস্থ কর্ম্মচারী বলিলেন, "তুমি কি পাগল হইয়াছ? যখন দিবসে আহারের ও রাত্রিকালে নিদ্রার সময় করিতে পার না—তখন ছুটী!" ধরণীধর বলিলেন, "সে যাহাই হউক, আমি যাইব। মা আমার পথ চাহিয়া আছেন।" কর্ম্মচারী বলিলেন, "টেলিগ্রাফ কর।" ধরণীধর বলিলেন, "মা বুঝিলেও আমার মন বুঝিবে না।" কর্ম্মচারী বিরক্ত হইলেন; বলিলেন, "আজ

তিন দিন হইল আমি তোমার পদ ও বেতন বৃদ্ধির জন্য লিখিয়াছি; তুমি এখন বাড়ী যাইলে আমি তোমার বিরুদ্ধে লিখিতে বাধ্য হইব।" ধরণীধর বলিলেন, "চাকরী যায় সেও ভাল, তথাপি অন্ততঃ এক দিনের জন্য একবার আমাকে যাইতেই হইবে।"—তিন দিন দিনরাত্রি পরিশ্রম করিয়া ধরণীধর স্তম্ভনির্ম্মাণকার্য্য শেষ করিয়া কর্ম্মস্থান ত্যাগ করিলেন। ডাকগাড়ী তাঁহার গ্রামের নিকটবর্ত্তী ষ্টেশনে থামে না। অগত্যা পরবর্ত্তী ষ্টেশনে নামিয়া পদব্রজে চারি ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া ধরণীধর গৃহে আসিলেন। সে দিন বিজয়া; রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে। যতীশচন্দ্র ঘুমাইয়াছে। সুপ্ত গৃহে ধরণীধরের জননী জাগিয়া আছেন। তাঁহার হৃদয়ে দুশ্চিন্তা—নয়নে অশ্রু। পুত্র কেন আসিল না? কখনও ত এমন হয় নাই! এমন সময় গৃহদ্বার হইতে ধরণীধর ডাকিলেন, "মা!" পুত্রের কণ্ঠস্বর শুনিয়া বিহ্বলা জননী দ্রুতপদে যাইয়া দ্বার মুক্ত করিলেন। পুত্র মাতৃচরণে প্রণত হইয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন। জননীর দুঃখাশ্রু আনন্দাশ্রুতে পরিণত হইল। বলা বাহুল্য ধরণীধর আসিবার পূর্ব্বে তিন দিন অসাধারণ পরিশ্রম করিয়া যে কার্য্য করাইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার উপরিস্থিত কর্ম্মচারীর বিরক্তির আর অবকাশ ছিল না; তিনি সানন্দে সহকারীকে ছুটী দিয়াছিলেন।

এবারও পূজার সময় ধরণীধর গৃহে আসিলেন। গৃহে আসিয়া তিনি গৃহাগত পুত্রের পাঠবিষয়ের সংবাদ লইলেন। অঙ্কশাস্ত্রে

তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল। তিনি পুত্রের অঙ্কে পারদর্শিতার পরীক্ষা করিয়া বিশেষ চিন্তিত হইলেন। তিনি বুঝিলেন, পুত্র অঙ্কশিক্ষার কোন চেষ্টাই করে নাই; তাহার পক্ষে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া অসম্ভব।

অমূল্যচরণ কিছুদিন পূর্ব্বে একখানি মাসিকপত্র বাহির করিয়াছিল। যতীশচন্দ্রের বহু রচনা তাহার গৌরব বর্দ্ধিত করিয়াছিল। যতীশচন্দ্র তাহাতে বিশেষ আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছিল। সে পত্রখানির কয় সংখ্যা এমন ভাবে—এমন স্থানে রাখিয়াছিল যে, ধরণীধর সহজেই সেগুলি দেখিলেন। কতকগুলি প্রবন্ধে পুত্রের নাম দেখিয়া তিনি যতীশচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ সব প্রবন্ধ কি তোমার রচনা?" যতীশচন্দ্র বলিল, "হাঁ।" সে মনে করিয়াছিল, তাহার এই কৃতিত্বের পরিচয়ে পিতা বিশেষ আনন্দ লাভ করিবেন। কিন্তু ইহাতে ধরণীধর আনন্দিত হইলেন না; পরন্তু ইহাতে তাঁহার দুশ্চিন্তা বর্দ্ধিত হইল। তিনি পুত্রকে বলিলেন, "পাঠ্যাবস্থায় নানা দিকে মন দিলে পাঠের অসুবিধা হয়। সেই জন্যই সেকালে এ দেশে শিক্ষার্থীর কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থা ছিল। য়ুরোপে বিদ্যালয়ে বাসব্যবস্থাও বোধ হয় এই কারণেই উদ্ভাবিত হইয়াছে। পাঠ্যাবস্থায় অনন্যকর্ম্মা হইয়া পাঠে মনোনিবেশ করাই কর্ত্তব্য। এখন প্রবন্ধ লিখিয়া কোন বিষয়ে মতপ্রকাশের বয়স তোমার হয় নাই। শিক্ষা সম্পূর্ণ কর, অভিজ্ঞতা লাভ কর—মতামত প্রচারের যথেষ্ট সুযোগ পাইবে। আমাদের

পণ্ডিত মহাশয় বলিতেন, বাখরগঞ্জের গুরুর শিক্ষা না পাইলে কাহারও মতের মূল্য হয় না,—অর্থাৎ চাউলের দর না জানিলে—সংসারের ব্যাপার না বুঝিলে কাহারও বুদ্ধি পরিপক্ক হয় না।" ইহার পর ধরণীধর পুত্রের কার্য্যের ও বন্ধুদিগের বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। জননীকে জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি জানিতে পারিলেন, তাহার বন্ধুরা মধ্যে মধ্যে তাঁহার গৃহে আসিয়া থাকে। তিনি অনেকের নাম সংগ্রহ করিলেন। বৃদ্ধা অমূল্যচরণের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার বিশেষ প্রশংসা করিলেন। জননীর নিকট তাহার কথা শুনিয়া ও তাহারই সম্পাদিত মাসিকপত্রে পুত্রের প্রবন্ধাদি দেখিয়া ধরণীধরের মনে হইল, তাহারই সহিত যতীশচন্দ্রের অধিক ঘনিষ্ঠতার সম্ভাবনা এবং তাহার পরিচয় জানিলেই তিনি তাহার বন্ধুদলের পরিচয় পাইবেন।

ধরণীধরের একজন পরিচিত ব্যক্তি কলিকাতায় থাকিতেন উভয়ে বহুদিন এক স্থানে কার্য্য করিয়াছিলেন। শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যমধ্যে পথিনির্ম্মাণজন্য উভয়ে একত্র বাস করিয়া বহু কষ্ট ও বিপদ্ সহ্য করিয়াছেন। এমনও হইয়াছে যে, তাম্বুর নিকট বন্য জন্তুর গর্জ্জন শুনিয়া উভয়ে অগ্নি জ্বালাইয়া একত্র জাগিয়া রাত্রি কাটাইয়াছেন। একের বিপদে অপরই সহায় ও সম্বল ছিলেন। ধরণীধর যদি সামাজিক হইতেন তবে রামতারণের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা প্রগাঢ় ও অনাবিল বন্ধুত্বে পরিণত হইত। কিন্তু বিপত্নীক ধরণীধর হৃদয়ের উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করিতে

পারিতেন না। তাঁহার সমস্ত স্নেহ ও ভালবাসা পুত্রকে দিয়া তিনি কেবল তাহারই জন্য কার্য্য করিতেন। কারণ, সেই পুত্রই তাঁহার পরলোকগতা পত্নীর একমাত্র স্মৃতি। নিঃসঙ্গ প্রবাসে এক এক দিন নিশীথে বিনিদ্র ধরণীধর পত্নীর উদ্দেশে বলিতেন, "তোমাকে এক দিনের জন্য সুখী করিতে পারি নাই। তুমি যাহাকে রাখিয়া গিয়াছ, যেন তাহাকে সুখী দেখিয়া মরিতে পারি। তাহা হইলেই এই দুঃখ-দাবানল-দগ্ধ নিষ্ফল জীবন সার্থক মনে করিব।" ধরণীধরের যাহাই হউক তাঁহার প্রতি রামতারণের ভালবাসার ও শ্রদ্ধার অভাব ছিল না। ধরণীধরের নির্ম্মল চরিত্র, প্রবল কর্ত্তব্যবুদ্ধি, অসাধারণ অধ্যবসায় রামতারণের হৃদয়ে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধার সঞ্চার করিয়াছিল রামতারণ কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া কলিকাতায় বাস করিতেছিলেন। এক দিন মধ্যাহ্নে ধরণীধরকে তাঁহার গৃহে উপস্থিত দেখিয়া তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। কয় বৎসর পরে উভয়ে সাক্ষাৎ—'সেকালের' অনেক করা হইল। তাহার পর ধরণীধর তাঁহার আগমনের কারণ বিবৃত করিলেন। রামতারণের পুত্র নিবারণচন্দ্র যতীশচন্দ্রের সহপাঠী ছিল। তাহার নিকট পুত্রসম্বন্ধে সংবাদ লইবার উদ্দেশ্যেই ধরণীধরের বন্ধু-গৃহে আগমন। শুনিয়া রামতারণ বলিলেন, "আমি শুনিয়াছি, যতীশ বাজে কাযে অধিক সময় দেয়, পাঠবিষয়ে কিছু অমনোযোগী। সে বড় দলে মিশিয়াছে। আমি দুই একবার মনে করিয়াছি, আপনাকে এ কথা লিখিব। কিন্তু লিখি নাই ;

কারণ, সে অন্য দিকে খ্যাতি অর্জ্জন করিতেছে, সেও ত সুখের বটে। বিশেষ সে আপনার একমাত্র সন্তান—তাহাকে ত আর উদরান্নের চিন্তায় চিন্তিত হইতে হইবে না।" ধরণীধর বলিলেন, "এখন হইতে অন্য দিকে মন দিলে কোন দিকেই কিছু হইবে না। ইঁচড়ে পক্ক ফলে কোন কাযই হয় না।" রামতারণ বলিলেন, "নিবারণ এখনই আসিবে। কলেজের ছুটীর সময় হইয়াছে।"

অল্পক্ষণ পরে পার্শ্বের কক্ষে পুত্রের পদশব্দ শুনিয়া রামতারণ ডাকিলেন, "নিবারণ!" যুবক গৃহে প্রবেশ করিয়া নতমস্তকে পিতার আজ্ঞাপ্রতীক্ষায় রহিল। রামতারণ বলিলেন, "যে ধরণীধর বাবুর কথা বহু বার তোমাদিগকে বলিয়াছি; যিনি বহু বার বহু বিপদে আমাকে রক্ষা করিয়াছেন ইঁনিই সেই ধরণীবাবু।" নিবারণ আসিয়া ধরণীধরকে প্রণাম করিল। "থাক্—থাক্" বলিয়া তিনি তাহাকে বসিতে বলিলেন। নিবারণ বসিল। তখন রামতারণ পুত্রের নিকট ধরণীধরের আগমনের কারণ বিবৃত করিলেন। ধরণীধর তাহাকে জ্ঞাতব্য বিষয়ে কয়েকটি প্রশ্ন করিলেন। নিবারণ বলিল, "আমি যতীশের সম্বন্ধে অধিক কিছু জানি না। সে আমাদিগের সহিত মিশে না। বাহিরেই তাহার বন্ধুর বাহুল্য। যাহা হউক আমি যতদূর পারি, সংবাদ লইয়া বাবাকে বলিব।"

ধরণীধর বিদায় লইলেন, এবং বন্ধুপুত্রের বিনীত ব্যবহারে ও পুত্রের চাঞ্চল্যে কি প্রভেদ, তাহাই ভাবিতে ভাবিতে বিহগ-কূজিত সায়াহ্নে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তাঁহার মুখ চিন্তামলিন।

ইহার ছয় দিন পরে শা'নগরের ঘাটে একখানি নৌকা লাগিল। নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া রামতারণ পথ জিজ্ঞাসা করিয়া ধরণীধরের গৃহে উপস্থিত হইলেন। ধরণীধর সংবাদের জন্য যাইবেন বলিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি আশা করেন নাই যে, রামতারণ সংবাদ লইয়া স্বয়ং আসিবেন। তাঁহার এই অপ্রত্যাশিত আগমনে ধরণীধর বিশেষ আনন্দিত ও আপ্যায়িত হইলেন। কিন্তু তিনি বুঝিতে পারেন নাই যে, বন্ধুবৎসল রামতারণ যে সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি অবিলম্বে বন্ধুকে তাঁহার পুত্রের বর্ত্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ বিপদ জ্ঞাপন করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া আসিয়াছেন। বাল্যের বন্ধুত্বের শীর্ণধারা অনেক সময় জীবনের বিস্তৃত বালুকাস্তৃত প্রান্তরে অদৃশ্য হইয়া যায়। যৌবনের বন্ধুত্ব অনেক সময় জোয়ারের জলের মত প্রবল ও উচ্ছ্বসিত এবং তাহারই মত অল্পকালস্থায়ী। বার্দ্ধক্যের বন্ধুত্ব স্থির—ধীর—গম্ভীর; তাহার চাঞ্চল্য নাই, কিন্তু গভীরতা আছে; তাই তাহা স্থায়ী।

দুই একটি কথার পর রামতারণ বলিলেন, "নিবারণ সকল সংবাদ লইয়াছে।"

ধরণীধর বন্ধুর মুখপানে চাহিলেন। সে সংবাদ বলিতে রামতারণের যেমন আগ্রহ ছিল—শুনিতে ধরণীধরের তেমনই ঔৎসুক্য ছিল।

নিবারণ সংবাদ আনিয়াছিল, যতীশচন্দ্র বিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট

াঠে অত্যন্ত অমনোযোগী। সে বিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট পাঠ তাহার
াত প্রতিভাবানের জন্য নহে, এই বিশ্বাসবশে সাহিত্যচর্চায়
শসঞ্চয়ের চেষ্টায় ব্যাপৃত। তাহার এক দল বন্ধু তাহার সেই
বশ্বাস দৃঢ় করিতে ও সেই চেষ্টাবিষয়ে তাহাকে উৎসাহিত
করিতে ব্যাপৃত। তাহাদের কথায় যতীশচন্দ্র আপনাকে
াতিরিক্ত প্রতিভাবান্ বিবেচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছে।
াহার বন্ধুদিগের মধ্যে অমূল্যচরণ সর্ব্বপ্রধান। এখন তাহার
পের অমূল্যচরণের প্রভাবই অত্যন্ত অধিক। এই অমূল্যচরণের
রিচয় পাইয়াই রামতারণ কিছু চিন্তিত হইয়াছেন ও ব্যস্ত হইয়া
ন্ধুগৃহে উপস্থিত হইয়াছেন।

অমূল্যচরণ মাতুলের পরিচয়ে পরিচিত। তাহার মাতুল
লিকাতা-সমাজে বিত্তে ও বিদ্যায় বিখ্যাত ছিলেন। সকলেই
াহাকে শ্রদ্ধা করিত। তিনি সুচরিত্র, বিদ্বান্; কিন্তু দরিদ্র পাত্রে
গিনীদান করিয়াছিলেন। ভগিনীপতি হাইকোর্টে উকীল
ইয়া তাঁহারই একটি মোকর্দ্দমা পরিচালনের জন্য মফঃস্বলে
াইয়া বিসূচিকায় প্রাণত্যাগ করেন। সে শোকে অমূল্যচরণের
তুল একান্ত কাতর হইয়াছিলেন। তখন হইতে ভগিনী ও
গিনীর একমাত্র সন্তান দশমবর্ষ বয়স্ক বালক অমূল্যচরণ তাঁহার
সারভুক্ত হয়েন। ভগিনীই সে সংসারের কর্ত্রী ছিলেন
তুল ভাগিনেয়ের শিক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন।
াগিনেয় সাহিত্য ব্যতীত অন্য বিষয়ের অধ্যয়নে কোনরূপ উন্নতি
রিতে পারিল না দেখিয়া তিনি অগত্যা তাহার ইংরাজী, সংস্কৃত

ও বাঙ্গালা শিক্ষার সুব্যবস্থা করিয়া দেন। ফলে তাহার ইংরাজীর সহিত নগণ্য, সংস্কৃতের সহিত অল্প ও বাঙ্গালার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। মাতুল স্নেহাধিক্যহেতু ও লোকনিন্দাভয়ে ভাগিনেয়কে আবশ্যকমত শাসন করিতে পারিতেন না; এ দিকে মাতামহীর আদরটা কিছু অতিরিক্ত ছিল, ইহাতে অমূল্যচরণ কিছু উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠে। সে উচ্ছৃঙ্খলতা মাতুলের বিশেষ ক্লেশের কারণ হইয়াছিল। অমূল্যচরণ তাঁহার পুত্রাধিক প্রিয় ছিল, তাঁহার পুত্রগণও অমূল্যচরণের অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ ছিল। এ অবস্থায় তিনি আশা করিয়াছিলেন, তাঁহার অবর্ত্তমানে অমূল্যচরণই তাহাদিগের অভিভাবক হইবে। তিনি সে আশায় হতাশ হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার ভাগিনেয় বলিয়া ও অনেক স্থলে প্রতিনিধি হইয়া অমূল্যচরণ কলিকাতার সমাজে পরিচিত হইয়াছিল। তাহাতে সে আচার-ব্যবহারে "লেফেপাদুরস্ত" হইয়াছিল। বিশেষ আপনার অজ্ঞতা ও অক্ষমতা গোপন করিয়া বিজ্ঞতার ও ক্ষমতার ভাণ করিতে তাহার অসাধারণ দক্ষতা ছিল। তাই লম্বশাটপটাবৃত অমূল্যচরণ সমাজের উচ্চস্তরেও প্রবেশাধিকার হইতে বঞ্চিত হয় নাই। তাহার মাতুল মৃত্যুকালে তাহাকে ২৫০০০. টাকা দিয়া গিয়াছিলেন। সেই অর্থ হাতে পাইয়া তাহার উচ্ছৃঙ্খলতা বর্ষাবারিপাতে স্রোতস্বতীর মত কুলপ্লাবিনী হইয়া উঠে। ফলে সে, সে অর্থ নষ্ট করিয়াছে। সংপ্রতি সে একখানি মাসিক পত্র বাহির করিয়াছে। যতীশচন্দ্র তাহাতে তাহার প্রধান সহায়। চরিত্রহীন উচ্ছৃঙ্খল অমূল্যচরণের সহিত ঘনিষ্ঠতা বন্ধুপুত্রের

পক্ষে অকল্যাণকর হইবার সম্ভাবনা বুঝিয়াই রামতারণ আজ বন্ধুকে সে কথা বলিতে আসিয়াছিলেন।

সকল কথা শুনিয়া ধরণীধর চিন্তিত হইলেন; কিন্তু তখনও তিনি অমূল্যচরণের সহিত পুত্রের ঘনিষ্ঠতার স্বরূপ বুঝিতে পারিলেন না। তিনি মনে করিলেন, যতীশচন্দ্র কেবল প্রবন্ধ লিখিয়া মাসিক পত্র প্রকাশে অমূল্যচরণকে সাহায্য করে।

তিনি তাহাকে যে অর্থ দিতেন তাহা যে তাহার প্রয়োজনাতিরিক্ত এবং সে যে পিতামহীর নিকটও অর্থ পাইত এবং সেই অর্থ যে অমূল্যচরণ পত্র প্রকাশের নাম করিয়া লইত তাহা তিনি জানিতেন না।

বন্ধু গৃহে "মিষ্টমুখ" করিয়া রামতারণ বিদায় লইলেন। ধরণীধর তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ঘাট পর্য্যন্ত গমন করিলেন এবং রামতারণের নৌকা ছাড়িয়া দিলে ভাবিতে ভাবিতে গৃহাভিমুখগামী হইলেন। তখন পশ্চিম গগনে দিনান্তশোভা ফুটিয়া উঠিয়াছে। দূরে প্রান্তরের পরপারে তরুরাজির শ্যামশোভা যেন অবিচ্ছিন্ন। কেবল কতকগুলি তাল ও নারিকেল তরু নিঃসঙ্গ গর্ব্বে উর্দ্ধে মস্তক তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। নারিকেল তরুর পত্র-মুকুট আনত—তালের নবপত্রগুলি উর্দ্ধগ—যেন পুরাতনগুলিকে পদতলে ফেলিয়া উঠিতে চাহিতেছে। পশ্চাতে গগন অস্তগত রবির কিরণজালে রক্তাভারঞ্জিত। কেবল নিম্ন হইতে কতকগুলি মেঘ ধীর নিশ্চিত গতিতে উঠিয়া ক্রমে সমস্ত গগন অন্ধকার করিতেছে। সেই সান্ধ্য গগনে ধরণীধর আপনার

জীবনের সাদৃশ্য উপলব্ধি করিলেন। তাঁহার জীবনের সায়াহ্ন অমনই আশার রক্তাভারঞ্জিত ছিল। কিন্তু কালমেঘ উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে।

দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া ধরণীধর গৃহে প্রবেশ করিলেন। সেই দিন রাত্রিকালে আহারের সময় তাঁহার জননী পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর কি কোন অসুখ হইয়াছে?"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

গৃহে।

ধরণীধর প্রথমে মনে করিয়াছিলেন, বড়দিনের ছুটীর সময় দুই মাসের ছুটী লইয়া গৃহে আসিবেন; ততদিনে পুত্রের বিদ্যালয় বন্ধ হইবে—তিনি তাহাকে নিকটে রাখিয়া তাহার অধ্যয়নের তত্ত্বাবধান করিবেন। কিন্তু রামতারণের নিকট তিনি যাহা অবগত হইলেন, তাহাতে তিনি কিছু বিচলিত হইলেন। শেষে তিনি স্থির করিলেন, ততদিন বিলম্ব করাও যুক্তিসঙ্গত হইবে না—তিনি তৎপূর্ব্বেই বাড়ী আসিবেন। এইরূপ স্থির করিয়া তিনি কর্ম্মস্থানে গমন করিলেন।

কর্ম্মস্থান হইতে আসিবার পূর্ব্বে তিনি জননীকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা ডাকবিভাগের কৃপায় শা'নগরে না যাইয়া শ্যামনগরে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির সন্ধানে হরকরাদিগকে কষ্ট দিয়া শেষে "এ নামের কোন মালিক গ্রামে নাই"—২নং পিয়ন চন্দ্রকান্তের এই মন্তব্যসহ প্রত্যর্পিত হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহার আগমন-সংবাদ গৃহে পৌঁছে নাই।

ধরণীধর নৌকায় আসিতেছিলেন,—ভারতের পাপহারিণী পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর প্রবাহে উজান বাহিয়া নৌকা অগ্রসর হইতেছিল। ধরণীধর এবার কিছু অধিক দিনের জন্য গৃহে আসিতেছিলেন—সঙ্গে জিনিসপত্র কিছু অধিক ছিল। সে সকলের মধ্যে পুস্তকই অধিক। ধরণীধরের কোন সখ ছিল না।

তিনি তাঁহার ব্যর্থসুখভোগ জীবনে—নিঃসঙ্গ প্রবাসে কেবল বিদ্যাচর্চ্চায় শান্তি ও সান্ত্বনা, সুখ ও আনন্দ পাইতেন। আর তাঁহার হৃদয়ে অভিলাষ ছিল,—পুত্র যতীশচন্দ্রকে তিনি সর্ব্ববিধ অভাব হইতে অব্যাহতি লাভের উপযুক্ত অর্থ দিবেন,—সে স্বচ্ছন্দে জ্ঞানার্জ্জন করিয়া খ্যাতিলাভ ও পারিবারিক সুখভোগ করিবে; তাঁহার জীবনে অবস্থা-বিপাকে এই উভয়ের একটিও লাভ ঘটে নাই। এই আকাঙ্ক্ষার জন্যই তিনি আজও বিদেশে চাকরী করিতেছেন; তাঁহার জীবনের সায়াহ্ন অনায়াসে কাটাইবার জন্য আবশ্যক সঞ্চয় তিনি বহুদিন পূর্ব্বেই করিয়াছেন—সে জন্য এখনও তাঁহার প্রবাসক্লেশ সহ্য করা নিষ্প্রয়োজন।

নৌকা অগ্রসর হইতেছিল। গঙ্গাপ্রবাহের দিকে চাহিয়া ধরণীধর ভাবিতেছিলেন, এই গঙ্গার কূলে প্রাচীন ভারতের সভ্যতা—প্রাচীন ভারতের মানস-পদ্ম বিকশিত হইয়াছিল, তাহার সৌরভ আজও শিল্পে ও সাহিত্যে বর্ত্তমান; এই গঙ্গার কূলে প্রাচীন ভারতবাসীরা যে ধর্ম্ম ও সমাজশৃঙ্খলা উদ্ভাবিত করিয়াছিলেন এত দিনেও তাহা বিলুপ্ত হয় নাই—কত ধর্ম্ম কত সমাজ কালসাগরে বিলীন হইয়াছে, কিন্তু ভারতীয় ধর্ম্ম ও সমাজ আজও বর্ত্তমান; তাহার পর এই গঙ্গার কূলে রক্তাসক্ত বিজয়লালসার নিবৃত্তি হইলে আর্য্য ও সেমিটিক সভ্যতার অপূর্ব্ব মিলন হইয়াছিল, যে ধর্ম্ম আরবের মরুভূমি হইতে মরুবাত্যার মত প্রলয়মূর্ত্ত প্রবল বেগে বাহির হইয়াছিল তাহাও এই গঙ্গার কূলে আসিয়া স্নিগ্ধ শান্তি লাভ করিয়াছিল; তাহার পর নূতন

অঙ্কে নূতন দৃশ্য, কিন্তু যে নগণ্য গ্রাম ইংরাজের রাজধানী হইয়া আজ প্রাসাদমালিনী মহানগরীর শ্রী ধারণ করিয়াছে সেই কালিকাতাও গঙ্গার কূলে অবস্থিত। কত বিপ্লববাত্যা, কত পরিবর্ত্তন-প্রবাহ গিয়াছে; কিন্তু গঙ্গা সমভাবে ভারতবর্ষকে স্নিগ্ধতা ও উর্ব্বরতা দান করিয়া ধন্য করিতেছে।

সহসা নদীকূলে বাদ্যরব তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। ধরণীধরের মনে পড়িল—আজ জগদ্ধাত্রী পূজার বিজয়া। তিনি চাহিয়া দেখিলেন, কাহারা গঙ্গাজলে প্রতিমা বিসর্জ্জন করিতে আসিয়াছে। সংসারের গতিই এইরূপ। পূর্ব্বদিন যে প্রতিমাকে অবলম্বন করিয়া জগজ্জননীর সত্বা অনুভব করিতে সচেষ্ট হইয়াছি; যাহার চরণতলে প্রণত হইয়া মহাশক্তির লীলা দেখিয়া বিস্মিত, স্তম্ভিত, ভক্তিরসাপ্লুত হইয়াছি, আজ আর তাহাকে কোন প্রয়োজন নাই, তাই আজ সে প্রতিমা নদীজলে নিক্ষিপ্ত হইতেছে! ধরণীধর ভাবিলেন, তাঁহার বাল্যকালে বাঙ্গালার পল্লীতে পল্লীতে কত পূজা হইত, পূজায় কি আনন্দ—কি উৎসব ছিল। তখন এই সব উৎসবে মিলনের আনন্দালোকে সমাজের সকল স্তর উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত। আর এখন? ধরণীধর ভাবিলেন—কত অল্প দিনে কি পরিবর্ত্তন! কিন্তু পুরাতন উৎসব গেল, কোন নূতন উৎসব তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে কি? উৎসবহীন—আনন্দহীন—সুখহীন জাতি কত দিন আপনার অস্তিত্বসংরক্ষণে সমর্থ হইবে?

ধরণীধর ভাবিতে লাগিলেন। নৌকা অগ্রসর হইতে লাগিল।

নৌকা যখন শা'নগরের ঘাটে আসিয়া ভিড়িল, তখন দিন শেষ; পশ্চিম গগনে অস্তগমনোন্মুখ তপনের তেজহীন আলোক গঙ্গা-সলিলে ঝিকিমিকি জ্বলিতেছে। ধরণীধরের নৌকা ঘাটে ভিড়িবার অল্পক্ষণ পূর্ব্বে আর একখানি নৌকা ঘাটে ভিড়িয়াছিল। সে নৌকা হইতে কয়জন যুবক অবতরণ করিয়াছিল। ধরণীধর গৃহে যাইয়া দ্রব্যাদির জন্য ভৃত্যকে পাঠাইবেন বলিয়া কূলে অবতরণ করিলেন। যুবকগণ তাঁহার অগ্রে অগ্রে যাইতেছিল। তাহাদের কথোপকথন তাঁহার শ্রবণগোচর হইল। একজন বলিল, "আজ যাওয়াটাই বৃথা হইল।" আর একজন বলিল, "কেন?" প্রথম বক্তা বলিল, "কায ত কিছুই অগ্রসর হইল না।" তৃতীয় জন বলিল, "ও হে পথঘাটের সন্ধান না জানিয়া কি দুর্গ জয় করা যায়? সব সংবাদ হস্তগত হইলে তখন কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণে বিলম্ব হয় না; সাফল্যও সহজ হয়। ক্রমে সব সংবাদ সংগ্রহ করা যাইতেছে।" চতুর্থ ব্যক্তি বলিল, "যোগ্যে যোগ্যে মিলন প্রকৃতির নিয়ম। এ ক্ষেত্রে সে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিবে কেন? তবে সব কায অল্পসময়সাধ্য হয় না।" প্রথম বক্তা বলিল, "যতীশ বাবুর এ বিবাহ সংঘটিত হইবেই। অমূল্য বাবু, শ্যামাপূজার সময় আপনি আসিতে পারেন নাই; আমরা আসিয়াছিলাম। সেই সময় আমরা কথাপ্রসঙ্গে ঠাকুরমা'কে বলিয়াছি, ইচ্ছাপুরে মহেশ্বর ভট্টাচার্য্যের একটি পরমা সুন্দরী অবিবাহিতা কন্যা আছে। তাহার সহিত যতীশবাবুর বিবাহ হইলে বড় মানায়। সুরেশ আমার কথায় সায় দিয়া বলিয়াছিল

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাড়ীর পার্শ্বেই তাহার মাতুলালয়। সে-ও মেয়েটিকে দেখিয়াছে।" একজন বলিল, "সুরেশের ত মাতুলালয়, আর তোমার?" জিজ্ঞাসিত হইয়া যুবক উত্তরে বলিল, "শ্বশুরালয়।" সে অকৃতদার; সকলে খুব হাসিল। এমন সময় নৌকা হইতে মাঝি ডাকিতে ডাকিতে আসিল, "বাবুরা — ওগো বাবুরা; নৌকায় এই ছড়ি ফেলিয়া আসিয়াছেন।" যুবকগণ পশ্চাদ্দিকে চাহিল। যতীশচন্দ্র দেখিল, ধরণীধর আসিতেছেন। তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। মুহূর্ত্তের জন্য সে আপনার নয়নকে বিশ্বাস করিতে পারিল না। তাহার পর সে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় কয়েক মুহূর্ত্ত দাঁড়াইয়া থাকিবার পর যাইয়া পিতৃচরণে প্রণত হইল। তাহার সঙ্গীরা পূর্ব্বে কখনও ধরণীধরকে দেখে নাই। তাহারা বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মাঝি ছড়ি দিয়া চলিয়া গেল।

যতীশ নতদৃষ্টি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল; কি বলিবে বুঝিতে পারিল না। তাহার পদদ্বয় কম্পিত হইতে লাগিল। ধরণীধর পুত্রকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "ইঁহারা তোমার বন্ধু?"

যতীশ মুখ তুলিল না, মৃদুস্বরে বলিল, "হাঁ।"

"বাটীতে সংবাদ দিয়াছ? ইঁহাদের আহাদের ব্যবস্থা করা হইয়াছে?"

"হাঁ।"

তখন ধরণীধর যুবকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,

"আপনারা আমার পুত্রের বন্ধু। আমি বিদেশে থাকি, তাই আপনাদিগের সহিত আমার পরিচয় হয় না। আজ আপনাদিগের সহিত সাক্ষাতে পরম প্রীত হইলাম।"

যুবকগণ বৃদ্ধের পরিচয়ে স্তম্ভিত হইল। অমূল্যচরণ সর্ব্বাগ্রে বিপন্নভাব গোপন করিয়া আসিয়া ধরণীধরকে প্রণাম করিল। তাহার পর একে একে সকলেই ধরণীধরকে প্রণাম করিল। তিনি তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তাহাদিগের পরিচয় লইতে লইতে গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু যুবকগণ বুঝিতে পারিল না, তিনি তাহাদিগের ব্যবহার ও বাক্যালাপ বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিতেছিলেন।

গৃহে আসিয়া ধরণীধর স্বয়ং যুবকদিগের আহারের তত্ত্বাবধান করিলেন; এবং সেই অবসরে তাহাদিগকে বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিলেন। তাহার পর তাহারা বিদায় লইল।

যতীশ সে দিন আর পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিল না।

সে দিন রাত্রিকালে শয্যায় শয়ন করিয়া ধরণীধর ভাবিতে লাগিলেন। তিনি দীর্ঘ পথ ভ্রমণ করিয়া শ্রান্ত হইয়াছিলেন। তথাপি তাঁহার নয়নে নিদ্রা আসিল না। দুশ্চিন্তাজনিত মানসিক চাঞ্চল্য তাঁহাকে জীবনে মৃত্যুর আস্বাদ,—ব্যথিত শোকাতুর সকলের যন্ত্রণার নির্ব্বাণোপায়—নিদ্রাসুখ লাভ করিতে দিল না। তিনি পুত্রের কথা ভাবিতে লাগিলেন। আজ তাঁহার তাহার বন্ধুদিগকে লক্ষ্য করিবার সুযোগ হইয়াছিল। তিনি তাহাদিগকে,

বিশেষতঃ অমূল্যচরণকে, দেখিয়া শঙ্কিত হইয়াছেন। উচ্ছৃঙ্খলতা ও অতিরিক্ত সুরাপান তাঁহার দেহে আপনাদের কলঙ্কিত স্পর্শচিহ্ন মুদ্রিত করিয়া গিয়াছিল; সে চিহ্ন ধরণীধরের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে নাই। ধরণীধর স্বভাবতঃ সকল বস্তুকে ও ব্যক্তিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লক্ষ্য করিতেন; তাঁহার অবলম্বিত ব্যবসায়ে তাঁহার সেই স্বাভাবিক পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি শাণিত অস্ত্রের মত তীক্ষ্ণ হইয়াছিল। আবার বহুবিধ লোকের সহিত ব্যবহারের ফলে তিনি লোকচরিত্রবিচারে বিলক্ষণ দক্ষতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। অমূল্যচরণকে চিনিতে তাঁহার বিলম্ব হয় নাই। তিনি পুত্রের কল্পিত ভবিষ্যৎ জীবনে তাহার ছায়াপাতে শঙ্কিত হইয়াছিলেন। আজ দুশ্চিন্তাতাড়িত ধরণীধরের মানসপটে মৃত্যুশয্যায় শয়ান পত্নীর মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিল। ধরণীধরের নয়নে অশ্রু দেখা দিল। তিনি উদ্দেশে বলিলেন, "তুমি তোমার পুত্রকে আশীর্ব্বাদ কর। তোমার পুণ্যে—তোমার আশীর্ব্বাদে পুত্রের সকল অকল্যাণ দূর হইবে,—সকল বিপদের অবসান হইবে।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পিতাপুত্র।

ধরণীধর গৃহে আসিলেন। তখনও যতীশচন্দ্রের বিদ্যালয় বন্ধ হয় নাই; কাযেই সে কলিকাতায় থাকিত, শনিবারে গৃহে আসিত। সপ্তাহান্তে পিতাপুত্রে সাক্ষাৎ হইত। যতীশচন্দ্রের মনোভাব গোপনের চেষ্টা সত্ত্বেও ধরণীধর স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেন, শনিবারে গৃহে আসিয়া যতীশ কেবল ভাবিত, কবে সোমবার আসিবে—সে কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবে। পিতা যখন পুত্রকে নিকটে পাইবার জন্য এত ব্যাকুল, পুত্র তখন পিতার সান্নিধ্য ক্লেশকর বোধ করে! কেন এমন হয়? স্নেহশীল পিতা আপনার নিকট আপনাকে দোষী প্রতিপন্ন করিয়া পুত্রের ব্যবহারের সমর্থন করিতে চেষ্টা করিলেন। তিনি ভাবিলেন, দোষ তাঁহার। তিনি বিদেশে থাকেন, পিতাপুত্রে বর্ষান্তে বা বর্ষমধ্যে দুই বার সাক্ষাৎ হয়—সে-ও অল্প দিনের জন্য; এ অবস্থায় পিতাপুত্রের মধ্যে স্বাভাবিক স্নেহসম্বন্ধ শিথিল হওয়া বিস্ময়ের বিষয় নহে; কিন্তু এ চিন্তায়—এই কথায় মন শান্ত হইল না। স্নেহ নিম্নগামী সত্য; কিন্তু স্নেহ কি স্নেহ আকৃষ্ট করে না? আর তিনি যে সংসারের সকল সুখ স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিয়া নিঃসঙ্গ প্রবাসে জীবন যাপন করিতেছেন, সে কাহার জন্য? সেই বিদেশে তাঁহাকে রোগে শুশ্রূষা করিবার কেহ নাই; তাঁহার মৃত্যুকাল

সমাগত হইলে পিপাসাশুষ্কমুখে জলবিন্দু দিবার কেহ থাকিবে না,—হয় ত কোন বনমধ্যে বা গিরিশিখরে ভৃত্যগণকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত তাঁহার শব শৃগালকুকুরের আহার হইবে। তিনি কাহার জন্য বিদেশে শ্রম করিয়াছেন ও করিতেছেন? পুত্র কি তাহা বুঝিতে পারে না? ধরণীধর ভাবিতেন। সে ভাবনায় কেবল যাতনা। তাঁহার যথেষ্ট অবসর—যে কায লইয়া তিনি সময় কাটাইতেন—হৃদয়ের শোক ভুলিতেন—এখন সে কায নাই, কাযেই ভাবনার অন্ত ছিল না। সময় সময় যখন দুশ্চিন্তার ভারে হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়িত তখন তিনি কোন ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিতেন; মনকে বুঝাইতেন, তিনি তাঁহার কর্ত্তব্য পালন করিতেন—তাহাই তাঁহার কার্য্য। হায় কর্ত্তব্য, তুমি অনেক সময় সংসারমরুভূমিতে মরীচিকা মাত্র—শ্রান্ত পথিককে কেবল দ্বিগুণ যাতনা দান কর!

এই ভাবে মাসাধিক কাল কাটিবার পর যতীশচন্দ্রের কলেজ বন্ধ হইল। সে গৃহে আসিতে চাহিল না—তখনও পরীক্ষার দুই মাস বিলম্ব আছে, এই সময়ের মধ্যে সতীর্থদিগের সহিত অনেক আবশ্যক বিষয়ের আলোচনা ও শিক্ষকদিগের নিকট আবশ্যক বিষয় জানিয়া লওয়া আবশ্যক হইবে—এই ওজুহতে সে কলিকাতায় থাকিতে চাহিল। কিন্তু ধরণীধর বলিলেন, যখন সে যে দিন ইচ্ছা প্রভাতে কলিকাতায় যাইয়া অপরাহ্নে ফিরিয়া আসিতে পারিবে, তখন তাহার পক্ষে গৃহে আসাই শ্রেয়ঃ, বিশেষ গৃহে অধ্যয়নে কোনরূপ অন্তরায় ঘটিবে না, এবং

গণিতসম্বন্ধে তিনি আবশ্যক সাহায্য করিতে পারিবেন। নিতান্ত অনিচ্ছায় যতীশ গৃহে আসিল।

গৃহবাস যতীশের ভাল লাগিত না; সে কলিকাতায় তাহার সাহিত্যিক সহচরদিগের সহিত মিশিবার জন্য ব্যস্ত হইত। বিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট নীরস পুস্তক পাঠে তাহার চিত্ত আকৃষ্ট হইত না; অথচ তাহাকে সেই সকল পুস্তক পাঠে দীর্ঘ দিন অতিবাহিত করিতে হইত। এ অবস্থায় তাহার যে প্রায়ই কলিকাতায় যাইবার প্রয়োজন হইত, তাহা বলাই বাহুল্য।

ধরণীধর পুত্রের ব্যবহার লক্ষ্য করিতে লাগিলেন—তাহার ব্যবহারে ব্যথিত হইতে লাগিলেন। তিনি বুঝিলেন, বিহগ-শাবক যখন আপনার পক্ষে ভর দিয়া অনন্ত অম্বরে উড়িতে শিখে—সে যখন আপনি আপনার আহার্য্য সংগ্রহ করিতে পারে, তখন বাহিরে তাহার সহস্র বিপদের সম্ভাবনা থাকিলেও বিহগ-জননীর পক্ষে তাহাকে আর নীড়ে—আপনার পক্ষতলে রক্ষা করা অসম্ভব। তাহা বুঝিয়া পুত্রের বিপদসম্ভাবনায় তিনি চঞ্চল হইলেন। পিতামাতার এই স্নেহসঞ্জাত চাঞ্চল্যে আমরা তরুণ বয়সে বিরক্ত হই; কারণ, আশঙ্কা পরিণত বয়সের ধর্ম্ম; কিন্তু যখন আমরা তরুণ বয়স অতিক্রম করিয়া প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হই—যখন পুত্রকন্যার বিপদশঙ্কায় আমাদিগের পিতৃহৃদয় চঞ্চল হইতে আরম্ভ হয়, তখন আমরা সে চাঞ্চল্যের স্বরূপ বুঝিতে পারি এবং পিতামাতার প্রতি পূর্ব্বব্যবহার স্মরণ করিয়া অনুতপ্ত হই

কিন্তু অধিকাংশ স্থলে তখন তাঁহারা সে চাঞ্চল্যের অতীত হইয়া চির-শান্তি লাভ করিয়াছেন।

পুত্রের পাঠে অমনোযোগ লক্ষ্য করিয়া ও অঙ্কশাস্ত্রে তাহার আবশ্যক দক্ষতার অভাব দেখিয়া ধরণীধর বুঝিলেন, তাহার পক্ষে এবার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার আশা নাই। ইহা বুঝিয়া তিনি তিনি বিশেষ দুঃখিত হইলেন। তিনি প্রবাসে পুত্রের সমুজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সাফল্যের সুখস্বপ্নে সকল দুঃখ সকল অসুবিধা তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন; পুত্রের জন্য শ্রম করিয়া আপনার ব্যর্থ জীবন সার্থক মনে করিতেন। এখন পুত্রের ব্যবহারে সে স্বপ্ন টুটিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু হতাশা অপেক্ষা আশঙ্কা তাঁহার অধিক বেদনার কারণ হইয়া দাঁড়াইল। পূর্ব্ববার গৃহে আসিয়া বন্ধু রামতারণের কথাতেও যে আশঙ্কা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে নাই—যে আশঙ্কা স্নেহপ্রবণ পিতৃহৃদয়ে পুত্রের প্রতি বিশ্বাস শিথিল করিতে পারে নাই, অমূল্যচরণের দর্শনে সে আশঙ্কার স্বরূপ সপ্রকাশ হইয়াছিল সেই বিশ্বাস বিচলিত হইয়াছিল। পুত্র এমন বন্ধু কেমন করিয়া সংগ্রহ করিল? লোকের বন্ধু দেখিয়া যদি লোকের চরিত্র বুঝা যায় তবে সতীশ এখন নিষ্কলঙ্ক, কিন্তু যে "অসৎ সঙ্গে থাকিলে পরে অধর্ম্মের ফল ফলে" সেই অসৎসঙ্গে থাকিয়া সে কত দিন অবিচলিত থাকিতে পারিবে? পথ পিচ্ছিল—পথিক সংসার জ্ঞানানভিজ্ঞ, তাহার পক্ষে সতর্কতা অস্বাভাবিক। এ অবস্থায় পদে পদে পদস্খলনের সম্ভাবনা। এই সকল ভাবনায় ধরণী-

ধরের হৃদয় সর্ব্বদাই বাত্যাবিক্ষুব্ধ বারিধির মত চঞ্চল থাকিত। তিনি প্রবাস হইতে গৃহে আসিয়া সুখলাভ করা দূরে থাকুক নূতন অসুখে পীড়িত হইতে লাগিলেন। কেবল প্রবাসেও যেমন গৃহেও তেমনই অধ্যয়নে তিনি সময় সময় সকল দুঃখ ভুলিতেন,—সকল আশঙ্কা হইতে অব্যাহতি লাভ করিতেন,—সকল দুশ্চিন্তা হইতে মুক্ত হইতেন।

এক দিন মধ্যাহ্নে—আহারের পর স্বীয় কক্ষে ধরণীধর 'বঙ্কু-পুরাণ' পাঠ করিতেছেন এমন সময় তাঁহার জননী সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। সে দিন একাদশী। মা'কে দেখিয়া ধরণীধর পুস্তকপাঠ বন্ধ রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, আজ একটু শুইলে না?"

মা বলিলেন, "শীতের বেলা দেখিতে দেখিতে যায়; তাই আজ শুই নাই। একটা কথা বলিব বলিব মনে করি, হইয়া উঠে না; আজ বলিতে আসিয়াছি।"

"কি কথা, মা?"

"যতীশের বিবাহ দিতে হইবে। ছেলে ডাগর হইয়াছে আমি আর কত দিন বাঁচিব? আমার সাধও বটে, আর বৌকে ত সংসারের কায শিখাইয়া যাইতেও হইবে। আমি আর কোন আপত্তি শুনিব না।"

দুই বৎসর হইতে মা যতীশের বিবাহের কথা বলিতেছেন এত দিন ধরণীধর বিলম্ব করিয়াছেন। কিন্তু এবার তাঁহার মত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। চঞ্চল হৃদয় শান্ত করিতে—উদ্ভ্রান্তকে

সংসারে বদ্ধ করিতে প্রেমের মত উপায় আর নাই। যুবকের তরুণ হৃদয়ে প্রেম-পিপাসা স্বাভাবিক ; তাই বধূর প্রেম-বন্ধনে বদ্ধ করিয়া পুত্রকে বিপদের পথ হইতে ফিরাইয়া আনিবার কথা এবার ধরণীধরের মনে হইয়াছে। কাযেই এবার আর তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ববারের মত পুত্রের অধ্যয়নে ক্ষতির সম্ভাবনার কথা বলিয়া জননীর প্রস্তাবে কোন অপত্তি করিলেন না; বলিলেন,—"আমি পাত্রীর সন্ধান লইব। গ্রামে ত আর ঘটক নাই। কলিকাতায় যাইয়া রামতারণকে বলিয়া আসিব কি ?"

মা বলিলেন, "সে-ই ভাল কথা। আমি একটি পাত্রীর সন্ধান পাইয়াছি ; যতীশের দুই জন বন্ধু মেয়েটিকে দেখিয়াছে। তাহারা বলে, মেয়েটি যেন সাক্ষাৎ ভগবতী।"

মা'র কথা শুনিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের দিন নদীকূলে যতীশ-চন্দ্রের সহচরবৃন্দের কথা ধরণীধরের মনে পড়িল। তিনি বুঝিলেন, তাহারা এই পাত্রীর কথাই বলিতেছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "মেয়েটির পিত্রালয় কোথায় ?"

"ইচ্ছাপুরে। মহেশ্বর ভট্টাচার্য্যের কন্যা।"

"ভাল ; আমি সন্ধান লইব।"

এ সম্বন্ধের সন্ধান লইবার উপায়সম্বন্ধে ধরণীধরকে কিছু চিন্তিত হইতে হইল। পূর্ব্বে যখন বাঙ্গালার পল্লী আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ ছিল—পল্লীর অভাব দূর করিবার উপায় পল্লীতেই থাকিত—তখন গ্রামে ঘটক ছিল। এখন পল্লীগ্রামের অবস্থা পরিবর্ত্তিত। বিবাহ প্রায় সহরেই নিষ্পন্ন হয়—পূর্ব্বের মত

সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম পরিচয়ের ব্যবস্থা আর নাই। কাযেই গ্রামে এখন ঘটকের অভাব। অনেক ভাবিয়া ধরণীধর গ্রামের "ঠাকুরদাদা" —হরিনাথ ভট্টাচার্য্যকে সব কথা বলিয়া ইচ্ছাপুরে মহেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করিলেন।

বৃদ্ধ হরিনাথ আবশ্যক সংবাদাদি লইয়া আসিলেন; ধরণী-ধরকে বলিলেন, "ভায়া হে! তোমার ঘরে মেয়ে দিতে পারা মহেশ্বর ভট্টাচার্য্যের সৌভাগ্য সন্দেহ নাই; কিন্তু মেয়েটি লক্ষে একটি—সে মেয়ে আনিতে পারাও সৌভাগ্য।"

ধরণীধর জননীর সহিত এ বিষয়ে পরামর্শ করিলেন। হরি-নাথের কথা শুনিয়া এ সম্বন্ধে তাঁহার জননীর আগ্রহ যেন দশ-গুণ বর্দ্ধিত হইল।

তাহার পর এক দিন ধরণীধর স্বয়ং হরিনাথকে সঙ্গে লইয়া ইচ্ছাপুরে গমন করিলেন। বিবাহসম্বন্ধ স্থির হইয়া গেল। কথা হইল, এখন "আশীর্ব্বাদ" হইয়া থাকিবে; যতীশের পরীক্ষার পর বিবাহ হইবে। ধরণীধর দেখিলেন, মহেশ্বর ভট্টাচার্য্যের কন্যা সাক্ষাৎ ভগবতীই বটে।

যতীশ শুনিল, ইচ্ছাপুরে সেই বালিকার সহিতই তাহার বিবাহ স্থির হইল। অধ্যয়নে তাহার যেটুকু মনোযোগ ছিল—তাহাও গেল। সে কল্পনাসৃষ্ট সুখলোকে বিচরণ করিতে লাগিল। যুবকের উদ্দাম কল্পনা তাহাকে যে স্বপ্নরাজ্যে লইয়া গেল সে রাজ্যের সুখ এই দুঃখ-শোক-তাপময় জগতে লাভ করা যায় না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বিস্ময়।

"শুনেছ, দিদি, তোমার নূতন ঠাকুর জামাই যে উপস্থিত!"

"সত্য? বল কি?"

"সেজ ঠাকুরপোর সহিত এক গাড়ীতে আসিয়াছে। সেজ ঠাকুরপো সেই কথা বলিবার ছল করিয়া আসিয়া সেজ বৌয়ের দরবারে হাজির।"

"ছিঃ ছিঃ। দশ দিন বিবাহ হয় নাই, ইহারই মধ্যে শশুর-বাড়ী আসা!"

"কর্ত্তার সে দিন জর হইয়াছিল, সেই সংবাদ পাইয়া নাকি তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছে।"

"হাঁ। ছলের কখন অভাব হয় না। রাধিকা জল ফেলিয়া দিয়া জল আনিবার ছল করিয়া যমুনায় যাইতেন! এ বাড়ীর সবই নূতন! সেজ ছেলেটি ত লজ্জার মাথা খাইয়াছেন।"

"এ ভাল। মেজ ঠাকুর জামাই যেমন 'কালে ভদ্রে' আইসেন—ইনি তেমনই যখন তখন আসিলে 'হরে দরে হাঁটু জল' দাঁড়াইবে। আর এক কথা, দিদি, জামাই 'নেটি পেটি' হওয়া ভাল।"

"মেজর কি হয় দেখ। 'এত কালর সন্ধ্যা বইত নয়—পরেই বা কি হয়?' এইবার 'ঘরলাগা' হইয়াছেন; এখন দেখ, আবার কি হয়। বড় চালাক আবার বড় ধরা পড়েন।"

অদৃষ্ট-চক্র।

সরোজার সহিত যতীশচন্দ্রের বিবাহের এক সপ্তাহ পরে পিতার আদেশে শ্বশুরকে দেখিবার জন্য যতীশচন্দ্র শ্বশুরালয়ে উপস্থিত। সেই বিষয় লইয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অন্তঃপুরে তাঁহার প্রথমা ও মধ্যমা পুত্রবধুদ্বয়ের মধ্যে এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল।

বিরজা স্বামীর পরীক্ষার পরই শ্বশুরালয়ে যাইয়া ভগিনীর বিবাহের জন্য পিত্রালয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে। পরদিন সে আবার পতিগৃহে যাইবে। সে ঘরে তারঙ্গ গুছান শেষ করিয়া দালানে আসিলেই জ্যেষ্ঠা বধূ বলিলেন, "শুনেছ, ঠাকুরঝি, হাল আইনে তোমাদের পুরাতন ব্যবস্থা আর চলিবে না।"

বিরজা হাসিয়া বলিল, "কি বড়, বৌদিদি? তোমার কি সোজা কথা বলিতে নাই?

"কি করি বল, ঠাকুঝি, আমরা বাঁকা মানুষ, ঠাকুর জামাইয়ের মত সোজা কথা কোথায় পাইব?"

মধ্যমা বলিলেন, "তুমি শুন নাই?"

বিরজা বলিল. "কি?"

"নুতন ঠাকুর জামাই যে উপস্থিত!"

বিরজা বিস্মিত ভাবে ভ্রাতৃজায়ার দিকে চাহিল।

জ্যেষ্ঠা বলিলেন, "কেমন, ঠাকুরঝি, এ ব্যবস্থা নূতন কি না? আমাদের এক ঠাকুর জামাই ত বিদেশে বিদেশেই ঘুরেন, আর এক জন পড়ার ছুতা করিয়া এ পাড়া মাড়ান না; এবার আবার আর এক রকম দেখা গেল। বলে—

'কালে কালে দেখ্‌ব কত!
দেখে দেখে হ'লাম হত।'

কি বল?"

বিরজা বলিল, "তা, বড় বৌদিদি, নূতন রকম দেখাই ত ভাল। এখনই হত হইবে কেন? বালাই!"

যখন তিন জনে এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল, তখন তাহার সেজ বৌদিদির সঙ্গে সরোজা ঘাট হইতে ফিরিল তাহাকে দেখিয়া বড় বধূ বলিলেন, "সরোজা, আহ্লাদে যে আর মাটীতে পা পড়ে না!"

সরোজা সহসা এ মন্তব্যের কারণ অবগত ছিল না—বুঝিতেও পারিল না। সে জিজ্ঞাসা করিল—"কি, বড় বৌদিদি?"

বড় বধূ বলিলেন, "বাহিরে যাইয়া দেখ।"

সরোজা ও সেজ বৌ চলিয়া যাইলে বড় বধূ মধ্যমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তা দেখ, ভাই, যদি এবার সরোজা হইতে সেজ বৌয়ের অপবাদ ঘুচে। আমার ত বোধ হয় এবার তাহার দোসর জুটিল।"

মধ্যমা হাসিলেন।

বিরজার মুখে কিন্তু একটু ভাবনার ভাব ফুটিয়া উঠিল সরোজার বিবাহের রাত্রিতে গৃহে বিপুল আনন্দোৎসবের মধ্যে তাহার মুখে যে চিন্তার ছায়াপাত হইয়াছিল—আজ যেন তাহা একটু নিবিড় হইয়া উঠিল। বিবাহ-সভায় বরাসনে আসীন বরকে দেখিয়া বিরজার মনে হইয়াছিল—সে পূর্ব্বে যতীশকে

দেখিয়াছে। কোথায় দেখিয়াছে—কবে দেখিয়াছে—সে কিছুতেই মনে করিতে পারিতেছিল না। স্মৃতি যখন সহসা আমাদের সঙ্গে এইরূপ লুকাচুরী খেলে তখন একটা অব্যক্ত চাঞ্চল্যে মন ব্যথিত হয়। বিরজার যখন তাহাই হইতেছিল তখন সহসা মেঘান্ধকার নিশায় বিদ্যুদ্বিকাশে প্রকৃতির মূর্ত্তি যেমন মুহূর্ত্তে সুস্পষ্ট দেখা যায় অমূল্যচরণকে দেখিয়া তেমনই তাহার স্মৃতিতে পূর্ব্বকথা সুস্পষ্ট ফুটিয়া উঠিল। তাহার মনে পড়িল, এক দিন ভাদ্রের অপরাহ্নে নৌকা-যাত্রী একদল যুবকের দৃষ্টি অতিক্রম করিবার জন্য সে ঘাট হইতে দ্রুতপদে গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছিল। যতীশচন্দ্র সেই দলে ছিল—অমূল্যচরণও ছিল। নির্লজ্জ নিঃসঙ্কোচে দুরবীক্ষণ দিয়া স্নানের ঘাটে কুলাঙ্গনাদিগকে দেখিতেছিল। সেই কুলাঙ্গারকে দেখিয়া সে দিন বিরজা ভাবিয়াছিল—ইহাদিগকে আপনার অন্ধকার অতলতলে লইয়া পুণ্যতোয়া ভাগীরথী পৃথিবীর পাপভারলাঘব করেন না কেন। আজ তাহাকে দেখিয়া ঘৃণায়—লজ্জায়—ক্রোধে তাহার হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিল। কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যে সে চাঞ্চল্য দূর হইয়া গেলে—দারুণ আশঙ্কায় তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। যাহার করে তাহার মাতৃহীনা ভগিনীর কর অর্পিত হইবে—সে ত ইহারই বন্ধু! ইহাই কি তাহার স্নেহের পুত্তল সরোজার ললাট-লিখন? তাহার ইচ্ছা হইল, সে তখনই যাইয়া পিতাকে সকল কথা বলে। কিন্তু সে সহজেই বুঝিল, এখন বিবাহ-সভায় বর উপস্থিত, এখন বাগ্দত্তা ভগিনীর বিবাহ ভঙ্গ করা অসম্ভব। সে দীর্ঘশ্বাস

ত্যাগ করিল। বিরজা আর ভগিনীর বিবাহের উৎসবে অবারিত আনন্দ উপভোগ করিতে পারিল না। তাহার হৃদয়ে দারুণ দুশ্চিন্তা।

সেই দুশ্চিন্তা লইয়া বিরজা এ কয় দিন কাটাইয়াছে। ব্রজেন্দ্রকে এ কথা বলিয়া সে তাহার মতামত জানিবার জন্য ব্যস্ত। ব্রজেন্দ্রের মতামতে কি হইবে তাহা সে জানে না; কিন্তু সে তাহাকে এ কথা না জানাইতে পারিলে তাহার হৃদয়ের ভার কমিতেছে না। যখন হৃদয়ে বেদনাভার নিতান্তই দুর্ব্বহ হইয়া উঠে, তখন মানুষ, যেন সহজাত সংস্কারবলে, জগদাতীত কোন মহাশক্তিকে সে বেদনার কথা জানাইতে প্রবৃত্ত হয়—দেবতার চরণে আপনার বেদনা জানাইয়াই সে শান্তি ও সান্ত্বনা লাভ করে। বিরজা তেমনই তাহার যৌবনের স্বপ্ন—তাহার জীবনের সর্ব্বস্ব—তাহার হৃদয়ের দেবতা তাহার বাঞ্ছিত—তাহার উপাসিত স্বামীকে এ দুশ্চিন্তার কথা বলিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু সে সে কথা বলিবার অবসর পায় নাই। সরোজার বিবাহের পরদিন—বর ও বরযাত্রীদিগের সঙ্গে সঙ্গেই ব্রজেন্দ্র গৃহে ফিরিয়াছিল। সে জানিত, তাহার জননী সংসারে একমাত্র সম্বল পুত্রকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেন না। তাই সে কখনও গৃহ ছাড়িয়া থাকিতে চাহিত না। সে ফিরিয়া গিয়াছিল। বিরজা তাহার দুশ্চিন্তার—আশঙ্কার কথা স্বামীকে জানাইতে পারে নাই। এ কয় দিন তাহার মনের কথা মনে থাকিয়া মনকেই ব্যথিত করিতেছিল। অতর্কিত আশঙ্কার তীব্রতাহ্রাসের সঙ্গে

সঙ্গে বিরজার মনে আশার সঞ্চারও যে না হইয়াছিল এমন নহে। সে বহুবার মনকে বুঝাইতে চাহিয়াছে—হয় ত সে ভ্রান্ত। কবে দূর হইতে মুহূর্ত্তের জন্য সে যুবকদিগকে দেখিয়াছিল—(সে ত একবারের অধিক তাহাদিগের দিকে চাহে নাই) সুতরাং তাহার ভ্রম হওয়া অসম্ভব নহে। আশার ও আশঙ্কার ছায়ালোক এ কয় দিন তাহার হৃদয়ে খেলা করিয়াছে। আজ যতীশ উপস্থিত। যতীশ যখন জলযোগের জন্য অন্তঃপুরে আসিল—তখন বিরজা আবার ভাল করিয়া তাহাকে লক্ষ্য করিল। এ মুখ সে পূর্ব্বে দেখিয়াছে হৃদয়ে আশার আর অবকাশ রহিল না—আশঙ্কা তথায় স্থায়ী হইয়া উঠিল।

সেই দিন সন্ধ্যায় ব্রজেন্দ্র শ্বশুরালয়ে আসিল; পরদিন পত্নীকে স্বগৃহে লইয়া যাইবে। বিরজা জানিত, ব্রজেন্দ্র আসিবে। যে কথা তাহার মনে গুরু ভারের মত ছিল তাহা স্বামীকে বলিবার জন্য প্রবল ব্যাকুলতা আজ তাহার স্বামিসন্দর্শন-ব্যাকুলতাকে যেন দ্বিগুণ করিয়া তুলিয়াছিল। সে যখন শুনিল, ব্রজেন্দ্র আসিয়াছে তখন সে যেন আকূলে কূল পাইল।

তাহার পর রাত্রিতে স্বামিস্ত্রীতে যখন সাক্ষাৎ হইল তখন বিরজার আবার ভাবনা উপস্থিত হইল—কেমন করিয়া কথাটা আরম্ভ করে। ব্রজেন্দ্র দেখিল, বিরজার প্রফুল্ল মুখে একটু ভাবনার অন্ধকার লাগিয়া রহিয়াছে। সে জিজ্ঞাসা করিল, "কি ভাবিতেছ? পিত্রালয় হইতে যাইতে হইলেই বুঝি দুঃখানুভব হয়?"

বিরজা বলিল, "তাহা তোমরা কি বুঝিবে ?"

"কেন শ্বাশুড়ীকে বুঝি বড় ভয় করে ?"

"কাহারও কাহারও করে সত্য ; কিন্তু আমার সে ভয়ের কারণমাত্র নাই। বরং এতদিন যে মাতৃস্নেহ লাভে বঞ্চিতা ছিলাম, এখন তাহাই লাভ করিয়াছি।"

"তবে ভাবনা কিসের ?"

"তোমাকে একটা কথা বলিব।"

"কি ?"

তখন বিরজা সেই ভাদ্র মাসের অপরাহ্নে স্নানের ঘাটে নৌকাযাত্রীদিগের দর্শন হইতে আরম্ভ করিয়া সকল কথা বলিল, তাহার সন্দেহের—তাহার আশঙ্কার সকল কথা স্বামীকে শুনাইল।

সে কথা শুনিতে শুনিতে ব্রজেন্দ্রের মুখে বিস্ময় ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। শিক্ষা কি মানুষের স্বভাবের কোন পরিবর্ত্তনই করিতে পারে না ?

বিরজার কথা শেষ হইলে বিস্ময় ও বিরক্তি গোপন করিয়া ব্রজেন্দ্র হাসিয়া বলিল, "তবে দেখিতেছি, বিবাহের পূর্ব্বেই 'শুভদৃষ্টি' হইয়াছিল !"

বিরজা বলিল, "তুমি রঙ্গ রাখ। আমার বড় ভাবনা হইয়াছে।"

"ভাবনার কথাই বটে।"

"এখন উপায় কি ?"

"চারি হাত এক হইয়াছে। ইংরাজিতে একটা কথা আছে নবীনচন্দ্র তাহা বাঙ্গালায় প্রকাশ করিয়াছেন—

'হস্তচ্যুত পাশা হয়েছে যখন
কি হ'বে ভাবিয়া এবে?'

এখন ভরষা সরোজার অদৃষ্ট।"

বিরজা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল।

ব্রজেন্দ্র বলিল, "তবে আশঙ্কার অবকাশও যেমন আছে—আশার অবকাশও তেমনই আছে। যতীশ তরুণ যুবক। ঘটনাস্রোতে ভাসিয়া কুসঙ্গে পড়িয়াছে সে কুসঙ্গের কুপ্রভাব তাহার হৃদয় মলিন করিতে পারিয়াছে কি না সন্দেহ। এক দিকে অধ্যয়ন, অন্য দিকে প্রেম এই দুই পুণ্য প্রভাবে তাহার হৃদয় অবশ্যই পাপকে পরিহার করিবে।"

তাহার পর পত্নীর মুখচুম্বন করিয়া ব্রজেন্দ্র বলিল, "বিশেষ তোমরা যখন অঘটনও ঘটাইতে পার তখন আর ভয় কেন?"

বিরজা উৎকর্ণ হইয়া স্বামীর কথা শুনিতেছিল। স্বামীর কথায় তাহার আশঙ্কা প্রশমিত হইল; সে আশার আশ্রয় লইল। স্বামীর কথাতেই তাহার বিশ্বাস। জগতে যে প্রেমে এইরূপ বিশ্বাস লাভ করিতে পারে না—তাহার মত দুর্ভাগা আর নাই।

নবম পরিচ্ছেদ।

পতিগৃহে।

"মা তুমি এত সকালে উঠিয়া কায করিতে আসিলে কেন?"

প্রভাতে দিবালোক কেবল ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিরজার শাশুড়ী স্নান করিয়া ঠাকুর-ঘর মুছিয়া—সে ঘরের বাসনগুলি গঙ্গাজলে ধৌত করিয়া আসিয়া দেখিলেন, বিরজাও স্নান করিয়া আসিয়াছে—দালানে কুটনা কুটিবার উদ্যোগ করিতেছে। দেখিয়া তিনি বলিলেন, "মা, তুমি এত সকালে উঠিয়া কায করিতে আসিলে কেন?"

বিরজা কোন উত্তর দিল না, কুটনা কুটিতে বসিল।

বিরজা মাতৃহীনা—শাশুড়ীর কন্যা নাই। উভয়ের মধ্যে স্নেহসম্বন্ধ এমন নিবিড় ও সুমধুর হইয়া উঠিয়াছিল যে, শাশুড়ী যেন পুত্রবধূতে কন্যা ও পুত্রবধূ যেন শাশুড়ীতে জননী লাভ করিয়াছিলেন। উভয়ের এই সুমধুর স্নেহসম্বন্ধে ব্রজেন্দ্রের আনন্দের আর অন্ত ছিল না। সে এতদিন অধ্যয়ন লইয়া স্বেচ্ছায় আপনাকে সংসারের সুখ হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছিল। আজ যেন তাহার ব্রত উদ্‌যাপিত হইয়া গিয়াছে। আর আজ যখন সে সংসারে প্রবেশ করিয়াছে তখন সে দেখিতেছে—ফাল্গুনে প্রকৃতি যেমন আপনার কুসুমসুষমা—ভ্রমরগুঞ্জন—মেঘমুক্ত আকাশ—পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য লইয়া বসন্তের জন্য অপেক্ষা করে

সংসার তেমনই তাহার সুধাপূর্ণ ভাণ্ড লইয়া তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। জননীর স্নেহে সে অভ্যস্ত—জননীর স্নেহের সে ব্যতীত অন্য অবলম্বন নাই। পত্নীর প্রেমে সে আপনাকে ধন্য মনে করিতেছিল। আর শ্বাশুড়ীরধূতে এই নিবিড় স্নেহে যেন তাহার সুখপাত্র ছাপাইয়া পড়িতেছিল। সংসারের প্রবেশ-পথেই সংসারের এমন মোহন মূর্ত্তি দর্শন সকলের ভাগ্যে ঘটে না।

আজ বিরজাকে কায করিতে প্রবৃত্তা দেখিয়া শ্বাশুড়ী আবার বলিলেন, "যাও, মা, আমি কুটনা কুটিতেছি। তুমি যাও— চুল শুকাইয়া লও।"

বিরজা বলিল, "মা, চুপ করিয়া বসিয়া থাকিব কেন?"

"মা আমার, আমি আর কয় দিন আছি? সংসার তোমার; সব তোমাকেই করিতে হইবে। তখন যে, মা, কাযে আর অবসর পাইবে না! আমার সংসারে আর ত লোকও নাই। তখন সংসারের কায—ছেলেদের লালনপালন—কত কায পাইবে যে কয় দিন আমি আছি, তোমার গাত্রে কেন আঁচ লাগিবে, মা?"

এই সময় ব্রজেন্দ্র স্নানাগার হইতে বাহির হইয়া আসিল মা'র কথা শুনিয়া সে দ্বারদেশ হইতে জিজ্ঞাসা করিল, "কি, মা?

তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া বিরজা ঘোমটা টানিয়া দিল।

শ্বাশুড়ী তাঁহার নিকট পুত্রবধূকে মস্তকে অবগুণ্ঠন দিতে দিতেন না; বলিতেন, "তুমি আমাকে লজ্জা করিতে পাইবে না।" মা বলিলেন, "এই দেখ্, দুষ্ট মেয়ে আমার কথা শুনে না

—রাত্রি পোহাইতে না পোহাইতে উঠিয়া স্নান করিয়া আমার কায করিতে চাহে।”

ব্রজেন্দ্র হাসিয়া বলিল, “বড় ত অন্যায়! মা, এখন হইতে তুমি খুব বেলায় উঠিতে আরম্ভ কর—তাহা হইলেই ঠিক হইবে।”

ব্রজেন্দ্র চলিয়া গেল।

মা বিরজাকে বলিলেন, “মা, তুমি যেমন করিয়া সব কায করিতেছ, তাহাতে আমার আর কোন কাযই থাকে না। যত-দিন তোমার ছেলেদের লইয়া নূতন কায না পাইতেছি ততদিন তুমি এ কায করিলে আমি কি লইয়া থাকি?”

বিরজা লজ্জায় মুখ নত করিল।

মা বলিলেন, “কর্ত্তার বড় ইচ্ছা ছিল—তোমাকে ঘরে আনি-বেন। তাঁহার অদৃষ্টে নাই তাই তোমাকে ঘরে আনিয়া যাইতে পারেন নাই।” মা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তাঁহার নয়নে অশ্রু দেখা দিল।

বাস্তবিক বিরজার আগমনে ব্রজেন্দ্রের গৃহ যেন আনন্দা-লোকে সমুজ্জল ও সুন্দর হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার সংসারে কোথাও দুঃখের চিহ্নমাত্র ছিল না। সংসারে সুখ দুর্ল্লভ—সেই দুর্ল্লভ সুখভোগ কয়জনের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে?

সেই দিন রাত্রিতে আহারান্তে শয়ন-গৃহে প্রবেশ করিয়া বিরজা দেখিল, ব্রজেন্দ্র তখনও সে কক্ষে আইসে নাই। কক্ষমধ্যে প্রখর তাপাতিশয্যে সে একখানি মাদুর লইয়া সম্মুখে মুক্ত ছাতে গেল এবং তথায় মাদুরখানি বিছাইয়া তাহাতে শ্রান্ত দেহ ঢালিয়া দিল। বহে

দ্বিতীয় খণ্ড।

বর্জ্জন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

যাত্রা।

ধরণীধর কর্ম্মস্থানে চলিয়া যাইলেন। তখনও যতীশচন্দ্রের কলেজ খুলিবার বিলম্ব আছে। কিন্তু সে কলিকাতায় গেল; পিতামহীকে বুঝাইয়া গেল, পূর্ব্ব হইতে চেষ্টা না করিলে ভাল "মেসে" স্থান পাওয়া যায় না—ভাল "মেসে" স্থান না পাইলে আহারের অত্যন্ত অসুবিধা হয়। আহারের অসুবিধা হয়—এই যুক্তিই স্নেহশীলা পিতামহীর সকল আপত্তি নিরস্ত করিবার পক্ষে যথেষ্ট। যতীশ কলিকাতায় গেল। আসল কথা, এতদিন গৃহে থাকিয়া কলিকাতায় বন্ধুসমাজে মিশিবার জন্য তাহার বাসনা ক্রমে অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল; তাহার ধৈর্য্য-বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইবার উপক্রম হইতেছিল। এই কয় মাসে সাহিত্য-জগতে হয় ত কত পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে! 'বিশ্বদূতে' প্রকাশিত নগেন্দ্রনাথের নবপ্রকাশিত পুস্তকের সমালোচনা অমূল্যচরণ তাহাকে পাঠাইয়াছিল। সে সমালোচনা নির্জ্জলা সুখ্যাতি। সেই উপলক্ষে অমূল্যচরণ লিখিয়াছিল, "আমি কত দিন হইতে আপনাকে বলিতেছি, কবিতাগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ করুন। আপনি নিরতিশয় লজ্জানিবন্ধন তাহাতে অসম্মত। প্রতিভার জয় অবশ্যম্ভাবী, সত্য; কিন্তু সংসারে আপনাকে একটু চেষ্টা করিয়া প্রকাশ করিতে হয়। আমরা ঠেকিয়া শিখিয়াছি। আমার কথা শুনুন;—কবিতাগুলিকে

সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় বিক্ষিপ্ত অবস্থায় রাখিয়া আর নকলনবীশ-দিগকে মৌলিক কবি করিবার পক্ষে সহায়তা করিবেন না।” বাস্তবিক—নগেন্দ্রনাথ তাহার তুলনায় নগণ্য। যতীশচন্দ্র অমূল্যচরণের উপদেশে চঞ্চল হইয়াছিল। কিন্তু পিতার অমত জানিয়া সে পুস্তকপ্রকাশবিষয়ে অমূল্যচরণকে কোন কথাই লিখে নাই। তাহার “ফুলশয্যার” দিন অমূল্যচরণ তাহার গৃহে আসিয়াছিল। পরদিন অমূল্যচরণ তাহাকে একখানি পত্র লিখিয়াছিল—

“কাল ‘ফুলশয্যা’ কেমন উপভোগ করিলেন? আমরা অনেকক্ষণ জ্বালাইয়াছিলাম বটে, কিন্তু আপনার শ্বশুর যদি সকাল সকাল ‘ফুলশয্যা’ পাঠাইতেন, তাহা হইলে আমরাও শীঘ্র আপনাকে মুক্তি দিতাম। রাত্রিতে মেঘ বেশ কাটিয়া গিয়াছিল। চাঁদের আলো দেখিতে দেখিতে চাঁদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়াছেন ত? বাস্তবিক আপনার বিবাহটা আগা-গোড়াই খুব romantic রকমের হইয়াছে। ‘অস্তরবির স্বর্ণকিরণে’ সমুজ্জ্বল অপরাহ্নে নদীবক্ষে ‘শুভদৃষ্টি’। বিশেষ পূর্ণিমার চন্দ্রকিরণরঞ্জিত কুসুমশয়নে ‘মামুলি’ ‘ফুলশয্যা’—অত্যন্ত কবিত্বপূর্ণ।

“আজ একবার আপনাদের ওদিকে যাইবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু একটি কায পড়ায় (অর্থাৎ একরাশি প্রুফ দেখিবার থাকায়) যাইতে পারি নাই। দ্বিপ্রহরে কবিতা বাছাই করিবার কথা আছে।

"আপনার প্রবন্ধাদির প্রুফ পরে পাঠাইয়া দিব। এবার এখনও কাগজের কিছুই হয় নাই। তাহার প্রধান কারণ আমার আলস্য—যাহা ঠাহরাইয়াছেন—তাহা নহে। গত দশ মাস (অর্থাৎ মাঘ পর্য্যন্ত) কাগজ চলিয়াছে, কিন্তু এই দুই মাস অচল; এই দুই মাস গ্রাহক মহাশয়েরা 'উপুড় হস্ত' করেন নাই।

"আপনার এই উৎসবানন্দের মধ্যে আমার এই সব ব্যাপার লিখাই বেয়াদবি। আপনিও কাগজের একজন, তাই লিখিলাম।

"আর একটি কথা লিখিতে নিতান্ত লজ্জা করিতেছে; বিশেষ এ সময়ে। কিন্তু নিরুপায়ের চক্ষুলজ্জা নাই। আপনার হাতে যদি টাকা থাকে, তাহা হইলে মাস দুই তিনের জন্য আমায় দুই শত টাকা ধার দিলে আমার অত্যন্ত উপকার হয়। তাহা হইলে কাগজখানা বাহির করিয়া ফেলা যায়। আপনার সুবিধা হইবে কি?

"আশা করি, শীঘ্র এই পত্রের উত্তর দিবেন। টাকার কথা আমিও অসঙ্কোচে লিখিলাম, আপনিও অসঙ্কোচে উত্তর দিবেন। আমি এ কয় দিন অনেক স্থানে চেষ্টা করিয়া অবশেষে অন্য আপনাকে লিখিলাম। কাগজখানা সময়ে বাহির করিতে না পারিলে উহার প্রতিষ্ঠার বড় ক্ষতি হয়। সেটা কিছু হইয়াছে; তাই বড় ব্যস্ত হইয়াছি। এবং আমার ব্যস্ততা যত বাড়িতেছে সেই পরিমাণ নিরাশ ও নিরুপায় হইতেছি। সেইজন্য আপনাকে

এ সময়ে কাগজের এই দুঃখের সংবাদ লিখিলাম। আপনি ক্ষমা করিবেন।"

এই পত্র পাইয়া যতীশ কিছু বিচলিত হইয়াছিল। বিচলিত হইবার কারণ একাধিক। প্রথমতঃ সে কাগজখানির ভবিষ্যৎ ভাবিয়া বিচলিত হইয়াছিল। এই পত্রেই সমাজে তাহার প্রতিভার পরিচয়, তাহার যশের প্রতিষ্ঠা। ইহার যথেষ্ট সমাদর হইতেছে না কেন? হায় বাঙ্গালী পাঠক! বড় দুঃখেই কবি হেমচন্দ্র বলিয়াছেন—

"হায় মা ভারতী, চিরদিন তোর
কেন এ কুখ্যাতি ভবে,
যেজন সেবিবে ও পদযুগল
সেই সে দরিদ্র হ'বে?"

আরও এক কারণে সে কিছু বিচলিত হইয়াছিল। ইতঃপূর্ব্বে অমূল্যচরণ, আপনার জন্য নহে—কাগজের জন্য, মধ্যে মধ্যে তাহার নিকট অর্থসাহায্য লইয়াছে; কিন্তু কখন একবারে অধিক অর্থ চাহে নাই। এবার প্রার্থিত সাহায্যের পরিমাণ দুই শত টাকা! এত টাকা একজন ছাত্রের পক্ষে কিছু অধিক। লোকচরিত্রজ্ঞানহীন যুবক জানিত না, অমূল্যচরণ বিশেষ চতুর; সে সময় বুঝিয়া—সুবিধা বুঝিয়া অনুরোধ করিত। সে জানিত, যতীশচন্দ্রের পক্ষে অধিক অর্থ প্রদান এতদিন অসম্ভব ছিল—তাই সে পূর্ব্বে কখনও একবারে অধিক অর্থ চাহে নাই। সে জানিত, এবার যৌতুক প্রভৃতিতে তাহার হস্তে কিছু অধিক অর্থ

সঞ্চিত হইয়াছিল। তাই সে এবার এরূপ অনুরোধ করিয়াছে
যতীশচন্দ্র অমূল্যচরণের চরিত্রের স্বরূপ বুঝিতে পারে নাই। সে
ক্ষমতা তাহার ছিল না। বিশেষ .অমূল্যচরণ তাহার মনে এই
ধারণা বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছিল যে, সে তাহার অসাধারণ প্রতিভ
বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবায় নিযুক্ত করিয়া আত্মোৎসর্গের আদশ
দেখাইয়াছে—সে যেন বিশ্বজিৎযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া আপনা
সর্ব্বস্ব দান করিয়াছে। তাহার উদ্দেশ্য—তাহার আদর্শে অনু
প্রাণিত হইয়া শত শত শিক্ষিত বাঙ্গালী যখন বাঙ্গালা সাহিত্যে
সেবায় সকল শক্তি নিযুক্ত করিবে তখন বাঙ্গালা সাহিত্য
সম্পদসম্ভারে সমগ্র সভ্য জগতে সমাদৃত হইবে। তখন সে
মরণের শান্তিতে কর্ম্মক্লান্ত জীবনের শ্রান্তির পর তৃপ্তি লাভ
করিবে; কিন্তু সেই শুভদিনের কল্পনায় সে বর্ত্তমানের সমস্ত
কষ্ট—সকল অভাব সানন্দে সহ্য করিতেছে। তাহার আশা
তাহার মাতৃভাষা এক দিন জগতে সম্মানের স্বর্ণসিংহাসন লাভ
করিবে। এই উদ্দেশ্যের সংসাধনজন্য আত্মত্যাগ ও স্বার্থত্যাগ
আবশ্যক। সে বঙ্গভারতীর দীন ভক্ত, তাহার সর্ব্বস্ব দেবীর
পূজার জন্য আনিয়াছে। অমূল্যচরণের এই সকল কথা বলিবার
এমন ভঙ্গী যে, সরলহৃদয় যতীশচন্দ্র সহজেই তাহার কথা বিশ্বাস
করিত। সে অমূল্যচরণের সাহিত্যসেবায় বিস্মিত—পুলকিত
হইত। সে বুঝিতে পারিত না, অমূল্যচরণের এই সকল উক্তির
মূলে সত্যের লেশমাত্র নাই—তাহার স্বার্থত্যাগের ভাণ কেবল
লোককে ভুলাইবার জন্য। তাই এবারও যতীশচন্দ্র অমূল্য-

চরণের অনুরোধ এড়াইতে পারে নাই। সে তাহাকে এক শত টাকা পাঠাইয়া দিয়া লিখিয়াছিল,—তাহার হস্তে আর টাকা না থাকায় সে আর পাঠাইতে পারিল না।

এই সময় হইতে কলিকাতায় যাইবার জন্য তাহার আগ্রহ বর্দ্ধিত হইতেছিল। স্বল্পসময়ব্যাপী সাক্ষাতে, কথায় ও পত্রে অমূল্যচরণ তাহার সেই আগ্রহবর্দ্ধনে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। কিন্তু পিতাকে কি বুঝাইয়া সে কলিকাতায় যাইবে? তাই এতদিন তাহার যাওয়া ঘটে নাই। এক্ষণে সে অন্তরায় অন্তর্হিত হইলেই সে বহুদিন বন্ধনের পর সহসা বন্ধনমুক্ত তেজস্বী অশ্ব যেমন মন্দুরা হইতে ছুটিয়া বাহির হয় তেমনই গৃহ হইতে যাত্রা করিল।

এই যাত্রায় তাহার ভবিষ্যৎ জীবন নিয়ন্ত্রিত হইবে। পূর্ব্বে যখনই সে কলিকাতায় গিয়াছে—তখনই সে শিক্ষার্থী, বিদ্যালয়ে বিদ্যালাভের অভিপ্রায়ে গিয়াছে। এবার তাহার অভিপ্রায় অন্যরূপ। এবার সে সাহিত্য-সেবায় যশ অর্জ্জন করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইয়া যাত্রা করিল। এবার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় সাফল্যলাভ তাহার উদ্দেশ্য নহে—সাহিত্যক্ষেত্রে যশ অর্জ্জনই তাহার উদ্দেশ্য। এবার অমূল্যচরণ তাহার আদর্শ।

সে আপনার অদৃষ্টাকাশে যশের সমুজ্জ্বল দিবাকরকরব্যাপ্তির কল্পনা করিতেছিল। সে জানিত না যে, রবিকরোজ্জ্বল—মেঘলেশশূন্য গগনেও সহসা নিবিড় কৃষ্ণ কাদম্বিনীর সঞ্চার হইয়া থাকে; প্রবল বাত্যা সেই মেঘ ছড়াইয়া আকাশ হইতে রবিকর

মুছিয়া দেয়, বজ্রনাদে প্রকৃতির কমনীয় উপবনে বিহগবিরাব, মধুপঝঙ্কার আর শ্রুত হয় না—জীবনের কলরব থামিয়া যায়—প্রলয়ের বিষাণে মৃত্যুর আহ্বান ধ্বনিত হয়।

আপনার ভবিষ্যৎ জীবন একরূপে গঠিত করিবার সঙ্কল্প করিয়া যতীশচন্দ্র গৃহ হইতে যাত্রা করিল। আর দূরে ধরণীধরের ব্যাকুল পিতৃহৃদয় পুত্রের ভবিষ্যৎজীবন অন্যরূপে সংগঠিত করিবার কল্পনা করিতেছিল। তিনি আশা করিতেছিলেন, পরীক্ষায় পুত্রের অসাফল্য তাহাকে সাফল্যলাভে যত্নবান করিবে—সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তিনি তাহার সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করিবেন তাহাতে সে জীবনে আনন্দ ও শান্তি, সম্পদ ও সম্মান লাভ করিয়া সমাজে সমাদর ও গৃহে সুখ ভোগ করিবে। সে ব্যতীত তাঁহার স্নেহের অন্য অবলম্বন নাই; তিনি তাহারই জন্য এত দিন শ্রম করিতেছিলেন। তাহার অসুখের কল্পনাও তাঁহার পক্ষে বিষম বেদনার কারণ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দুঃসংবাদ।

আষাঢ়ের আরম্ভ। এবার আষাঢ়ের প্রথম দিবসে নিদাঘের আকাশে বর্ষার সজলজলদসঞ্চার হয় নাই। আকাশে মেঘ নাই। বেলা প্রায় দশটা; ইহারই মধ্যে রৌদ্রতাপে ধরণী তপ্ত—বাতাসে অনলের স্পর্শ। প্রায় সকল বিহগ বিরাব বন্ধ করিয়া পল্লবের ছায়াস্নিগ্ধ অন্তরালে বসিয়াছে। কাকের কা-কা রবও বড় শুনা যায় না। কেবল এক এক দল চড়াই কখন গৃহ-প্রাঙ্গণে—কখন রাজপথে নামিতেছে। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বাগান হইতে ফিরিলেন। পশ্চাতে ভৃত্য, তাহার স্কন্ধে ঝুড়ীতে বাগান হইতে সংগৃহীত আম্র—বর্ণ কাহারও হরিৎ, কাহারও হরিদ্রা, কাহারও হরিদ্রায় যেন সিন্দূর মিশ্রিত। দ্বারমধ্যে প্রবেশ করিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় ভৃত্যকে বলিলেন, "আম্রগুলি নামাইয়া তামাক লইয়া আয়।" তিনি দ্বার-পথে বেঞ্চে বসিলেন।

সম্মুখে রাজপথের পরপারে একটা ডোবায় সামান্য একটু জল ছিল। একটা সারমেয় হাঁফাইতে হাঁফাইতে আসিয়া সেই জলে পড়িল। তাহার লোল জিহ্বা বহিয়া স্বণিকা ঝরিতেছে। ভট্টাচার্য্য মহাশয় দেখিলেন;—তাহার কার্য্য লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে ভৃত্য তামাক সাজিয়া আনিল।

রাজপথে প্রতিবেশী চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে দেখিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "আজ যে স্নানে যাইতে এত বিলম্ব? বড় রৌদ্র!"

চট্টোপাধায় মহাশয় বলিলেন, "একটা হিসাব মিলিতেছিল না—মিলাইতে বিলম্ব হইল।"

"মিলিয়াছে ত?"

"হঁা।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় হাসিয়া বলিলেন, "আমাদের হিসাব নিকাশের সময় হইয়াছে; এখন মিলিলেই মঙ্গল।"

চট্টোপাধ্যায় তাম্রকুটধূমাকৃষ্ট হইয়া প্রতিবেশীর দ্বারপথে প্রবেশ করিলেন; বলিলেন, "আপনার পুণ্যের সংসার—পুণ্যের শরীর, আপনি ত হিসাব মিলাইয়াই বসিয়া আছেন। নিকাশের তলবে আপনায় ভয় কি?"

"ভয় করিয়া কে কবে নিস্তার পাইয়াছে? সে তলব যে অমান্য করিবার উপায় নাই! আজও হিসাব খতাইয়া দেখিতেছিলাম। হিসাব মিলাইয়া আনিয়াছি; কিন্তু একটু অবশেষ যায় নাই। ভাবিয়াছিলাম, অগ্রহায়ণে সরোজার ও মাঘে বা ফাল্গুনে দেবীচরণের বিবাহ দিব। তাহার পর নীরজার বিবাহ দিলেই নিশ্চিন্ত। কিন্তু তাহা ত হইল না!"

"দেবীর বিবাহের কিছু স্থির করিলেন?"

"সম্বন্ধ ত আসিতেছে; কিন্তু স্থির করি কোথায়? যে দিকে টাকার অাঁচটা অধিক বাবাচরণের মত সেই দিকে। আমি

বলিয়াছি, ও 'পাপ দরিদ্রের ঘরে ইচ্ছা করিয়া ঢুকাইব না তিন ছেলের বিবাহে যে প্রলোভনে ভুলি নাই বৃদ্ধ বয়সে আর সে প্রলোভনে ভুলিব না। আমি ব্রাহ্মণ, ভিক্ষায় আমার অপমান নাই। কুটুম্বের টাকায় ধনী হইবার প্রবৃত্তি আমার নাই। আমি চাহি ভাল ঘর, যে কুটুম্বের দোষে—বধূর দোষে সংসার ভাঙ্গিয়া না যায়।"

"ইহাই ত আপনার উপযুক্ত কথা।"

হুকা হইতে আম্রপাত্রনির্ম্মিত নলটি খুলিয়া লইয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় হুকাটি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে দিলেন। হুকায় ভৃত্যদত্ত আর একটি নল পরাইয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ধূমপান করিতে লাগিলেন।

দূরে অশ্বযানের চক্রঘর্ঘর শ্রুত হইল। দেখিতে দেখিতে রাজপথে একখানি যান ধূলি উড়াইয়া দ্রুতবেগে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গৃহের দিকে আসিতে লাগিল। যানখানি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গৃহদ্বারে আসিয়া স্থির হইতে না হইতে বামাচরণ যান হইতে অবতরণ করিল। তাহার মুখ মলিন; সে মুখে আতঙ্ক সপ্রকাশ।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিস্মিত ভাবে পুত্রের দিকে চাহিলেন। কারণ, ছেলেরা ষ্টেশন হইতে হাঁটিয়াই গৃহে আসিত। তাহাদের গাড়ীতে না আসিবার কারণও একাধিক। প্রথমতঃ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সংসারে সকলকেই মিতব্যয়িতা অবলম্বন করিতে হইত। তিনি বলিতেন, যখন আহার্য্য পরিধেয় প্রভৃতি নিত্য

ব্যবহার্য্য দ্রব্যের মূল্য দ্বিগুণ হইয়া উঠিয়াছে তখন বিলাস বর্জ্জন করা ব্যতীত গৃহস্থের গত্যন্তর নাই। এ অবস্থায় যে বুঝিয়া চলিতে না শিখিবে তাহারই সর্ব্বনাশ হইবে। তিনি গৃহে সকল ব্যবস্থায় মিতব্যয়ী ছিলেন ; পুত্রকন্যাদিগকেও সে বিষয়ে সুশিক্ষা দিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ পল্লীগ্রামের অশ্বযান পল্লীপথে যেরূপে যাতায়াত করে তাহাতে সঙ্গে রমণী, রোগী, শিশু বা দ্রব্যবাহুল্য না থাকিলে সুস্থকায় পল্লীবাসীরা সহজে গাড়ীতে আইসে না। বর্ষায় পথে গুরুভার যানের চারি চক্র কর্দ্দমমুক্ত করা যেরূপ আয়াসসাধ্য মানুষের দুইখানি পদ কর্দ্দমমুক্ত করা সেরূপ আয়াস-সাধ্য নহে—বর্ষা ব্যতীত অন্য ঋতুতে যানসঞ্চালনোত্থিত পরাগপ্রাচুর্য্যে যুবকের কৃষ্ণকেশ শ্বেতবর্ণ ধারণ করে, নিশ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হয়। এ অবস্থায় যানে গমনাগমন সুখদ নহে।

কিন্তু আজ বিশেষ প্রয়োজনে বামাচরণ গাড়ী ভাড়া করিয়া আসিয়াছিল। সে নামিয়াই পিতাকে বলিল, "ব্রজেন্দ্রের বড় অসুখ।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি অসুখ ?"

"বিসূচিকা।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের চক্ষুর সম্মুখে যেন দিবালোক নিবিয়া গেল। তিনি কিছুক্ষণ কোন কথা কহিতে পারিলেন না ; তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কখন হইয়াছে ?"

বামাচরণ বলিল "অদ্য প্রত্যূষে।"

এ

যানচালক যাইবার জন্য ব্যস্ত হইতেছিল। সে বামাচরণকে বলিল, "বাবু, আমার ভাড়া দিয়া দিউন। ট্রেণের সময় হইল; আমি আবার ষ্টেশনে যাইব।"

বামাচরণ বলিল, "আমিও আবার ষ্টেশনে যাইব।"

শুনিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "ট্রেণ কখন যাইবে?"

বামাচরণ বলিল, "অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই একটা ট্রেণ আছে।"

"চল. আমি যাইব।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় ভৃত্যকে ডাকিয়া একটি পিরাণ ও একখানি উত্তরীয় আনিতে আদেশ করিলেন এবং ব্রজেন্দ্রের চিকিৎসাদির কিরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিলেন।

বামাচরণ বলিল, প্রত্যূষে ব্রজেন্দ্রের পীড়ার বিকাশ হয়। প্রভাতে সংবাদ পাইয়া সে তথায় গিয়াছিল। পিসীমা, রাধাচরণ ও দেবীচরণ তিনজনই তথায় গিয়াছেন। হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা হইতেছে। ডাক্তাররা বলিতেছেন, রোগ অত্যন্ত প্রবল।

এ দিকে ভৃত্য যাইয়া অন্তঃপুরে সংবাদ দিল, বামাচরণ কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন; ভট্টাচার্য্য মহাশয় এখনই কলিকাতায় যাইতেছেন। শুনিয়া পার্ব্বতীচরণ বাহিরে আসিল। সে সংবাদ শুনিয়া বলিল, "আমি যাই। আপনি আহারাদি করিয়া অপরাহ্নে যাইবেন।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "না। তুমি বাড়ীতে থাক। আমি এখনই যাইব।"

বলিতে বলিতে ভট্টাচার্য্য মহাশয় পিরাণটা পরিধান করিয়া লইলেন। তৎপরে উত্তরীয়খানি স্কন্ধে ফেলিয়া তিনি "দুর্গা দুর্গা" বলিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন। বামাচরণ গাড়ীতে উঠিল। গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

পার্ব্বতীচরণ বেঞ্চে উপবেশন করিল।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এতক্ষণ নির্ব্বাক ছিলেন; এখন পার্ব্বতী-চরণকে দুই চারিটি আশার কথা বলিয়া স্নানার্থ গমন করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

গৃহে।

যে দিন জামাতার পীড়ার সংবাদ পাইয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় ব্যস্ত হইয়া গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন, তাহার পর আট দিন গিয়াছে। এখনও মধ্যাহ্নের কিছু বিলম্ব আছে; কিন্তু বেলা কত স্থির করা দুঃসাধ্য—আকাশে ঘন ধূসর মেঘে অবিশ্রাম বর্ষণ চলিতেছে, দিবালোক ম্লান। পথের পার্শ্বে পয়ঃপ্রণালী পূর্ণ—শুষ্ক পত্র, ছিন্ন কাগজ প্রভৃতি লইয়া আবিল জলস্রোত বেগে বহিয়া যাইতেছে। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গৃহের সম্মুখে রাজপথের পরপারে ডোবা ছাপাইয়া উঠিয়াছে। পথিপার্শ্বে যে সকল স্থানে পথিকের গতায়াত অল্প সে সকল স্থানে ঘনশ্যাম তৃণ দেখা দিয়াছে। বৃক্ষে বৃক্ষে নব পল্লব উদ্গত হইয়াছে। আর্দ্র বায়ু বেগে প্রবাহিত হইয়া বর্ষণকাতর বৃক্ষলতা কাঁপাইয়া তুলিতেছে। পথ জনহীন। তরুশাখায় দুই একটি বিহগ—তাহাদের দেহ শীর্ণ দেখাইতেছে।

এই দুর্দ্দিনে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গৃহদ্বারে একখানা যান আসিয়া স্থির হইল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় যান হইতে অবতরণ করিলেন—কোন দিকে চাহিলেন না—নতমস্তকে গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পশ্চাতে বিরজা যান হইতে নামিল। তাহার মুখ বর্ষার দিনেরই মত স্বচ্ছান্ধকারসমাবৃত—পরিধানে শুক্লাম্বর।

বক্ষে দারুণ বেদনা বহিয়া বিধবা দুহিতাকে লইয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় গৃহে ফিরিলেন।

আজ বিধবা দুহিতাকে লইয়া গৃহে আসিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিরজার জননীর অভাব যেরূপ অনুভব করিলেন, তেমন আর পূর্ব্বে কখনও করেন নাই। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বুঝিয়া আসিয়াছিলেন, এখন হইতে বিরজার পিতার ও মাতার কার্য্যভার তাঁহাকেই বহন করিতে হইবে। এখন দুরদৃষ্ট তাহাকে যে নূতন জীবন-পথের পথিক করিয়াছে সে জীবনের শিক্ষা স্বতন্ত্র—এখন তাঁহাকেই আদর্শে ও উপদেশে তাহাকে সে শিক্ষা দিতে হইবে। তিনি সে জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিলেন।

একমাত্র সন্তানের মৃত্যুর পর ব্রজেন্দ্রের জননী বৈবাহিককে বলিলেন, তিনি কাশীতে যাইয়া তথায় বাস করিবেন। তাঁহার এক পিতৃস্বসা কাশীতে বাস করিতেছিলেন। ইতঃপূর্ব্বে একাধিক বার তীর্থদর্শনোদ্দেশে তিনিও তথায় গিয়াছিলেন। আজ [illegible] মৃত্যু মাতৃহৃদয় দীর্ণ—বিদীর্ণ করিয়া পুত্রকে হরণ করিয়া [illegible]ল—যখন সংসার শূন্য ও জীবন আকর্ষণবিহীন বোধ [illegible] লাগিল তখন ধর্ম্মপ্রাণরমণীহৃদয় স্বভাবতঃই জীবনের অব[illegible] কয় দিন তীর্থস্থানে ধর্ম্মানুষ্ঠানে অতিবাহিত করিয়া পরলোকে শান্তি লাভের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল। এই প্রস্তাব শুনিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "বিরজাকে কি ত্যাগ করিয়া যাইবেন? আপনি ব্যতীত তাহার আর কে আছে? সে যে আপনার স্নেহে মাতৃশোক ভুলিয়াছিল!" শুনিয়া ব্রজেন্দ্রের

জননী অশ্রুবর্ষণ করিলেন; বলিলেন, "আমি ব্রজেন্দ্রকে অবলম্বন করিয়া একাকিনী এই গৃহে বাস করিতাম। আজ এই গৃহের শূন্যতা যেন আমাকে শঙ্কিত করিতেছে। আমি আর এই গৃহে বাস করিতে পারিব না। আর সহায়হীন অবস্থায় আমরা দুইটি স্ত্রীলোক কি এ গৃহে বাস করিতে পারি? আপনি বিরজাকে লইয়া যাউন। ভগবান আমার যে বন্ধন ছিঁড়িয়া দিয়াছেন, সে বন্ধনে আমাকে আর বাঁধিবেন না। আমার সব শেষ হইয়াছে।" ভট্টাচার্য্য মহাশয় আর কি বলিবেন? শাশুড়ীর সঙ্কল্পের কথা শুনিয়া বিরজা তাঁহাকে বলিল, "মা, আমি সঙ্গে যাইব। এ পোড়া মুখ লইয়া আমি আর পিতৃগৃহে যাইব না।" শাশুড়ীর দুই নেত্রে অবিরল অশ্রু ঝরিতে লাগিল। তিনি বিরজাকে সন্তানের স্নেহ দিয়াছেন; তাহাকে লইয়া তিনি যে আবার সংসার পাতাইয়া বসিয়াছিলেন! হায়—এই কোমলা কনকলতা—কি পাপে নিষ্পাপ তাহার এই তাপ? তিনি বিরজাকে বক্ষে টানিয়া লইয়া বলিলেন,—"মা, দুরদৃষ্ট আমারই,—তাই তোমার মত বধূ পাইয়াও আজ কাঁদিতে কান্দিতে তোমার নিকট বিদায় লইতে হইতেছে। মা আমার, তুমি আমাকে আর মায়ায় জড়াইও না—তুমি জড়াইলে আমি যাইতে পারিব না। জানি না, পূর্ব্বজন্মে কি পাপ করিয়াছিলাম, তাই এই জন্মে এই শাস্তি ভোগ করিতে হইল! যে কয় দিন আছি, বিশ্বেশ্বরের চরণদর্শন করিয়া অন্তে মণিকর্ণিকায় জ্বালা জুড়াইব। মা, তুমি আমার পুত্র—তুমি

আমার কন্যা; তুমি ইহাতে বাধা দিও না।” শাশুড়ী ও বধূ উভয়েই কান্দিতে লাগিলেন! সত্য সত্যই বধূকে ছাড়িয়া যাইতে শ্বাশুড়ীর হৃদয়ে বিষম বেদনা বোধ হইতেছিল। শ্বাশুড়ী চলিয়া যাইবেন ভাবিয়া বিরজা শূন্য জীবন একান্তই উদ্দেশ্যহীন বোধ করিতেছিল।

বিরজার শ্বাশুড়ী গৃহাদির সকল ভার ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে দিয়া ভ্রাতার সহিত কাশী যাত্রা করিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিধবা দুহিতাকে লইয়া গৃহে আসিলেন।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় গৃহে আসিয়া আদেশ করিলেন, বিরজার মত তাঁহার একাহারের—“হবিষ্যের”—ব্যবস্থা হইবে। কেহ সে আদেশ লঙ্ঘন করিতে সাহস করিল না।

অপরাহ্নে পল্লীর বৃদ্ধগণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের শোকে সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতে আসিলেন। অনেকেই ব্রজেন্দ্রের জননীর জন্য দুঃখ প্রকাশ করিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, “তাঁহার শোকের তুলনা নাই। গৃহদাহে ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতির মৃত্যু হইলে অস্থিনির্ণয়কালে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, গান্ধারীর অস্থি সহজেই নির্ণীত হইবে। কারণ, তাহাতে শত ছিদ্র বিদ্যমান থাকিবে প্রতি পুত্রশোক জনকজননীর অস্থিতে ছিদ্র করিয়া দেয়। তাই লোক কথায় বলে, শত্রুরও যেন পুত্রশোক না হয়। কিন্তু তবুও তাঁহার শান্তি এই যে, তাঁহার হিসাব চুকিয়া গেল।—এ ক্ষেত্রে আমার হিসাব যে চুকিল না—এ যে নূতন করিয়া চলতি খাতায় পত্তন হইল!” যাঁহারা ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে সান্ত্বনা দিতে

আসিয়াছিলেন তাঁহারা তাঁহার স্থৈর্য্য দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। সে স্থৈর্য্য যে কি প্রগাঢ় জ্ঞানের—কি অসাধারণ সংযমের—কি প্রবল চিত্তজয়ের চেষ্টার ফল তাহা সকলে বুঝিতে পারিলেন না।

যখন ভট্টাচার্য্য মহাশয় পল্লীবৃদ্ধগণের সহিত কথা কহিতে-ছিলেন তখন পিসীমা'কে লইয়া বামাচরণ কলিকাতা হইতে আসিল। পিসীমা আর্ত্তনাদ করিতে করিতে গৃহে প্রবেশ করিলেন।

বামাচরণের জ্যেষ্ঠ পুত্র তারাচরণ পিতামহের বড় আদরের। তাই এই দারুণ শোকের সময় বামাচরণ তাহাকেও পিতার নিকট রাখিতে আসিয়াছিল। তারাচরণ আসিয়া পিতামহের নিকট বসিল। বামাচরণ অন্দরে প্রবেশ করিল।

পিতা আহারের যেরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন—তিনিও যে বিধবা দুহিতার সঙ্গে ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান করিতেছেন তাহা অবগত হইয়া বামাচরণ তাহার প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছুক হইল। কিন্তু ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পরিবারে পিতার কার্য্যের প্রতিবাদ করা পুত্রদিগের শিক্ষার বিরুদ্ধ ছিল—সে পরিবারে পুরাতন প্রথারই প্রচলন ছিল—পুত্র যতই কৃতী হউক না কেন পিতার সম্মুখে মুখ তুলিয়া কথা কহিতে সাহস করিত না। বিশেষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় "রাসভারী" লোক ছিলেন। শিশু ও বালকবালিকারা সর্ব্বদাই তাঁহার কাছে থাকে, বাড়ীর মেয়েরাও তাঁহার নিকটে স্বচ্ছন্দে আইসে, কিন্তু প্রাপ্তবয়স্কগণ—পুত্র বা ভ্রাতুষ্পুত্র—তাঁহার সহিত

অবাধে আলাপ করিতে সাহস করে না। তাই ইচ্ছা হইলেও বামাচরণ পিতার ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিতে পারিল না।

বামাচরণ পরদিবস কলিকাতায় ফিরিয়া গেল ও পিতাকে কঠোর ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান হইতে বিরত করিবার জন্য তৎপরদিবস স্বীয় শ্বশুরকে লইয়া পুনরায় গৃহে আসিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বৈবাহিক কথায় কথায় বলিলেন, "যাহা হইবার হইয়াছে। যাহা গিয়াছে তাহা আর ফিরিবে না। আপনি জ্ঞানী। আপনি যদি শোকে অভিভূত হইয়া পড়েন—দেহপাত করেন তবে যাহারা অজ্ঞ তাহারা কি করিবে?"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিস্মিতভাবে বৈবাহিকের দিকে চাহিলেন।

বৈবাহিক বলিলেন, "আপনি একাহারী হইয়াছেন। এরূপ ব্যবস্থায় শরীর কয় দিন থাকিবে?"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "এখন এ শরীর যাইলেই পৃথিবীর ভার যায়। দুঃখ এই যে, যাহারা যাইবার তাহারা যায় না—আর যাহাদের থাকিবার কথা তাহারাই যায়। যাহারা সংসারের পক্ষে অনাবশ্যক আবর্জ্জনা তাহারাই থাকে—আর যাহাদিগকে অবলম্বন করিয়া সংসার-ব্রততী পল্লবমুকুলে সুশোভিত হইয়া উঠে তাহারাই যায়! কিন্তু সংযমে ত দেহপাত হয় না। আমরা প্রবৃত্তির দাস; তাই মনে করি, আমিষ না হইলে আহারই হয় না। 'প্রবৃত্তি রেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা'।"

"সে কথা সত্য কিন্তু চিরজীবনের অভ্যাস সহসা পরিবর্ত্তিত করিলে স্বাস্থ্যহানি হইবে।"

"আমার কন্যা জীবনের অতৃপ্ত বাসনা লইয়া তরুণ বয়সে যে ব্রহ্মচর্যের অনুষ্ঠান করিবে আমি তৃপ্ততৃষ্ণ বৃদ্ধ তাহা করিতে পারিব না? যদি না পারি, তবে আমাতে আর পশুতে প্রভেদ কোথায়? পশুশিশু বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহার সহিত তাহার পিতামাতার আর কোন সম্পর্ক থাকে না; কিন্তু মানুষের ত তাহা নহে। যদি কন্যার পক্ষে নির্দ্দিষ্ট সংযম-সাধনও না করিতে পারি তবে আমি পিতৃপদ লাভের যোগ্য নহি।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বৈবাহিক আর কোনও কথা কহিতে পারিলেন না।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "আমি বুঝিতে পারিয়াছি, বামাচরণ আপনাকে এইরূপ বুঝাইয়াছে। আপনি তাহাকে বলিবেন, সে তাহার পিতার জন্য যেরূপ চিন্তিত হইয়াছে যদি তাহার ভ্রাতাভগিনীদিগের জন্য সেরূপ চিন্তিত হয়, তবে সে পিতার প্রিয়কার্য্য করিবে—পিতার পিণ্ডদান অপেক্ষাও তৃপ্তিপ্রদ কার্য্য করিতে পারিবে। তাহা হইলে আমার হৃদয়ের দুশ্চিন্তা-দাবানল নির্ব্বাপিত হইবে; আমার জীবন-সায়াহ্ন শান্তিস্নিগ্ধ হইবে—আমি সুখে মরিতে পারিব। আপনি তাহাকে এই কথা বুঝাইয়া বলিবেন।"

এত দিন যে বেদনা ভট্টাচার্য্য মহাশয় বক্ষে বহিয়াছিলেন—প্রকাশ করেন নাই আজ তাহা ব্যক্ত হইয়া পড়িল। শোক হৃদয়কে দুর্ব্বল করে। কিন্তু ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কথা তাঁহার বৈবাহিকের বা দ্বারান্তরালে দণ্ডায়মান বামাচরণের প্রীতিপ্রদ

হইল না। বামাচরণ আপনার উপার্জ্জিত অর্থ আপনিই রাখিত —ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের তাহাতে কোন আপত্তি ছিল না; কিন্তু সে যে ভাবে ব্যবসায়ের প্রকৃত অবস্থা গোপন করিয়া সে কার্য্য করিত তাহাতে তাহার পিতা স্পষ্টই বুঝিয়াছিলেন, সে বৃহৎ একান্নবর্ত্তী পরিবারের কর্ত্তা হইয়া সংসার ঠিক রাখিতে পারিবে না। তাহাতে যে স্বার্থত্যাগের—যে আত্মত্যাগের প্রয়োজন তাহা বামাচরণের প্রবৃত্তিবিরুদ্ধ। তাই তিনি তাঁহার মৃত্যুর পর বামাচরণের কর্ত্তৃত্বে সংসার ভাঙ্গিবার আশঙ্কায় শঙ্কিত হইয়াছিলেন। এক্ষণে বিরজার বৈধব্যে সে আশঙ্কার গুরুত্ব আরও বাড়িয়াছে। গৃহে ভগিনী বিধবা, ভ্রাতৃজায়া উন্মাদরোগগ্রস্তা, দুহিতা বিধবা—এ সংসার যদি ভাঙ্গিয়া যায় তবে কাহার কি হইবে—বিরজার কি হইবে? এই ভাবনায় ভট্টাচার্য্য মহাশয় বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন—তাই তাঁহার মনের কথা আত্মপ্রকাশ করিল।

কিন্তু এ কথা বামাচরণের ভাল লাগিল না। তাহার শ্বশুরেরও প্রীতিপদ হইল না—কারণ, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সংসারের ভাবনায় তাঁহার কি দায়? তিনি বুঝেন, জামাতার হস্তে অর্থ থাকিলে কন্যা সুখে থাকিবার সম্ভাবনা।

সেই দিন রাত্রিকালে ভট্টাচার্য্য মহাশয় ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার নয়নে নিদ্রা নাই—হৃদয়ে দারুণ দুশ্চিন্তা। আজ তাঁহার কেবল মনে হইতে লাগিল, যদি আজ বিরজার জননী জীবিতা থাকিতেন—তবে তাঁহার দুশ্চিন্তা অনেকটা প্রশমিত হইত।

বিপদে—দুর্ভাবনায় মানুষ স্বভাবতঃই সহানুভূতির জন্য ব্যাকুল হয়—তখন সে পত্নীর অভাব যত অনুভব করে, সম্পদে—সুখের সময় তত করে না। চিন্তাবিষ্ট ভট্টাচার্য্য মহাশয় চমকিয়া দেখিলেন, মুক্ত বাতায়নপথে দিবালোক কক্ষে প্রবেশ করিয়াছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কোন্ পথে ?

কলিকাতায় আসিয়া যতীশচন্দ্র বিদ্যালয়নির্দ্দিষ্ট পাঠে মন দেয় নাই। অমূল্যচরণের উৎসাহে আপনার সাহিত্যিক ক্ষমতাসম্বন্ধে তাহার যে ভ্রান্ত ধারণা জন্মিয়াছিল তাহাতে সে মনে করিয়াছিল, বিদ্যালয়নির্দ্দিষ্ট পাঠে সময় নষ্ট করা তাহার পক্ষে অনাবশ্যক। সে সাহিত্য-ক্ষেত্রে যশোলাভের চেষ্টায় ব্যস্ত হইয়াছিল। সে ক্ষেত্রে অমূল্যচরণ তাহার পথিপ্রদর্শক। অমূল্যচরণ ক্রমেই যতীশ চন্দ্রের উপর অধিক প্রভাব বিস্তৃত করিতেছিল। সঙ্গে সঙ্গে সে মাসিক পত্রের ব্যয়ভারও যতীশচন্দ্রের স্কন্ধে ন্যস্ত করিতেছিল। যতীশচন্দ্র জড়াইয়া পড়িতেছিল। এক প্রকার সর্প দৃষ্টির দ্বারা জীবকে আকৃষ্ট করিয়া শেষে তাহাকে গ্রাস করে। অমূল্যচরণ তেমনই সাহিত্যের দ্বারা যতীশচন্দ্রকে আকৃষ্ট করিয়া তাহার সর্ব্বনাশ করিতেছিল।

দেখিতে দেখিতে কয় মাস কাটিয়া গেল। সম্মুখে দুর্গোৎসব। বাঙ্গালায় আবার নবীন আনন্দের ক্ষীণ প্রবাহ প্রবাহিত হইল— শীর্ণ—শুষ্ক তরুর রিক্ত শাখায় যেন পল্লব ও কুসুম দেখা দিল। যতীশচন্দ্র গৃহে গেল।

ধরণীধরের অভিপ্রায়মত তাঁহার জননী যতীশচন্দ্রের গৃহে আগমনের দুই দিন পূর্ব্বেই সরোজাকে পিত্রালয় হইতে আনাইয়াছিলেন।

ব্রজেন্দ্রের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া যতীশচন্দ্র একবার শ্বশুরালয়ে গিয়াছিল—সেও কয় ঘণ্টার জন্য। কয় মাস পরে সরোজার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। সরোজা মধ্যে মধ্যে স্বামীর পত্র পাইত। সে সকল পত্রের কবিত্বের উচ্ছ্বাস সে সম্যক বুঝিতে না পারিলেও—সে সকলকে ভিত্তি করিয়া তাহার নবোন্মেষিত হৃদয় আশার বিরাট প্রাসাদ রচিত করিয়াছিল। সে স্বামীকে সর্ব্বগুণাধার কল্পনা করিয়াছিল; আশা করিয়াছিল, তাঁহার অবারিত আদরে, অনাবিল ভালবাসায় তাহার জীবন কুসুমময় হইবে। এই আশা হৃদয়ে ধরিয়া সে স্বামিসন্দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল।

কিন্তু প্রথম সাক্ষাতেই তাহার কল্পিত নন্দনে কুসুমসুষমার অভাব অনুভূত হইল। বাস্তবিক অমূল্যচরণের সহিত আলাপে যতীশচন্দ্র পত্নীর যে আদর্শ কল্পনা করিয়াছিল, তাহা স্বামীর সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে পরিচিতা যুবতীর আদর্শ। সে আদর্শ প্রথমস্বামিসন্দর্শনব্রীড়াসঙ্কুচিতা বালিকায় বিকশিত হইতে পারে না। চঞ্চলচিত্ত যতীশচন্দ্র তাহা বুঝিল না। সে পত্নীর ব্যবহারে হতাশ হইল—বিরক্তি বোধ করিল। তাহার ব্যবহারে সে বিরক্তি গোপন রহিল না। তাই সরোজার আশাও মিটিল না। সে ব্যথিতা হইল, ফুটিবার পূর্ব্বেই কারকাঘাতে কুসুমকোরক সঙ্কুচিত হইয়া গেল।

যে দিন যতীশচন্দ্র গৃহে আসিয়াছিল তাহার দুই দিন পরে তাহার কয়জন সাহিত্যিক বন্ধুর তাহার গৃহে আসিয়া আহার

করিবার কথা ছিল। নির্দ্ধারিত দিবসে কয়জন বন্ধু মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে আসিয়া উপস্থিত হইল। অমূল্যচরণ অন্য নিমন্ত্রণের জন্য অপরাহ্নের পূর্ব্বে আসিতে পারিল না। সে যখন আসিল তখন সে সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ নহে—তাহার মদ্যের নেশা তখনও কাটে নাই। তাহার অবস্থা দেখিয়া যতীশচন্দ্র কিছু লজ্জিত হইয়া পড়িল।

গৃহে ফিরিবার পূর্ব্বে বন্ধুরা "বৌ" দেখিতে চাহিল। যতীশ-চন্দ্রের পিতামহী পরম যত্নে বধূর প্রসাধন সম্পন্ন করিলেন। এমন সময়ে সরোজার সহিত তাহার পিত্রালয় হইতে আগতা দাসী আসিয়া সংবাদ দিল—আগন্তুকদিগের মধ্যে এক জন "মাতাল"। মদমত্তকে সরোজা বড় ভয় করিত। দাসীর কথা শুনিয়া সে কিছুতেই আগন্তুকদিগের সম্মুখে যাইতে সম্মতা হইল না। এ দিকে তাহার গমনে বিলম্ব দেখিয়া যতীশচন্দ্র অন্তঃপুরে আসিল এবং পিতামহীর নিকট সব কথা শুনিয়া সরোজাকে তিরস্কার করিল। বিনা দোষে স্বামীকর্ত্তৃক তিরস্কৃতা হইয়া সরোজা অত্যন্ত ব্যথিতা হইল। তাহার দুই চক্ষু হইতে অবিরল অশ্রু ঝরিতে লাগিল। পিতামহী সরোজাকে যাইবার জন্য বলিতেছেন—সরোজা দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছে—যতীশচন্দ্র ক্রুদ্ধ-ভাবে দাঁড়াইয়া আছে, দাসী নির্ব্বাক হইয়া একবার পিতামহীর দিকে—একবার যতীশচন্দ্রের দিকে চাহিতেছে, এমন সময়ে কক্ষদ্বার হইতে জননীকে ডাকিয়া ধরণীধর কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

যতীশচন্দ্র পিতাকে প্রণাম করিয়া কক্ষ হইতে চলিয়া গেল। ধরণীধর জননীর পদধূলি লইয়া সরোজাকে বলিলেন,—"এই যে, আমার আর এক মা!" সরোজা শ্বশুরকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তখন পশ্চিমের মুক্ত বাতায়নপথে দিবালোক কক্ষ প্লাবিত করিয়াছে। ধরণীধর সরোজাকে বলিলেন, "মা, কাঁদিতেছ কেন? এই যে তোমার গৃহ। বাপের বাড়ী ত পরের ঘর। মন কেমন করিতেছে বুঝি? তাহাতে কি, মা, আমি এক দিন সঙ্গে করিয়া তোমাকে ইচ্ছাপুরে লইয়া যাইব।" তাহার পর তিনি জননীকে বলিলেন, "মা'কে এত গহনা পারাইয়া সাজাইয়া দাঁড় করাইয়া রাখিয়াছ কেন?"

ধরণীধরের জননী বলিলেন, "যতীশের বন্ধুরা 'বৌ' দেখিতে চাহিতেছে।"

ধরণীধর সরোজাকে বলিলেন, "চল, মা, আমি তোমাকে লইয়া যাইতেছি।"

দাসী বলিল, "বাবুদের মধ্যে একজন মাতাল। দিদিমণির মাতালকে বড় ভয়, তাই যাইতে চাহিতেছেন না।"

ধরণীধর চমকিয়া উঠিলেন; সরোজাকে বলিলেন, "মা, তোমাকে যাইতে হইবে না।"

তাহার পর প্রলয়ঝঞ্ঝার মত প্রবল বেগে তিনি বৈঠকখানায় আসিলেন।

যতীশচন্দ্রের বন্ধুরা তখন গমনোদ্যোগ করিতেছে। ধরণীধর তথায় আসিলেন—অমূল্যচরণকে লক্ষ্য করিলেন। তাঁহার

বোধ হইতে লাগিল, কে যেন তাঁহার সর্ব্বশরীরে বিষজ্বালা সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছে। বন্ধুবর্গকে বিদায় দিয়া যতীশচন্দ্র ফিরিয়া দেখিল, ধরণীধর দালানে পাদচারণ করিতেছেন। পুত্রকে দেখিয়া পিতা বলিলেন, "তোমার অতিথিদিগের মধ্যে একজন মত্ত অবস্থার বন্ধুগৃহে আসিতে লজ্জা বোধ করেন নাই!"

যতীশ কোন কথা কহিল না।

ধরণীধর পুনরায় বলিলেন, "আমি মনে করিয়াছিলাম, তুমি সুশিক্ষায় শিক্ষিত হইতেছ। কিন্তু যে শিক্ষা শিক্ষিতকে সঙ্গি-নির্ব্বাচনে সমর্থ করে না, সে শিক্ষা কিরূপ? যে গৃহে তোমার পিতামহীর ও পত্নীর বাস, যে গৃহ তোমার জননীর স্মৃতিপূত, সে গৃহকে যদি দেবমন্দিরের মত পবিত্র মনে করিতে না পার—সে গৃহ যদি কলঙ্কিত হইতে দাও, তবে তোমার মত দুর্ভাগ্য আর কাহারও থাকিবে না।"

যতীশ চলিয়া গেল। সে দিন পিতাপুত্রে আর কোন কথা হইল না। কিন্তু যতীশচন্দ্র পিতার বেদনার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিল না।

অমূল্যচরণের অবস্থায় যতীশচন্দ্র লজ্জিত হইয়াছিল। পিতার তিরস্কারে তাহার সে ভাব দূর হইল; সে অমূল্যচরণের ব্যব-হারের সমর্থনে প্রবৃত্ত হইল। সে ভাবিল, সাহিত্যিকদিগের মধ্যে অনেকে মদ্য পান করিয়াছেন—তাহাতে কি তাঁহাদের প্রতিভার গৌরব ক্ষুণ্ণ হইয়াছে? তবে অমূল্যচরণ কিসে নিন্দার্হ।

যতীশচন্দ্র পিতামহীর নিকট শুনিল, অমূল্যচরণের মত্ততার

কথা দাসী ধরণীধরকে বলিয়া দিয়াছিল। সে পিতামহীকে বলিল, "ঝির থাকিবার কোন প্রয়োজন নাই। উহাকে বিদায় করিয়া দাও।"

পৌত্রের কথায় পিতামহী বিপন্না হইলেন। যাহারা কলিকাতার 'মেসের' ঝি দেখিয়া দাসীর আদর্শ স্থির করিয়াছে তাহারা সেকালের সর্ব্বত্র এবং অল্পদিন পূর্ব্বেও পল্লীগ্রামের দাসীর স্বরূপ বুঝিতে পারিবে না। পল্লীর পরিচিত দরিদ্র পরিবারের অসহায়া বিধবা দাসীরূপে অন্য পরিবারভুক্তা হইত। সে সেই পরিবারেরই হইয়া যাইত। সে পরিবারে তাহার নির্দ্দিষ্ট স্থান থাকিত। সে গৃহিণীর দুহিতৃস্থানীয়া, বধূদিগের ননন্দার মত; বালকবালিকারা তাহাকে পর বলিয়া জানিত না। এরূপ দাসীকে বিদায় করিয়া দেওয়া কুটুম্বের অপমান করা। তাই পিতামহী কোন কথা বলিলেন না। তাঁহাকে নিরুত্তর দেখিয়া যতীশচন্দ্রের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। সে বলিল, "ঝিকে বিদায় করিয়া দাও। না হইলে আমি কল্যই কলিকাতায় চলিয়া যাইব।"

কর্ত্তব্য স্থির করিতে অসমর্থ হইয়া ধরণীধরের জননী পরদিন পুত্রকে এ কথা বলিলেন। শুনিয়া ধরণীধর বলিলেন, "মা, যত দিন তুমি জীবিত আছ তত দিন সংসারের ব্যবস্থায় আমার— আর যত দিন আমি জীবিত আছি তত দিন তাহাতে যতীশের কথা কহিবার অধিকার নাই। দাসীর কি অপরাধ যে, তাহাকে বিদায় করিয়া দিয়া কুটুম্বের সহিত বিবাদ বাধাইব? ভাবিয়া-

ছিলাম, শিক্ষায় ছেলের বুদ্ধি পরিপক্ক হইবে—এখন দেখিতেছি, আমার অদৃষ্টে সবই বিপরীত হইয়েছে।”

কলিকাতায় নিমন্ত্রণ আছে বলিয়া যতীশচন্দ্র সেই দিন কলিকাতায় গেল। পুত্রের ব্যবহারে মর্ম্মাহত ধরণীধরের মনে হইতে লাগিল, যেন দারুণ ভারে তাঁহার বক্ষ চূর্ণ হইয়া যাইতেছিল।

পুত্র প্রত্যাবৃত্ত হইলে ধরণীধর তাহাকে বলিলেন, “আমার কর্ম্ম হইতে বিদায় লইবার তিন মাস মাত্র বিলম্ব আছে। মনে করিয়াছি, বিদায় লইয়া কিছু ভূসম্পত্তি ক্রয় করিব। তোমাকে সেই সকল দেখিতে হইবে; কাযেই তোমার আর পরীক্ষা দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। তুমি কখনও কলিকাতা ব্যতীত কোথাও যাও নাই। মা'র তুমি 'সর্ব্বতীর্থ' হইয়া আছ। এবার তোমরা আমার সঙ্গে চল। মা'কে তীর্থ দেখাইয়া একটু বেড়াইয়া একেবারে গৃহে আসিব। জীবনের শেষ কয় দিন এই গঙ্গাতীরে গৃহে কাটাইব; আর কোথাও যাইব না। বিশেষ যে এত কাল বিদেশে, সে বৃদ্ধবয়সে সংসারের মায়ায় জড়াইয়া পড়িলে আর নড়িতে পারিবে না।”

ধরণীধর যখন পুত্রকে এই কথা বলিতেছিলেন, তখন তাঁহার মানসপটে পুত্রপুত্রবধূপৌত্রপৌত্রীপরিশোভিত সুখময় সংসারের কল্পিত চিত্র ফুটিয়া উঠিতেছিল। তিনি মনে করিয়াছিলেন, দিনান্ত গগনের মত তাঁহার জীবনের অন্তভাগ বিচিত্র সৌন্দর্য্য-সুখময় হইবে। কিন্তু যতীশচন্দ্র যখন উত্তর করিল, “আমি

পরীক্ষা দিব। আপনি বরং ঠাকুরমা'কে একবার তীর্থ দেখাইয়া আনুন।" তখন সেই সমুজ্জ্বল চিত্র সহসা মসীমলিন হইয়া গেল—যেন অতর্কিত জলদোদয়ে দিনান্তগগনশোভা বিলুপ্ত হইল। ধরণীধর আর কোন কথা কহিলেন না।

ধরণীধর পুত্রের শিক্ষার জন্য একজন অঙ্ক-শিক্ষক নিযুক্ত করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন এবং প্রতি মাসে শিক্ষকের বেতন-নির্ব্বাহের জন্য আবশ্যক অর্থও পাঠাইতেন। একাদশীর দিন যতীশ বলিল, শিক্ষক তাহাকে পূজার পরই কলিকাতায় যাইতে বলিয়াছেন। সে কলিকাতায় চলিয়া গেল।

সেই দিন মধ্যাহ্নের পর সরোজাকে সঙ্গে লইয়া ধরণীধর ইচ্ছাপুর যাত্রা করিলেন।

ধরণীধর বৈবাহিককে সকল কথা বলিলেন। তিনি বলিলেন, "যতীশ কুসঙ্গে মিশিয়াছে। আমি তিন মাস পরে ফিরিয়া আসিয়া সকলকে কিছু দিনের জন্য পশ্চিমে লইয়া যাইব। তাহার পর যতীশকে সাংসারিক কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিব। তখন এ অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে। যত দিন আমি না ফিরিয়া আসি, বধূমাতাকে আমার গৃহে পাঠাইবেন না।"

সন্ধ্যার অল্পক্ষণ পূর্ব্বে ধরণীধর গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি ভাবিতে ভাবিতে এমনই আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলেন যে, কখন দিবাবসানে নিশার অন্ধকার ধরণী আবৃত করিয়াছিল তাহা বুঝিতে পারিলেন না। সায়ংসন্ধ্যার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল—তাঁহার সে জ্ঞান নাই। নৌকা গ্রামের ঘাটে আসিলে

মাঝির কথায় তাঁহার চমক ভাঙ্গিল। তিনি নৌকায় সন্ধ্যা সমাপন করিয়া গৃহাভিমুখগামী হইলেন।

সে রাত্রিতে তাঁহার নয়ন নিদ্রামুদ্রিত হইল না। পরদিন ধরণীধর কর্ম্মস্থলে যাত্রা করিলেন। তাঁহার কেবল মনে হইতে লাগিল, কবে চাকরীর অবশিষ্ট তিন মাস শেষ হইবে? তিন মাস এত দীর্ঘ কাল!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পিতাপুত্র।

চিন্তাক্লিষ্ট হৃদয়ে ধরণীধর কর্ম্মস্থানে আসিলেন। তাঁহার হৃদয়ে শান্তি নাই; কেবল দুশ্চিন্তা—কেবল আশঙ্কা—কেবল বেদনা। তিনি সুদীর্ঘ জীবন কঠোর আত্মত্যাগে অতিবাহিত করিয়া যে আশার স্বপ্নে সুখী ছিলেন—সে আশা বিনষ্ট হইয়াছে। তিনি সংসার মরুভূমিতে যে রম্য উপবন রচনা করিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন তাহার রচনার সম্ভাবনা শেষ হইয়া গিয়াছে। তিনি যে উদ্দেশ্যে জীবন বহন করিতেছিলেন সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। এখন তাঁহার জীবন উদ্দেশ্যহীন—আশাশূন্য—বেদনামাত্র।

পক্ষকাল বিবেচনার পর তিনি পুত্রকে পত্র লিখিলেন। সে পত্রে তিনি লিখিলেন, "তুমি ব্যতীত আমার স্নেহের অন্য অবলম্বন নাই, আমার আর কেহ নাই। যাহাতে দারিদ্র্যের অনলে তোমাকে মনুষ্যত্ব নষ্ট করিতে না হয়, যাহাতে দারিদ্র্যদুঃখে তোমাকে পারিবারিক সুখসম্ভোগে বঞ্চিত হইতে না হয় সেইজন্য আমি সমস্ত জীবন বিদেশে অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছি ও সেই অর্থ সঞ্চিত করিয়াছি। আমি যে পরিমাণ অর্থসঞ্চয়ে সমর্থ হইয়াছি, তাহাতে তোমার কখনও অভাব হইবার কথা নহে। আমি সে অর্থে ভূমি-সম্পত্তি ক্রয় করিব। তোমাকে তাহার তত্ত্বাবধান করিতে হইবে। এ অবস্থায় তোমার পক্ষে তোমার অপ্রিয় পাঠে কালক্ষেপ করা অনাবশ্যক। আমার অবসর গ্রহণের আর

অধিক বিলম্ব নাই। তুমি মা'কে ও বধূমাতাকে লইয়া আমার নিকট আসিবে।" তিনি লিখিলেন, "আশা করি, আমার অভিপ্রায়মত কার্য্য করিবে।"

যতীশচন্দ্র পত্রখানি অমূল্যচরণকে দেখাইল। সে স্বজনগণের নিকট হইতে যত দূরে যাইতেছিল অমূল্যচরণকে সে ততই আপনার বলিয়া মনে করিতেছিল। অমূল্যচরণ তাহাকে বুঝাইল, তাহার পিতা যাহাই বলুন না কেন তাঁহার ইচ্ছামত কার্য্য করিবেন না; করিতে পারিবেন না। পত্র পাঠ করিলে সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না। সুতরাং ভয় পাইবার কারণ নাই। ধরণীধরের চরিত্রের দৃঢ়তার স্বরূপ উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা অমূল্যচরণের ছিল না। অমূল্যচরণের উপদেশে যতীশ পিতাকে লিখিল, তাঁহার পরীক্ষার অধিক বিলম্ব নাই; এ অবস্থায় দেশভ্রমণে যাইলে তাহার ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ বিঘ্নবহুল হইবে। তিনি তাহাকে শিখাইয়াছেন, স্বাবলম্বনের তুল্য গুণ আর নাই। সে সেই শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া স্বেচ্ছায় স্বাবলম্বন পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহে।

কেবল ইহাই নহে, সে কলিকাতায় বাসা ভাড়া করিয়া সরোজাকে আনিবার উদ্যোগ করিল। অমূল্যচরণ মাসিক পত্রের ব্যয়ভার তাহার স্কন্ধে দিয়া তাহাকে ঋণজালে জড়িত করিতেছিল। ঋণ পাওয়া যায় দেখিয়া তাহারও সাহস বাড়িয়া গিয়াছিল। তাই সে আনিবার দিন স্থির করিয়া সরোজাকে পত্র লিখিয়া নির্দ্দিষ্ট দিনে ইচ্ছাপুরে উপনীত হইল। ভট্টাচার্য্য

মহাশয় শোকে কাতর ছিলেন। তাহার উপর যতীশচন্দ্রের বন্ধু-বান্ধবসম্বন্ধে কোন কথাই ধরণীধর তাঁহার নিকট গোপন করেন নাই। তাহাতে তাঁহার দুশ্চিন্তা বর্দ্ধিত হইয়াছিল। এখন যতীশ-চন্দ্রের এই প্রস্তাবে তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। তাঁহার দুশ্চিন্তার কারণও একাধিক—সরোজার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া তিনি চিন্তিত হইয়াছিলেন। যতীশচন্দ্রের উচ্ছৃঙ্খল সঙ্গীদের সহিত বন্ধুত্বে তাঁহার চিন্তার আরও কারণ ছিল। বিধবা দুহিতাকে গৃহে আনিয়া তিনি সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, গৃহ যাহাতে শান্তির ও সংযমের পূত মন্দিরে পরিণত হয় তাহারই চেষ্টা করিবেন। সে মন্দিরে উচ্ছৃঙ্খলের প্রবেশাধিকার নাই। যতীশ যখন তাঁহাকে আপনার অভিপ্রায় জানাইল, তখন তিনি বলিলেন, "বৈবাহিক মহাশয়ের অনুমতি ব্যতীত আমি সরোজাকে পাঠাইব না। তোমার উপার্জ্জনের ক্ষমতা কি যে তুমি কলিকাতায় বাসা করিয়া স্ত্রীকে লইয়া যাইবে? অভিভাবকশূন্য অবস্থায় সরোজা কলিকাতায় কিরূপে থাকিবে?" যতীশ বলিল, "আমি সে সব বিবেচনা করিয়াছি। আমি বাসা করিয়াছি।" ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "তুমি পাগল হইতে পার—আমি পাগল নহি। তুমি মদ্যপানমত্ত বন্ধুর সম্মুখে পত্নীকে লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলে, ইহাই তোমার বিবেচনার ফল!"

যতীশ চলিয়া গেল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় ধরণীধরকে সকল কথা লিখিয়া জানাইলেন।

এদিকে ধরণীধর পুত্রের পত্র পাইলেন—বৈবাহিকের পত্রও

পাইলেন। সাত দিন তিনি কোন পত্রের উত্তর দিলেন না—দুশ্চিন্তায় ব্যস্ত রহিলেন। তাহার পর তাঁহার সঙ্কল্প স্থির হইল। তিনি বৈবাহিকের কার্য্যের অনুমোদন করিয়া বৈবাহিককে পত্র লিখিলেন। তিনি পুত্রকে যে পত্র লিখিলেন, তাহাতে লিখিলেন, "দেখিতেছি, স্বাবলম্বনের নামে তুমি স্বেচ্ছাচারের উদ্যোগ করিতেছ। স্বাবলম্বন গুরুজনের অবমাননার নামান্তর নহে; তাহা আত্মম্ভরিতায় আত্মপ্রকাশ করে না। তুমি যে সমাজে ও যে পরিবারে জন্মিয়াছ, সে সমাজে ও সে পরিবারে গুরুজনের আদেশ সর্ব্বথা পালনীয়। তোমার শুভাশুভ তুমি বুঝ, সন্দেহ নাই। কিন্তু আমারও তোমার শুভ-কামনা ব্যতীত অন্য কামনা নাই। আমার সাংসারিক অভিজ্ঞ-তায় তোমার উপকার হইতে পারে। আমি তোমাকে যে আদেশ করিয়াছি, তাহা বিশেষ বিবেচনা করিয়াই করিয়াছি। তুমি কলিকাতার কুসঙ্গিসমাজ ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিবে। শুনিলাম, তুমি কলিকাতায় স্বতন্ত্র বাসা করিতে চাহিয়াছ। এ ব্যবস্থা কেন? যাহা হউক, তুমি পত্র পাঠমাত্র গৃহে যাইবে এবং মা'কে ও বধূমাতাকে লইয়া আমার নিকট আসিবে। ইহাই আমার অভিপ্রেত। যদি তুমি আমার নির্দ্দেশমত কাজ না কর, তবে স্বাবলম্বন অবলম্বন করিয়া তোমার অভিরুচিত কার্য্য করিতে পার। আমার আর কোন দায়িত্ব থাকিবে না।"

পিতৃহৃদয়ের দারুণ বেদনা এই পত্রের ছত্রে ছত্রে আত্মপ্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল। কিন্তু যতীশচন্দ্র এই পত্র পাইয়া

পিতার অভিপ্রায়মত কার্য্য করা দূরে থাকুক, তাঁহার অভিপ্রায়-বিরুদ্ধ কার্য্য করিতেই কৃতসঙ্কল্প হইল। অমূল্যচরণের উৎসাহ-ইন্ধনে তাহার এই সঙ্কল্পবহ্নি পুষ্ট হইল। যতীশচন্দ্র বুঝিল না, সেই বহ্নির শত শিখা তাহারই সর্ব্বনাশ করিতেছিল।

যথাকালে ধরণীধর কার্য্যত্যাগ করিলেন। তিনি এত দিন কার্য্যে ব্রতী ছিলেন ও এত মনোযোগের সহিত কায করিতেন যে, কার্য্যত্যাগ করিয়া তাঁহার মনে হইল, যেন তাঁহার আর কোন বন্ধন নাই। তিনি যে বন্ধনের আশায় এ বন্ধন ত্যাগ করিয়াছিলেন, সে বন্ধনলাভ তাঁহার ভাগ্যে আছে কি?

তিনি গৃহে আসিলেন। যতীশ সে সংবাদ পাইল; কিন্তু গৃহে আসিল না।

কয় দিন অপেক্ষা করিয়া তিনি ইচ্ছাপুরে গমন করিলেন। তিনি বৈবাহিককে সকল কথা বলিলেন; বলিলেন,—"আমার অদৃষ্টে সুখভোগ নাই, আমি সুখ লাভের চেষ্টা করিলে কি হইবে? আশা করিয়াছিলাম, সুদীর্ঘ কাল গৃহত্যাগী অবস্থায় দাসত্বে কাটাইয়া জীবনের শেষ কয় দিন পারিবারিক সুখে অতিবাহিত করিয়া গঙ্গার তীরে অনন্ত শান্তিভোগ করিব। কিন্তু তাহা হইবার নহে। আমি আবার গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিলাম। বধূমাতার দুঃখে আমি বড়ই কাতর হইয়াছি। কিন্তু যাহাতে তাঁহার গ্রাসাচ্ছাদনের কষ্ট না হয়, তাহার ব্যবস্থা আমি করিব।" ধরণীধর পাঁচ হাজার টাকার 'কোম্পানীর কাগজ' সরোজার নামে লিখিয়া আনিয়াছিলেন, ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে তাহা দিলেন।

তাহার পর তিনি বিদায় লইলেন। সরোজা শ্বশুরকে প্রণাম করিলে ধরণীধর আশীর্ব্বাদ করিলেন,—"মা আমার, চিরসুখী হও।" তিনি একটি বাক্স আনিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার পত্নীর অলঙ্কার ছিল। বাক্সটি সরোজাকে দিয়া তিনি বলিলেন,—"মা, এইগুলি তোমার শাশুড়ীর অলঙ্কার। এগুলি তুমি ব্যবহার করিও। আমি এতদিন তোমার জন্য এগুলি রক্ষা করিয়া আসিয়াছি।"

পুত্রবধূকে আশীর্ব্বাদ করিবার সময় ধরণীধরের অভ্যস্ত স্থৈর্য্য বিচলিত হইল—তাঁহার নয়ন হইতে দুই বিন্দু অশ্রু পতিত হইল। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নয়ন ছলছল করিতে লাগিল।

গৃহে ফিরিয়া ধরণীধর জননীকে বলিলেন,—"মা, যতীশ আমার কথা শুনে নাই। আমি কিছুদিনের জন্য কাশীতে যাইব। তুমি আমার সঙ্গে চল।"

তিনি শিশুকাল হইতে যে পৌত্রকে "মানুষ" করিয়াছেন—যে তাঁহার সর্ব্বস্ব, ধরণীধরের জননী তাহাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে সম্মতা হইলেন না। হায় স্নেহ! তুমি মানুষকে এমন বন্ধনে বদ্ধ কর যে, সে তাহা ছিন্ন করিতে পারে না। তিনি পুত্রকে বুঝাইলেন—যতীশ "ছেলে মানুষ"—তাহার উপর কি রাগ করিতে আছে? তিনি তাহাকে আর বাড়ী হইতে যাইতে দিবেন না ইত্যাদি। জননীর ব্যয়নির্ব্বাহের কি উপায় করিবেন, ধরণীধর তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। এই সময় তিনি সংবাদ পাইলেন, গ্রামে কোন ভদ্রলোক তাঁহার গাঁতি জমার

মালেকান স্বত্ব বিক্রয় করিতেছেন। সম্পত্তির বার্ষিক আয় প্রায় এক সহস্র টাকা। "ঠাকুরদাদা" হরিনাথ ভট্টাচার্য্যকে মধ্যে রাখিয়া ধরণীধর সব কথা পাকা করিয়া ঐ সম্পত্তি ক্রয় করিয়া উহার আয় জননীর জীবনস্বত্ব করিয়া দিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, নগদ টাকা বা 'কোম্পানীর কাগজ' দিলে যতীশ তাহা অধিকার করিবে এবং তাঁহার জননী বঞ্চিতা হইবেন।

এই ব্যবস্থা করিয়া ধরণীধর যাত্রার আয়োজন করিলেন।

যাত্রার দিন আসিল। রাত্রিতে আহারের পর যাত্রা করিতে হইবে। জননী সে দিনও পুত্রকে গমনে নিরস্ত করিতে প্রয়াস পাইলেন। পুত্র বিচলিত হইলেন না। মা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কাশী হইতে কবে ফিরিবি?" ধরণীধর বলিলেন,—"স্থির নাই।" তিনি মনে মনে ভাবিলেন, হয় ত আর ফিরিবার সুযোগ হইবে না।

যাত্রাকালে ধরণীধর মাতৃচরণে প্রণাম করিলেন—জননীর পদধূলি লইলেন। আজ তিনি হয় ত চিরবিদায় লইতেছেন। বর্ষান্তে যে মাতৃচরণ দর্শনের জন্য তিনি সকল বাধা উপেক্ষা করিয়া গৃহে আসিতেন, হয় ত তাঁহার ভাগ্যে আর সে মাতৃচরণ দর্শন ঘটিবে না। ধরণীধরের হৃদয় বিষাদভারাক্রান্ত হইল।

বাহিরে আসিয়া ধরণীধর একবার গৃহের দিকে ফিরিয়া চাহিলেন। এই গৃহ তাঁহার শৈশবের স্মৃতিজড়িত—যৌবনের স্বপ্নক্ষেত্র—বার্দ্ধক্যের আশাকেন্দ্র। এই গৃহ তাঁহার পরলোকগত

পত্নীর স্মৃতিপূত—এই গৃহ তাঁহার নিকট দেবালয়ের মত পবিত্র। নিষ্কলঙ্ক জীবনে তিনি পত্নীর যে পূত প্রেম লাভ করিয়াছিলেন—যে প্রেম অল্পকালস্থায়ী হইলেও তাঁহার নিকট কালজয়ী—যে প্রেমের স্মৃতি তাঁহার জীবনের সুখ ও সান্ত্বনা, সে প্রেম এই গৃহে বিকশিত হইয়াছিল—এই গৃহে সেই প্রেমাস্পদের বাসভূমি। আর তিনি আশা করিয়াছিলেন—যাহাতে অর্থের অভাবে পুত্রকে পারিবারিক সুখভোগে বঞ্চিত হইতে না হয় তাহার উপায় করিয়া তিনি জীবনের সায়াহ্নে এই গৃহে পুত্রপুত্রবধূ-পৌত্রপৌত্রীপরিবেষ্টিত হইয়া অনাস্বাদিতপূর্ব্ব সুখভোগ করিবেন। আজ তিনি সেই গৃহ ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন—হৃদয়ে নিরাশাবেদনা বহিয়া—উদ্দেশ্যহীন—লক্ষ্যহীন জীবন যাপন করিতে যাইতেছেন।

ধরণীধরের দীর্ঘশ্বাস নৈশ পবনে মিশাইয়া গেল। বিদায় কবে সুখের হয়?

ধরণীধর যাইয়া নৌকায় আরোহণ করিলেন। উপরে আকাশ মেঘমুক্ত—নক্ষত্রখচিত। নিম্নে জাহ্নবীর কলকল্লোলিত প্রবাহ—প্রবাহের অন্ধকার অঙ্গে তরঙ্গে তরঙ্গে নক্ষত্রের প্রতিবিম্ব জ্বলিতেছে। কূলে বৃক্ষলতার পুঞ্জীভূত অন্ধকারে খদ্যোতের বিলয়ভূয়িষ্ঠ আলোক জ্বলিতেছে—নিবিতেছে। নৈশ বায়ুর স্পর্শ শীতল। নৈশ পবনে কেবল ঝিল্লীর ধ্বনি—কেবল দূরাগত নিশাচর প্রাণীর রব।

নৌকা ছাড়িয়া দিল। ধরণীধর ভাবিতে লাগিলেন,—

এত দিন পরে আজ তিনি নিরুদ্দেশ যাত্রার যাত্রী। রজনীর নিস্তব্ধতা চিন্তাশীলকে বিক্ষিপ্ত চিন্তা একত্রিত করিতে সহায়তা করে। এই নিস্তব্ধতা চিন্তার—সাধনার বিশেষ উপযোগী। আজ নৈশ নিস্তব্ধতায় বিনিদ্র ধরণীধর অতীত—বর্ত্তমান—ভবিষ্যৎ তিন কালের কত কথা ভাবিতে লাগিলেন। সে ভাবনায় কেবল বেদনা।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বিদেশে।

সমস্ত রাত্রি ট্রেণ চলিল। অন্ধকার ভেদ করিয়া ট্রেণ ছুটিতে লাগিল। শেষে রাত্রি পোহাইল। বিনিদ্র ধরণীধর দেখিলেন, তিনি বঙ্গের শ্যাম প্রান্তর ছাড়াইয়া আসিয়াছেন। তিনি ভাবিলেন, জীবনে আর কখন বঙ্গজননীর স্নিগ্ধ অঙ্কে ফিরিতে পারিবেন কি? এই বিদায় শেষ বিদায়! তিনি ভাবিতে লাগিলেন।

ক্রমে ট্রেণ বারাণসীর নিম্নে সেতুর নিকটবর্ত্তী হইল। বারাণসীর বরবপু নয়নসমক্ষে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। জহ্নুকন্যার পূত প্রবাহ অর্দ্ধবৃত্তাকারে বারাণসীকে ঘিরিয়া প্রবাহিত হইতেছে। কূলে ঘাটের পর ঘাট—মন্দিরের পর মন্দির—হর্ম্ম্যের পর হর্ম্ম্য। ঘাট স্নানার্থী ও স্নানার্থিনীতে পূর্ণ। ঘাটের জনতায় ভারতের সকল স্থানের অধিবাসীর সমাবেশ। বারাণসীর পুণ্যভূমিতে তনুত্যাগ করিয়া মণিকর্ণিকার মহাশ্মশানে ভস্মীভূত হইবার বাসনায় নানা দিগ্দেশ হইতে হিন্দুরা আসিয়া বারাণসীতে বাস করেন। মোক্ষকামীর এই মহাস্বর্গ ভারতের সর্ব্বস্থানের হিন্দুদিগের মহা সম্মিলনস্থান। বারাণসী হিন্দুধর্ম্মের কেন্দ্র—হিন্দুধর্ম্মের হৃৎপিণ্ড এই বারাণসীতে অবস্থিত। ইতিহাস ইহার আরম্ভসন্ধানে বিফলমনোরথ, কল্পনা ইহার প্রারম্ভকালের ধারণা করিতে পারে না। শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিবাহিত হইতেছে—প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে কত নূতন নগরের উত্থান-পতন

হইয়াছে, বারাণসীর গৌরবশ্রী অন্তর্হিত হয় নাই। কারণ, সে গৌরব রাজৈশ্বর্য্যের সহচর নহে—পরন্তু ভক্তের ভক্তিতে প্রতিষ্ঠিত; তাহা রাজার দান নহে, পরন্তু রাজরাজেশ্বরের বিভূতি। নির্ব্বাণকামী শাক্য রাজকুমার হইতে ধর্ম্মপ্রাণ শঙ্করাচার্য্য, প্রেমাবতার চৈতন্য হইতে আর্য্যধর্ম্মপ্রচারক দয়ানন্দ পর্য্যন্ত যিনি যখন হিন্দুধর্ম্মের নূতন রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন, তিনিই তখন স্বীয় মতের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য বারাণসীতে গমন করিয়াছেন। যে মত বারাণসীতে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, হিন্দু-সমাজে সে মত স্থায়ী হয় নাই। যিনি বারাণসীতে স্বীয় মতের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, হিন্দুধর্ম্মের বিরাট ইতিহাসে তাঁহারই নাম লিখিত হইয়াছে। আর কত জন বারাণসীতে স্ব স্ব মতের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিবার বিফল চেষ্টায় প্রাণপাত করিয়াছেন, কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে? তাঁহাদের চেষ্টা গঙ্গাবক্ষোত্থিত এক একটি তরঙ্গের মত মিলাইয়া গিয়াছে; তাঁহাদের নাম বিস্মৃতির অতলতলে বিশ্রামলাভ করিয়াছে। ইতিহাস অসাফল্যের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে চাহে না। বারাণসী হিন্দুধর্ম্মের কেন্দ্র, তাই বৌদ্ধগণ বারাণসীর উপকণ্ঠে ধর্ম্মপ্রচারকেন্দ্র সংস্থাপিত করিয়াছিলেন—তাই বৈরিনির্য্যাতিত বারাণসীর রক্তসিক্ত বক্ষে ইস্‌লামের জয়ধ্বজা প্রোথিত করিয়া ভ্রান্তবুদ্ধি আরঙ্গজেব অশেষ আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন। কালের ভেষজে সে ক্ষতচিহ্ন আজও মিলায় নাই। বারাণসী দৃষ্টিগোচর হইবামাত্র ট্রেণ হইতে বারাণসীর জয়ধ্বনিতে

তীর্থযাত্রিগণের অসীম উল্লাস আত্ম-প্রকাশ করিল। যাত্রিদল যে আশায় দীর্ঘপথ অতিবাহিত করিয়াছে, সে আশা ফলবতী হইয়াছে। কত দরিদ্র কষ্টলব্ধ সামান্য সঞ্চয় হইতে কিছু কিছু স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়াছিল—আশা, বারাণসী দর্শন করিবে; কত বিধবা বারাণসীতে বিশ্বেশ্বরদর্শনে পরকালের উন্নতির আশায় ইহকালের জীবিকানির্ব্বাহের উপায় নষ্ট করিয়াছে; কত বৃদ্ধ বারাণসীদর্শনের উৎসাহে শারীরিক দৌর্ব্বল্য জয় করিয়াছে; কত খঞ্জ, অন্ধ, বিকলাঙ্গ পরের দয়ায় ও বিশ্বেশ্বরের কৃপায় নির্ভর করিয়া এই দীর্ঘ পথ অতিক্রমণে প্রবৃত্ত হইয়াছে। আজ তাহারা সফলসাধন। আজ তাহাদের সাধনার সিদ্ধি অদূরবর্ত্তিনী। বারাণসীর বরবপু তাহাদের নয়নসমক্ষে উদ্ভাসিত। তাই তাহারা আনন্দে জয়ধ্বনি করিতেছে। ভারতের কাশীকথা ধরণীধরের মনে পড়িল।

"পুণ্যভূমি বারাণসী বেষ্টিত বরুণা অসি
যাহে গঙ্গা আসিয়া মিলিত।
আনন্দ-কানন নাম কেবল কৈবল্যধাম
শিবের ত্রিশূলপরি স্থিত॥

* * * *

যাহে জীব ত্যজি জীব সেই ক্ষণে হয় শিব
পুনঃ নহে জঠর-যাতনা।
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ দনুজ মনুজ রক্ষ
সবে যার করয়ে কামনা॥"

ধরণীধর পূর্ব্বে একাধিকবার বারাণসীতে আসিয়াছেন। কিন্তু আজ যেন বারাণসীর কমকান্তি তাঁহার নিকট অদৃষ্টপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে সুন্দর বোধ হইতে লাগিল। বারাণসী ত্যাগীর স্বর্গ; মায়ামুগ্ধ মায়াবদ্ধ মানবের মনে তাহার স্বরূপ প্রতিভাত হয় না। পূর্ব্বে যখন তিনি বারাণসীতে আসিয়াছিলেন, তখন তিনি সংসারী—সংসারের সুখ তাঁহার অভীপ্সিত। আজ তাঁহার সে স্বপ্ন শেষ হইয়াছে,—আজ অদৃষ্ট নির্ম্মম হস্তে তাঁহার সে আশার বন্ধন ছিন্ন করিয়াছে—তাঁহাকে মুক্তি দিয়াছে। আজ তিনি মায়া হইতে মুক্তি পাইয়া মহামুক্তির সন্ধানে সচেষ্ট; তাই আজ বরাণসী দেখিয়া তাঁহার হৃদয় অননুভূতপূর্ব্ব ভক্তির রসে স্নিগ্ধ ও সরস হইল।

ট্রেণ আসিয়া ষ্টেশনে স্থির হইল। পূর্ণ যান শূন্য করিয়া শত শত যাত্রী কাশীর পুণ্যভূমিতে অবতরণ করিল। আবার বারাণসীর জয়ধ্বনিতে গগন পূর্ণ হইল। ধরণীধর সেই জনসঙ্ঘে মিশিয়া চলিলেন।

কাশীতে কয় দিন থাকিয়াই ধরণীধর বুঝিলেন, তিনি মুক্তির সন্ধানে আসিয়াছেন বটে; কিন্তু তিনি হৃদয় হইতে সংসারের মায়া দূর করিতে পারেন নাই। তিনি বুঝিলেন, তাঁহার হৃদয় সময় সময় দূরস্থিত পুত্রের জন্য ব্যাকুল হয়—তাঁহার কল্পনা সেই দূর পল্লীভবনে ফিরিয়া যায়। ফলে হৃদয় কেবল হতাশার বেদনায় পীড়িত হয়।

তিনি ইহার নিবারণোপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি

বুঝিলেন, নদীর প্রবাহমুখে বাধা সংস্থাপিত করিয়া তাহার গতিরোধ করা দুঃসাধ্য; কিন্তু অন্য পথ প্রস্তুত করিয়া প্রবাহকে সেই পথে প্রবাহিত করা অপেক্ষাকৃত সহজ। তিনি সেই চেষ্টায় চেষ্টিত হইলেন। তিনি শাস্ত্রানুশীলনে প্রবৃত্ত হইলেন। কাশীতে শাস্ত্রানুশীলনের সুবিধাও যথেষ্ট; তত্ত্বজ্ঞানান্বেষীর পক্ষে কাশীর মত উপযোগী স্থান আর নাই। ধরণীধর বিষয়বাসনাবদ্ধ চিত্তকে বাসনাবন্ধনমুক্ত করিবার জন্য তত্ত্বজ্ঞানানুশীলনে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই জ্ঞানের তৃষ্ণা একবার হৃদয়ে দেখা দিলে হৃদয়ে আর কোন আশার—আর কোন তৃষ্ণার স্থান থাকে না—জ্ঞানান্বেষী ইহারই মোহে মুগ্ধ হইয়া আর সব ভুলিয়া যায়। সংসার, সম্পৎ, স্নেহ, প্রেম সব ত্যাগ করিয়া জ্ঞানতৃষ্ণাতুর ইহারই জন্য ব্যাকুল হয়। ধরণীধরেরও তাহাই হইল। তিনি অন্য চিন্তা ভুলিবার চেষ্টায় যাহাকে অবলম্বন করিয়াছিলেন,—সে তাঁহার বাসনা পূর্ণ করিল—তিনি ক্রমে ইহলোকে থাকিয়া পরলোকের সম্বল পরাবিদ্যার চর্চ্চায় তন্ময় হইয়া আর সব ভুলিলেন। তাঁহার মায়াবন্ধন যত শিথিল হইতে লাগিল, শা'নগরের সেই পল্লীভবন তাঁহার হৃদয়ের কেন্দ্র হইতে তত দূরে পরিধিরেখায় অস্পষ্টদৃষ্ট বিন্দুমাত্রে পর্য্যবসিত হইতে লাগিল।

হৃদয়ের সহিত সংগ্রামে ধরণীধর জয়ী হইলেন! কিন্তু সংগ্রাম সর্ব্বদা—সর্ব্বত্র ব্যয়সাধ্য। যখন রাজায় রাজায় বিবাদ বাধিয়া উঠে, তখন লোক ফলাফলের প্রতীক্ষা করে ও জয়ীর সাফল্যে

তাহার প্রশংসা করে। কিন্তু তাহারা যে গৌরবে মুগ্ধ হয়—সে জয়গৌরব কত দুর্ম্মূল্য, তাহা জয়ী ব্যতীত আর কেহ জানে না; সে জয় হয় ত জয়ীর সর্ব্বস্ব দিয়া ক্রীত—তাহার সর্ব্বনাশে হয় ত সে জয়ের পরিণতি। হৃদয়ের সহিত সংগ্রামও সর্ব্বত্র ব্যয়সাধ্য—কুত্রাপি সুলভ নহে। ধরণীধর আপনার স্বাস্থ্য—আয়ু ব্যয় করিয়া জয় লাভ করিলেন। তাঁহার বলসমুন্নত দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িল—স্বাস্থ্যসম্পৎহেতু জরা এত দিন যে দেহ স্পর্শ করিতে পারে নাই, এখন সে দেহে তাহার ক্ষয়চিহ্ন সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সংসার।

যে বারি উর্ব্বর ক্ষেত্রে বর্ষিত হইলে শস্যসম্পদ্ উৎপাদিত করে, তাহাই পঙ্কসার পল্বলে পড়িলে মৃত্যুবাষ্পমাত্র উৎপন্ন করে। যে কথায় শিষ্টের ত্রুটি সংশোধিত হয়—তাহাতে অনেক সময় দুষ্টের দোষ বর্দ্ধিত হয়। বৈবাহিকের নিকট ভট্টাচার্য্য মহাশয় বামাচরণের ব্যবহারে যে বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে বামাচরণ লজ্জিত হইল না, বরং তাহাতে তাহার স্বার্থপর ব্যবহারের স্বরূপ সপ্রকাশ হইয়া পড়িল। এতদিন যে সঙ্কোচ—যে লোকনিন্দাভয়—যে পিতৃরোষাশঙ্কা তাহার স্বার্থপর ব্যবহার সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ রাখিয়াছিল, এখন তাহা দূর হইল—তাহার ব্যবহারও সঙ্কোচসীমা অবাধে অতিক্রম করিয়া আত্মপ্রকাশ করিল।

তারাচরণ কখন কলিকাতায়—কখন গৃহে থাকিত। এবার ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, তাহাকে বিদ্যালয়ে দেওয়া আবশ্যক। তিনি তাহাকে শিক্ষালাভার্থ গ্রামের বিদ্যালয়ে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিলেন। বামাচরণ তাহাতে আপত্তি করিল—গ্রামের বিদ্যালয়ে ভাল শিক্ষক নাই; সে পুত্রকে কলিকাতায় বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করাইতে চাহিল; উদ্দেশ্য, তাহা হইলে সে সপরিবারে কলিকাতায় স্থায়ী হইবে। ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহা বুঝিলেন;

বলিলেন, "ভাল, তাহাই হউক।" কিন্তু এ ব্যবস্থায় পরিবারের আর সকলে কিছু বিস্মিত হইল। পার্ব্বতীচরণের পত্নী বড়বধূকে বলিলেন, "দিদি, এ সময় তারাকে লইয়া যাওয়া কি ভাল হইবে? ঠাকুর এই এত বড় শোক পাইয়াছেন, তারা কাছে থাকিলে তিনি ভাল থাকেন।" বড়বধূ বলিলেন, "'আখেরের' ভাবনা ত ভাবিতে হয়। তখন যে আদর গোবর হইবে? তখন ছেলেই আমাদের দোষ দিবে। এখন কি আর মূর্খ হইয়া কেবল দক্ষিণার কড়িতে সংসার চালান যায়? আর কি দুই দশ হাজার আছে যে, বসিয়া খাইবে?" কথাটাতে উপার্জ্জনবিরত পার্ব্বতী-চরণের প্রতি যে একটু শ্লেষ ছিল না—এমন বোধ হয় না। মধ্যমা বুঝিলেন, তর্ক করা বৃথা। এ সব পূর্ব্বেই 'পড়াপিটা' হইয়া আছে। পার্ব্বতীচরণ স্বয়ং পিতাকে বলিল, "তারার এখন কলিকাতায় যাইয়া কায নাই। আপনার বড় কষ্ট হইবে।" ভট্টাচার্য্য মহাশয় ম্লান হাসি হাসিলেন, "কষ্ট! জীবনে অনেক পাইয়াছি—অদৃষ্টে আরও কত কষ্ট আছে, জানি না। আমার দিন কাটিয়াছে। এখন তোমাদের সুখী দেখিয়া মরিতে পারিলে তাহাই পরম ভাগ্য মনে করিব। তোমাদের সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা ভাল বুঝিয়াছি, করিয়াছি। এখন আমার কর্ত্তব্য শেষ হইয়াছে।"

বামাচরণ আসিয়া পত্নীপুত্রকন্যা লইয়া গেল।

রাধাচরণ পরীক্ষা দিল না—সে বুঝিয়াছিল, পরীক্ষায় তাহার সাফল্য-সম্ভাবনা নাই। তাহার পর সে পশ্চিমে একটি চাকরীর

সংবাদ পাইয়া দরখাস্ত করিল। দরখাস্ত মঞ্জুর হইলে সে ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে সে কথা জানাইল। সে যে তাঁহার উপদেশের অপেক্ষা না রাখিয়া বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়াছে ও বিদেশে চাকরী গ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে—ইহা জানিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় ব্যথিত হইলেন। শেষে যখন তিনি জানিলেন, সে পত্নীকে সঙ্গে লইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে, তখন তিনি তাহাতে সম্মতি দিলেন; কেবল বলিলেন, "বধূমাতা কখনও স্বতন্ত্র সংসার করেন নাই, যদি ভাল বিবেচনা কর, তোমার পিসীমা'কে কিছু দিনের জন্য সঙ্গে লইয়া যাও। তুমি সংসার পাতাইয়া বসিলে তিনি চলিয়া আসিতে পারিবেন।" কিন্তু ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহার বিদেশে চাকরী গ্রহণে আগ্রহের প্রকৃত কারণ নির্ণয় করিতে পারেন নাই। রূপসী পত্নীর রূপজ মোহমুগ্ধ যুবক গুরুজনবিরহিত গৃহে পত্নীকে একান্ত আপনার রূপে পাইবার প্রবল বাসনায় একান্নবর্ত্তী পরিবারের বন্ধন অত্যন্ত কষ্টকর মনে করিতেছিল—তাই সে বিদেশে চাকরী লইয়াছিল; নহিলে—সে জানিত, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের শিষ্যদিগের চেষ্টায় কলিকাতাতেই তাহার চাকরী জুটিতে পারিত। আর সেই জন্যই সে উন্মাদরোগগ্রস্তা জননীকে সঙ্গে লইয়া যাইতে চাহে নাই। সে তাহার চাকরী করিবার কথা তাহার ভগিনীপতিকে লিখিয়াছিল। তিনি তাহাকে পুনরায় পড়িতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। শৈলজা ভ্রাতাকে লিখিয়াছিল, "তুমি যাহাই কর, জ্যেঠামহাশয়ের আদেশ না লইয়া করিও না। তিনি যে তোমার বিদেশে

চাকরী করার প্রস্তাবে সম্মত হইবেন, এমন বোধ হয় না। তিনি তোমাকে দূরে রাখিতে চাহেন না। তাঁহার স্নেহে আমরা পিতার অভাব কখনও বুঝিতে পারি নাই। দেখিও, যেন তোমার কাযে তিনি কষ্ট না পায়েন।” রাধাচরণ সে সব কথা কাণে তুলে নাই। সে পিসীমা’কে লইয়া যাইবার সম্বন্ধে জ্যেষ্ঠতাতের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ কায করিতে পারিল না বটে; কিন্তু স্থির করিল, কর্ম্মস্থানে যাইয়া সংসার পাতাইয়াই তাঁহাকে পাঠাইয়া দিবে।

পিসীমা’র রাধাচরণের সঙ্গে যাইবার ব্যবস্থায় বামাচরণ বিরক্ত হইল। কারণ, তিনি সংসারে থাকিলে সংসারের সব ঝঞ্ঝাটই তাঁহার।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মনে হইতে লাগিল, যেন দারুণ ভূমিকম্পে তাঁহার গৃহ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, আর তাহারই মধ্যে তিনি বিপন্ন—ব্যথিত—শঙ্কাকুল হৃদয়ে আপনার প্রিয়জনদিগকে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণান্ত চেষ্টা করিতেছেন। সাফল্যের সম্ভাবনা আছে কি? এই চিন্তায় তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তাঁহার হৃদয়ে শান্তির শেষ সম্ভাবনাও তিরোহিত হইল।

তিনি অকালজলদোদয়ে ম্লান কমলের মত বিধবা দুহিতাকে লইয়া যে দিন গৃহে ফিরিয়াছিলেন, সেই দিন বুঝিয়াছিলেন,—তাঁহার শেষ জীবনে অভীপ্সিত শান্তিলাভ ঘটিবে না। তিনি যাহার আশায় আশান্বিত ছিলেন, সেই শান্তিলাভ তাঁহার ভাগ্যে নাই। তাহার পর সরোজার অবস্থা বিবেচনা করিয়া তাঁহার

হৃদয়ে অশান্তি আরও বর্দ্ধিত হইয়াছিল। দুই দুহিতার জন্য দুশ্চিন্তা দুই বিষধরের মত দংশনজ্বালায় তাঁহাকে যন্ত্রণা দিতেছিল। অদৃষ্টের এই অপ্রত্যাশিত ও অতর্কিত আঘাতে তিনি যেন অবসন্ন হইয়া পড়িতেছিলেন। কেবল দুহিতৃদ্বয়ের প্রতি—পরিজনগণের প্রতি তাঁহার কর্ত্তব্যের বিষয় চিন্তা করিয়াই তিনি বক্ষে বল বাঁধিতেন ; ভাবিতেন,—কর্ম্মেই যাহার অধিকার, সে ফলাফল কেন চিন্তা করিবে ? কর্ম্ম করাই তাহার নিয়তি ; নিয়তিনির্দ্দিষ্ট পথে তাহাকে যাইতেই হইবে।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় মনকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন—হৃদয়ে বল বাঁধিয়া সান্ত্বনালাভের প্রয়াস পাইতেন ; কিন্তু তিনি যখনই বিরজার ও সরোজার মলিন মুখ দেখিতেন, তখনই তাঁহার পিতৃহৃদয় বিষম বেদনায় চঞ্চল হইয়া উঠিত—সেই চাঞ্চল্য তাঁহার বহু আয়াসলব্ধ স্থৈর্য্য নষ্ট করিয়া দিত।

বিরজা অপত্যস্নেহাস্বাদবঞ্চিতা হিন্দুবিধবার অবলম্বন ধর্ম্মকেই জীবনের অবলম্বনরূপে গ্রহণ করিয়াছিল। সে ব্রতাদির আচরণে শরীরকে ক্লিষ্ট ও চিত্তকে জয় করিতে সচেষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু চিত্তজয় সহজসাধ্য নহে। গম্ভীরবুদ্ধি জ্ঞানবান্ পুরুষের পক্ষে যাহা কষ্টসাধ্য, কোমলপ্রবৃত্তিপরায়ণা জ্ঞানহীনা রমণীর পক্ষে তাহা কত দুঃসাধ্য তাহা সহজেই অনুমেয়। তাই নরচরিত্রাভিজ্ঞ হিন্দু শাস্ত্রকারগণ রমণীর পক্ষে স্বামীকে দেবতা করিয়া দেবতারাধনার পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন। রমণীর পক্ষে মনুর ব্যবস্থা—

নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথগ্‌যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপোষিতম্‌।
পতিং শুশ্রূয়তে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে ॥

সে কেবল পতি-দেবতায় চিত্তার্পণ করিয়া ক্রমে ঈশ্বরলাভের উপায় করা; সীমাবদ্ধ হৃদয়ে সহসা অসীমের ধারণা করা দুঃসাধ্য; তাই সসীম হইতে অসীমকে লাভ করিবার ব্যবস্থা। বিরজা স্বামীকে সম্পূর্ণরূপে পাইবার পূর্ব্বেই—তাহার মুকুলিত যৌবনের প্রেমপিপাসাতুর হৃদয়ে প্রেমতৃষ্ণার তৃপ্তির পূর্ব্বেই—স্বামীকে হারাইয়াছিল। তাই এখন সে দেবতার ধ্যান করিতে বসিলে স্বামীর দিব্যমূর্ত্তি তাহার মানসপটে ফুটিয়া উঠিত; তাহার দুই চক্ষু হইতে অবিরল অশ্রু ঝরিত। সে দেবতার চরণোদ্দেশে প্রণাম করিলে তাহার মনে হইত, সে যেন পতি-পদে প্রণতা হইত। দেবপূজা শেষ করিয়া সে যখন পতির চিত্রকে প্রণাম করিত, তখন তাহার মনে হইত, দেবতা তাহাকে সেই পরিচিত রূপে দেখা দিয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন। সে পতিদেবতায় ও ইষ্টদেবতায় মিশাইয়া ফেলিত। হায় রমণী-হৃদয়!

আর সরোজা? তাহার বিকাশোন্মুখ হৃদয় অতর্কিত বিষম আঘাতে ব্যথিত হইয়াছিল। তাহার মত দুঃখ কাহার? প্রসন্নসলিলা প্রবাহিণীর কূলে দাঁড়াইয়া যে তৃষ্ণাতুর হতভাগ্য নিম্নে তপ্ত বালুর ও উপরে দীপ্ত সূর্য্যের উত্তাপে পীড়িত হয় অথচ সলিল স্পর্শ করিতে পায় না, তাহার দুঃখের সীমা আছে কি? সে শ্বশুরের স্নেহে যে অনাবিল সুখ পাইয়াছিল, সে সুখভোগ যে তাহার অদৃষ্টে নাই, তাহা সে বুঝিয়াছে; বুঝিয়া কাঁদিয়াছে।

যতীশচন্দ্রের পিতামহীর আদরে সে মাতৃহারা কন্যা আবার যেন জননীর স্নেহ ফিরিয়া পাইয়াছিল; কিন্তু সে কতদিন সে আদর হইতে বঞ্চিতা! যে গৃহ তাহার, সে গৃহে সে আর যাইতে পায় না!

সর্ব্বোপরি স্বামীর কথা। তিনি কোন্ দোষে তাহার প্রতি এমন ব্যবহার করেন? আবার সে আপনাকে আপনি বুঝাইতে চেষ্টা করিত, তাঁহার দোষ কি? তিনি ত তাহাকে লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন! তিনি কেন সব বুঝেন নাই? যাহাকে অন্য সকলে ঘৃণা করে, সেও একেবারে গুণশূন্য নহে। তাহার সে গুণ অন্যে দেখিতে না পাইলেও তাহা তাহার প্রেমপরায়ণা পত্নীর দৃষ্টি অতিক্রম করে না। তাই যে অন্যের নিকট একান্ত ঘৃণ্য, সেও স্বীয় গৃহে পত্নীর প্রেমে স্বর্গ-সুখ লাভ করিতে পারে। সরোজার নিকট যতীশচন্দ্রের অপরাধ ক্রমে একান্ত মার্জ্জনীয় প্রতীয়মান হইতেছিল। তাহার প্রেম যাহার উদ্দেশে প্রবাহিত হইতেছিল, সে কি তাহার দোষ দেখিতে পায়? তাই সে স্বামীর দোষ দেখিত না; বরং সময় সময় আপনাকেই অপরাধী মনে করিত। কিন্তু সে কি করিবে? এখন তাহার কর্ত্তব্য কি? সে ভাবিত; ভাবিত আর কাঁদিত। তাহার মনে সুখ ছিল না; অধরে হাসি ছিল না।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সংসারে কেবল দুঃখ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

চিন্তারম্ভ।

ধরণীধর চলিয়া যাইলে যতীশ গৃহে আসিল, উদ্দেশ্য কিছু অর্থ সংগ্রহ করিবে। পূর্ব্বে সে কখনও অর্থের অভাব অনুভব করে নাই। তাহার ব্যয় অল্প ছিল—সে পিতার নিকট ও পিতামহীর নিকট হইতে আবশ্যকাতিরিক্ত অর্থ পাইত। এখন ব্যয় বাড়িয়াছে অথচ আয়ের পথ রুদ্ধ। সে যখন পিতার অবাধ্য হইয়া কলিকাতায় বাসা করিয়াছিল, তখন হইতে তাহার ব্যয় কেবল বাড়িয়াই চলিয়াছে। সে বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়াছে। একবার বাসা করিয়া সে আর 'মেসে' ফিরিয়া যাইতে পারিল না। বাসা রহিল—ব্যয়বাহুল্য চলিতে লাগিল। অমূল্যচরণ তাহার অবস্থা বুঝিতে পারিয়া তাহার ঋণ গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়া দিত—প্রাপ্ত অর্থের সম্পূর্ণ ভাগ যতীশচন্দ্রের হস্তগত হইত না। উপস্থিত প্রয়োজন—ভবিষ্যতে উপার্জ্জন করিয়া ঋণ শোধের আশা সমুজ্জ্বল; এ অবস্থায় যতীশও ঋণ করিত। ঋণের মত রক্তশোষী শত্রু আর নাই। সে কখন যে আসিয়া সুপ্ত মানবের বক্ষে বসিয়া তাহার রক্ত শোষণ করিতে আরম্ভ করে, মানুষ তাহা বুঝিতে পারে না। শেষে যখন সে জাগিয়া আপনার অবস্থা উপলব্ধি করে, তখন তাহার দেহ বলশূন্য—সে নিরুপায়। সংসারজ্ঞানহীন যুবক যখন ভবিষ্যতে উপার্জ্জনের আশায় উৎসাহিত হইয়া ঋণজালে জড়িত

হয়, তখন সে স্বপ্নেও ভাবিতে পারে না যে, হয় ত জীবনে সে আর সে জাল হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে না; এই বন্ধন তাহার ভবিষ্যৎ উন্নতির গতিরোধ করিবে, তাহার সকল আশা-বিনাশের কারণ হইবে। যতীশচন্দ্রেরও তাহাই হইয়াছিল।

আপনার প্রতিভাসম্বন্ধে তাহার ভ্রান্ত ধারণা তাহার যুবজন-সুলভ আশা আরও উদ্দীপ্ত করিয়াছিল। সে যে সহজেই প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিবে, সে বিষয়ে তাহার সন্দেহমাত্র ছিল না। আঘাতের পর আঘাতে তাহার আশার ঔজ্জ্বল্য মলিন হইতেছিল বটে, কিন্তু তখনও সে প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করিতে পারে নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ হিসাবে তাহার মত বিদ্বান্ সামান্য বেতনে কেরাণীগিরির জন্য লালায়িত। যতীশচন্দ্র তাহাদিগকে কৃপার পাত্র মনে করিত; বুঝিত না—সেও তাহাদেরই একজন।

ক্রমে সংসারে অস্বচ্ছলতা যত বাড়িতে লাগিল, যতীশচন্দ্র ততই বিপন্ন ও বিষণ্ণ হইতে লাগিল। স্বচ্ছলতার সময়—সংসারের ভাবনা ভাবিতে শিখিবার পূর্ব্বে—যখন জীবনে অস্বচ্ছলতার সম্ভাবনা কল্পনাও করা যায় না, তখন স্বাবলম্বনের প্রশংসা করা অতি সহজসাধ্য। কিন্তু স্বাবলম্বন সর্ব্বথা সুখের নহে। তাহার জন্য যে সাধনার ও সংযমের প্রয়োজন, যতীশচন্দ্র সে সাধনাপরাঙ্মুখ—সে সংযমে অনভ্যস্ত। এ অবস্থায় সে পিতাকে পত্র লিখিবার সময় স্বাবলম্বনের যে সুরম্য মূর্ত্তির কল্পনা করিয়াছিল—কার্য্যকালে

তাহা দেখিতে পাইল না। তাই সে চিন্তিত হইল—কিছু ভীতও যে না হইল, এমন নহে।

উপস্থিত প্রয়োজনের প্রাবল্যহেতু যতীশচন্দ্র গৃহে আসিয়াছিল। তাহার সে উদ্দেশ্য সহজেই সিদ্ধ হইল। তাহার অর্থাভাব জানিয়া স্নেহশীলা পিতামহী তাহাকে কিছু অর্থ দিলেন। সে অর্থে দিন কয়েক চলিবে; কিন্তু তাহার পর? যতীশচন্দ্র তাহা ভাবিল, ভাবিয়া পিতামহীকে বলিল, "তুমি একাকী এই স্থানে থাকিয়া কায নাই। কলিকাতায় বাসা রহিয়াছে; তুমি চল।" পিতামহী বলিলেন, "বুড়া বয়সে কি আর এ ভিটা ছাড়িয়া যাইতে পারি? আমি যাইলে বার ভূতে সব লুটিয়া খাইবে। বাড়ীখানিও নষ্ট হইবে। আর কলিকাতায় যাইয়া কি আমি থাকিতে পারি? তোর বয়স আমি কলিকাতায় যাই নাই। সে বার কালীঘাটে গিয়াছিলাম। কলিকাতা কি অপরিষ্কার! কি দুর্গন্ধ! এই স্থানেই গঙ্গাতীরে থাকি। তুই আর কেন কলিকাতায় থাকিস্? কেবল কষ্ট। তুই ফিরিয়া আয়। আমি বৌদিকে আনাই। তোর বাপকেও পত্র লিখি। সে কি তোর উপর রাগ করিয়া থাকিতে পারিবে? আমি পত্র লিখিলেই সে ফিরিয়া আসিবে। কি বলিস?"

পিতামহীর প্রস্তাব যে সাধু, যতীশ তাহা বুঝিল; বুঝিবার বিশেষ কারণও ছিল—তাহার যে অবস্থা, তাহাতে এ প্রস্তাব প্রলোভনীয়। কিন্তু? কিন্তু পিতার নিকট স্বাবলম্বনের অত কথা বলিয়া—আপনি আপনার ব্যয়নির্ব্বাহ করিবে বলিয়া

পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাসা করিয়া—পত্নীকে আনিতে চাহিয় আজ সে কি বলিয়া আবার ফিরিয়া আসিবে? অমূল্যচরণ তাহার সব কথা জানে; সে কি ভাবিবে? তাহার নিকট সে কি করিয় মুখ দেখাইবে? যতীশ কিছু স্থির করিতে পারিল না; বলিল "আমি আবার আসিয়া বলিব।"

পিতামহী বলিলেন, "আমি বৌদিদিকে আনিতে পাঠাই তেছি।"

যতীশ বলিল, "আমি ফিরিয়া আসি। তখন যাহা হ করিও।"

যতীশচন্দ্র চলিয়া গেল। উপস্থিত অভাবমোচনের উপযো অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে—কিছু দিন অভাবের দংশন হইতে মুক্তি পাইয়াছে। তাহাই সে যথেষ্ট লাভ মনে করিল।

কলিকাতায় আসিয়া সে আবার পরিচিত জীবনের মায়া মুগ্ধ হইল; অমূল্যচরণের অসার উপদেশে কুপথে চালিত হইতে লাগিল। পল্লীভবনে পিতামহীর সেই প্রস্তাবের কথা সে ভুলিতে লাগিল। যখন তাহা মনে পড়িত, তখন সে ভাবিত, সে ব দূর অগ্রসর হইয়াছে, তাহাতে আর তাহার ফিরিবার উপা নাই। উদ্‌ভ্রান্ত যুবক—উদ্ধত গর্ব্বে মনে করে, তাহার ফিরিব পথ রুদ্ধ; সে ভুলিয়া যায়, ফিরিবার পথ রুদ্ধ হয় না; যে প স্নেহকুসুমাবৃত—প্রেমবারিসিক্ত—শতস্মৃতিছায়াস্নিগ্ধ, সে প তাহারই প্রত্যাবর্ত্তন প্রতীক্ষায় থাকে। ফুল মলিন হয়, বা শুকাইয়া যায়, ছায়া আর থাকে না—তখনও সে পথে তাহা

গমনাধিকার থাকে। এই কথা ভুলিয়াই সে জীবনে বহু দুঃখ ভোগ করে।

সে আর সব ভুলিল; কিন্তু শ্বশুরালয় হইতে পত্নীকে আনিতে যাইয়া সে যে বিফলপ্রযত্ন হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল, সে কথা সে ভুলিতে পারিল না।

হিন্দুর সংসারে সমষ্টিই সমাজের উপাদান। হিন্দু-পরিবার অনেকের মিলনক্ষেত্র; তাই হিন্দু-পরিবারের গঠন স্বতন্ত্র, তাহার ব্যবস্থাও স্বতন্ত্র। সে পরিবারে প্রত্যেকের নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে—পুত্রবধূ অল্প বয়সে পরিবারে প্রবেশ করিয়া সেই পরিবারের আচার-ব্যবহারে অভ্যস্তা হয়—সে পরিবারের বিশেষত্বে শিক্ষিতা হয়; ক্রমে সে যখন শাশুড়ীর স্থান অধিকৃত করে, তখন সে সে সংসারের অঙ্গীভূতা। বধূ হইতে গৃহিণীতে পরিণতি এমন সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে হইয়া যায় যে, কেহ তাহা বুঝিতেও পারে না, সংসারেও কাহারও অভাব হয় না; শাশুড়ী সংসারের ভার পুত্রবধূর উপর দিয়া পৌত্রপৌত্রী লইয়া কর্ম্মক্লান্ত জীবনের সায়াহ্ন যাপন করেন—শেষে যে দিন তিনি মহাযাত্রা করেন, সে দিন সংসারের যন্ত্র-চালনে কোনই পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয় না। প্রতীচ্যে স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা এমনই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে যে, তথায় ব্যক্তিই সমাজের উপাদান। প্রত্যেকে স্বতন্ত্রভাবে সংসার পাতাইয়া বসে—সে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেই যে সংসারে সে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, সে সংসারে আর তাহার স্থান হয় না। প্রতীচ্য উপন্যাস পাঠ করিলে প্রতীচ্য সমাজের যে আদর্শ আমাদের মানস-মুকুরে

প্রতিবিম্বিত হয়, তাহাতে বোধ হয়, যেন জগতে মাতা নাই, পিতা নাই, ভ্রাতা নাই, ভগিনী নাই—আছে কেবল নায়ক আর নায়িকা। প্রতীচ্য গ্রন্থকার সেই নায়কনায়িকার প্রেমকে পুস্তকের ভিত্তি করিয়া তাহাদের সুখদুঃখ, বিরহমিলন প্রভৃতির মধ্য দিয়া বর্ণনার ধারাটিতে প্রবাহিত করিয়া লয়েন—সেই নায়কনায়িকার সংসারের—সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ পরিবারের—ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে তাঁহার বক্তব্যও সীমাবদ্ধ হয়। প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে সমাজের আদর্শ স্বতন্ত্র। একের সার্থকতা উদার আত্মত্যাগে, অপরের সার্থকতা সঙ্কীর্ণ আত্মোন্নতিতে। আমাদের দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত যুবক যখন প্রতীচ্য উপন্যাসে প্রেমের সীমাবদ্ধ ভাব দেখে, তখন সে অনেক সময় তাহাতে আকৃষ্ট হয়। যতীশচন্দ্রেরও তাহাই হইয়াছিল। যে শতাধিক উপন্যাসের কুজ্ঝটিকার মধ্য দিয়া সমাজ দর্শন করে, সে কি কখন সমাজের স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারে? সে কল্পনায় বাস্তবের স্থান পূর্ণ করিয়া ফেলে—উপন্যাসবর্ণিত চরিত্রপূর্ণ জগতে বাস করে। যতীশচন্দ্র পাশ্চাত্য উপন্যাসের আদর্শে পত্নীর কল্পনা করিয়াছিল। তাই সে সরোজার ব্রীড়াসঙ্কুচিত ব্যবহারে তৃপ্ত হইতে পারে নাই। আর তাই সরোজা তাহার সহিত না আসায় সে তাহার উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিল। সে ক্রোধ অক্ষমের ক্রোধ—তাহা নিরপরাধের উপর নিপতিত হয়। সে যে সমাজে জন্মিয়াছে, সে সমাজে যে হিন্দুকন্যার পক্ষে পিতৃগৃহে পিতার আদেশ বা অভিপ্রায়বিরুদ্ধ কার্য্য করা অসম্ভব, সে তাহা বুঝিল না। সে কেবল মনে

করিল—কেন সরোজা সব ত্যাগ করিয়া—তাহার সহিত আসিল না?

সে এ বিষয়ে অমূল্যচরণের পরামর্শ লইল। অমূল্যচরণ তাহার মনের ভাব বুঝিয়া অনুকূল পরামর্শ দিল। ফলে সে পত্নীকে আর একখানি পত্র লিখিল; তাহাতে লিখিল, যদি সরোজা পত্র পাইয়া তাহার নিকট চলিয়া না আইসে, তবে তাহার সহিত সে সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিবে।

এই পত্র পাইয়া সরোজা কাঁদিল; পত্র বিরজাকে দেখাইল; বিরজা পিতাকে পত্রের কথা বলিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "উন্মাদের প্রলাপ! তবে দেখিতেছি, সরোজার অদৃষ্টে সুখ নাই। কি জানি, চঞ্চলচিত্ত যুবক কি করিয়া বসে! কিন্তু সরোজা কি আপনি যাইবে? আর যাইবে কোথায়? শ্বশুরালয়ে হয়—আমি পাঠাইয়া দিব। কলিকাতায়—অভিভাবকহীন অবস্থায় সে কেমন করিয়া থাকিবে?" বিরজা বলিল, "যতীশ যখন তাহা বুঝিল না, তখন আর আমরা কি করিব? সে যাহা ভাল বুঝে, সরোজাকে ত তাহা করিতেই হইবে!" ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "এ বড় সমস্যা। আমি বৈবাহিক মহাশয়কে পত্র লিখি। তিনি যেরূপ ব্যবস্থা করেন—সেইরূপ হইবে।" তিনি ধরণীধরকে পত্র লিখিলেন।

ধরণীধর বৈবাহিকের পত্র পাইলেন। তিনি কি উত্তর দিবেন, ভাবিতে লাগিলেন।

সেই দিন মধ্যাহ্নে কক্ষদ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া সরোজা স্বামীর

পত্র হস্তে লইয়া বহুক্ষণ কাঁদিল ; মনে মনে বলিল, হে আমার দেবতা, হে আমার জীবনসর্ব্বস্ব—আমি কোন্ অপরাধে তোমার নিকট অপরাধী যে, তুমি আমার উপর রাগ করিয়াছ? তুমি যাহা বলিবে, আমি তাহাই করিব। কিন্তু কোন্ উপায়ে আমি তোমার কাছে যাইব? তুমি আমাকে লইয়া যাও। তোমার নিকট থাকিলেই আমি জীবন সার্থক মনে করিব। তাহার পর সে বাক্স খুলিয়া কাগজ কলম দোয়াত বাহির করিল ; মনের এই কথা পত্রে লিখিল। তাহার নয়ন হইতে অশ্রু ঝরিতেছিল। সেই অশ্রুপাতহেতু সে ভাল করিয়া দেখিতে পাইতেছিল না ;—অক্ষরগুলি বড় অসমান—ছত্রগুলি আঁকা বাঁকা হইতেছিল ; অশ্রুপাতে অক্ষরগুলি একান্তই অস্পষ্ট হইতেছিল।

সরোজা ভাবিল, এ পত্র কেমন করিয়া পাঠাইব? তিনি কি ভাবিবেন! তাহার পর যে আবেগে সে পত্র লিখিয়াছিল, সে আবেগ একটু প্রশমিত হইলে সে ভাবিল,—এ কি লিখিয়াছি? তিনি নিশ্চয়ই আমাকে একান্ত লজ্জাহীনা মনে করিবেন।

সে আরও ভাবিল, পিতার মত—শ্বশুরের অভিপ্রায়, এ সকল না জানিয়া—না বুঝিয়া সে কেমন করিয়া এরূপ পত্র লিখিবে?

ভাবনায় ভাবনা বাড়িল। সরোজা পত্রখানি ছিঁড়িয়া ফেলিল ; খণ্ড খণ্ড করিয়া কাগজের টুকরাগুলি বাতায়নের বাহিরে ফেলিয়া দিল। তাহার পর সে আবার কাঁদিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

স্বপ্ন-শেষে।

আকাশ মেঘহীন—বায়ুমণ্ডল অনাবিল—প্রকৃতি প্রসন্নাননা। পূর্ব্বগগনে দিবালোকবিকাশ শিশিরস্নাত প্রান্তরদৃশ্যে নূতন সৌন্দর্য্য সঞ্চারিত করিয়াছে। বসন্তাগমপ্রফুল্ল তরুর পত্রাগ্রে দোদুল্যমান শিশিরবিন্দু তরুণ রবিকরে হীরকের মত জ্বলিতেছে; তৃণদলে শিশিরবিন্দু—যেন দিবালোকভয়ত্রস্তা বিভাবরী চঞ্চলপদে গমনকালে ছিন্নসূত্র মুক্তাহারের মুক্তাগুলি ফেলিয়া গিয়াছে, তৃণ-পুষ্পে সঞ্চিত শিশির এখনও টলটল করিতেছে—যেন তরুণীর প্রেম এখনও অনাদরে—উপেক্ষায় শুকায় নাই। বসন্তের আরম্ভ—প্রান্তরে স্থানে স্থানে শিমূলের বিরাট বপু কোমল—মাংসল রক্তপুষ্পে ভরিয়া উঠিয়াছে—যেন হরিৎ প্রান্তরে অগ্নিশিখা ঊর্দ্ধে উঠিতেছে; আর কিছু দূরে একটি অনতিউচ্চ স্তূপের উপর কয়টি পলাশ-তরু গুচ্ছ গুচ্ছ কুসুম-শোভায় সুন্দর। চারি দিকে সৌন্দর্য্য—চারি দিকে বিহগবিরাব। প্রান্তরের পার্শ্বে নদী—নদীবক্ষে বালুকাবিস্তার—মধ্যে জলধারা। নদীর পরপারে গিরিশ্রেণী—রবিকরে পর্ব্বতাঙ্গে নানাবর্ণের বিকাশ লক্ষিত হইতেছে। একজন যুবক ও একজন যুবতী নিকটস্থ গ্রাম হইতে নদীতীরবর্ত্তী পথে আসিয়া প্রান্তরে উপনীত হইল। উভয়েই মুগ্ধনেত্রে প্রান্তরদৃশ্য দেখিল। উভয়েরই আননে হর্ষদীপ্তি—সে হর্ষ প্রেম-সহচর—জীবনে তাহার স্বাদ যে পায় না সে দুর্ভাগ্য।

দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া যুবতী শ্রান্তা হইয়াছিল। তাহার চামীকরতপ্তগৌর ললাটে স্বেদচিহ্ন লক্ষিত হইতেছিল। তাহার নিশ্বাস কিছু দ্রুত পড়িতেছিল। যুবক তাহা লক্ষ্য করিল; বলিল, "চারু, চল একটু বিশ্রাম করিবে।"

যুবতী কোন কথা কহিল না। সে এই অভিনব সৌন্দর্য্যের রাজ্যে—অভিনব জীবনে স্বামীর প্রেমে এমনই মুগ্ধ যে, তাহার যেন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। সে যুবকের সঙ্গে যাইয়া অদূরে নদীতীরস্থ একখণ্ড শিলার উপর উপবেশন করিল, তাহার পর শালখানি খুলিয়া রাখিল। পত্নীকে বসাইয়া রাধাচরণ তাহার পার্শ্বে বসিল, সাদরে পত্নীর মুখচুম্বন করিল। তাহাদের পদতলে তৃণগুলি রক্তাভ হরিদ্রা কুসুমে সজ্জিত—সম্মুখে নদীর শীর্ণ প্রবাহ প্রভাত-পবনে বীচিবিক্ষুব্ধ—পশ্চাতে প্রান্তর হইতে প্রবাহিত পবনের স্পর্শ সুখদ। রাধাচরণ ও চারুশীলা মনে করিল, এই পৃথিবীই স্বর্গ।

কর্ম্মস্থানে আসিয়া স্থির হইয়া বসিয়াই রাধাচরণ পিসীমা'কে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিয়াছে। এখন সে, আর চারুশীলা—আর কেহই নাই। তাহার মনে হইত, যেন প্রকৃতির সৌন্দর্য্য-সম্ভার কেবল তাহাদেরই দুই জনের জন্য, জীবনের—যৌবনের অমৃত-উৎস তাহাদেরই দুইজনের জন্য উৎসারিত।

সে প্রভাতে পত্নীকে লইয়া গ্রামের বাহিরে প্রান্তরে বেড়াইতে আসিত। তাহার পর অফিসের নির্দ্দিষ্ট কাষ কোনরূপে সম্পন্ন করিয়া বা অসম্পূর্ণ রাখিয়াই সে অপরাহ্নে গৃহে

আসিত। গৃহে আসিয়া সে আবার পত্নীকে লইয়া কোন দিন নদীর পরপারে—কোন দিন নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতে—কোন দিন বা গ্রামপ্রান্তস্থিত শালবনের দিকে বেড়াইতে যাইত। জীবনের যে সুধা যৌবন তাহাদের জন্য পাত্র পূর্ণ করিয়া আনিয়াছিল, তাহা তাহারা অকুণ্ঠিত ভাবে পান করিত—তবুও যেন পিপাসা মিটিত না।

আজ শিলাখণ্ডের উপর বসিয়া স্বামিস্ত্রীতে কথা হইতে লাগিল—গৃহে তাহারা এই সুখ হইতে বঞ্চিত ছিল! জীবনের যে সুখ, প্রেমের দান—যাহাতে যুবকযুবতীর স্বাভাবিক অধিকার, সমাজের ব্যবস্থায় তাহারা তাহা ভোগ করিতে পারে না—জীবন দুঃখময় করে। যে সামাজিক ব্যবস্থা মানুষকে প্রকৃতিপ্রদত্ত সুখ হইতে বঞ্চিত করে, সে ব্যবস্থায় ধিক্!

চারুশীলা মুগ্ধ হইয়া স্বামীর এই সব কথা শুনিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে কত সময় কাটিয়া গেল, কেহই তাহা বুঝিতে পারিল না; শেষে চারুশীলা স্বামীকে বলিল, "চল, বাড়ী যাই।"

রাধাচরণ ঘড়ি খুলিয়া দেখিল, বেলা প্রায় নয়টা! সে উঠিল—দণ্ডায়মানা পত্নীর অঙ্গে শালখানি সযত্নে জড়াইয়া দিল। উভয়ে গৃহাভিমুখগামী হইল। আফিসের সময় হইয়া আসিতেছে; রাধাচরণ একটু দ্রুত চলিল। কিন্তু অল্প দূর যাইয়াই সে দেখিল, পথশ্রমে অনভ্যস্তা চারুশীলা শ্রান্ত হইয়াছে—তাহার ললাটে স্বেদচিহ্ন—মুখে রক্তাভা।

তাহার মুগ্ধ নয়নে পত্নীকে যেন আরও সুন্দর দেখাইল। সে আবার পত্নীর মুখচুম্বন করিয়া তাহাকে বলিল, "তোমার শ্রান্তি বোধ হইতেছে - তাহা কি বলিতে নাই?"

সে ধীরে চলিল। তাহারা নানা কথায়—নানা গল্পে হাসিতে হাসিতে গৃহে চলিল। যখন হৃদয় আনন্দে পূর্ণ থাকে, তখন হাসির উৎস আপনি মুক্ত হয়।

অল্পক্ষণ পরেই তাহারা যে স্থানে পৌঁছিল, সেই স্থানে রাস্তা ঘুরিয়া গ্রামে প্রবেশ করিয়াছে। সেই বাঁকের নিকট পথিপার্শ্বে একটি ঝোপে গুচ্ছ গুচ্ছ নীল ফুল ফুটিয়াছিল। চারুশীলা বলিল, "কি সুন্দর ফুল!" রাধাচরণ ফুল তুলিতে হাত বাড়াইল। সে জানিত না, গাছটি কণ্টকময়। তাহার করে কয়টি কণ্টক বিদ্ধ হইয়া গেল। সে এক গুচ্ছ ফুল তুলিয়া পত্নীকে দিল। ফুলে রক্তচিহ্ন দেখিয়া চারুশীলা বলিল, "এ কি?" সে দেখিল, স্বামীর হাত হইতে রক্ত ঝরিতেছে। সে ফুল ফেলিয়া দিয়া বলিল, "আমার জন্য তোমার এই কষ্ট।" রাধাচরণ বলিল, "কষ্ট কি? এ সামান্য একটু ছড়িয়া গিয়াছে।" চারু সযত্নে স্বামীর হস্ত পরীক্ষা করিয়া দেখিল—কণ্টক বিদ্ধ হইয়া মাংসে গভীর ক্ষত হইয়াছে। সে রাধাচরণের রুমাল লইল। গ্রামে প্রবেশ করিতেই একটি কূপ। একজন কৃষক সেই কূপ হইতে জল তুলিতেছিল। চারুশীলা তাহার নিকট জল চাহিয়া লইয়া রুমাল ভিজাইয়া স্বামীর হস্তে জড়াইয়া দিল।

সে দিন রাধাচরণের আফিসে যাইতে বিলম্ব হইল। সে

চিন্তিতহৃদয়ে আফিসে গেল—কারণ, পূর্ব্বদিন সে কায অসম্পূর্ণ রাখিয়া আসিয়াছিল; ভাবিয়াছিল, পরদিন যাইয়াই সে কায শেষ করিয়া রাখিবে। কিন্তু আজ সে করতলে বেদনাহেতু কলম ধরিতে পারিতেছিল না।

আফিসে আসিয়াই রাধাচরণ শুনিল, 'সাহেব' তাহাকে ডাকিয়াছেন। সে শঙ্কিতচিত্তে 'সাহেবের' নিকট গেল। 'সাহেব' সেলামবিমুখ বাঙ্গালী কেরাণীর উপর বড় প্রসন্ন ছিলেন না; তাহাকে দেখিয়াই বলিলেন, "তুমি অত্যন্ত বিলম্বে আসিয়াছ।"

রাধাচরণ কোন উত্তর দিল না।

"তোমার আসিতে প্রায়ই বিলম্ব হয়।"

রাধাচরণ বলিল, "মধ্যে মধ্যে হয়।"

"কাল যে কায দিয়াছিলাম, তাহা শেষ হইয়াছে?"

যে অভাবের তাড়নায় লোক সময় সময় সত্য গোপন করিবার জন্য অসত্যের আশ্রয় লয়—রাধাচরণ সে অভাবপীড়িত নহে; সে অসত্যে অভ্যস্ত নহে। সে বলিল, "না।"

প্রশ্ন হইল, "কেন?"

রাধাচরণ বলিল, "গৃহে কায ছিল—আমি চলিয়া গিয়াছিলাম।"

"তোমাকে লইয়া আমার চলিবে না। আজ মাসের ২৫শে—মাসের সঙ্গে সঙ্গে তোমার কার্য্যকাল শেষ হইবে জানিও।"

রাধাচরণের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাহার ইচ্ছা

হইল, 'সাহেবের' কৃপাভিক্ষা করে ; কিন্তু সে তাহা পারিল না। রাধাচরণ যখন গৃহে ফিরিল, তখন চারুশীলা গৃহকর্ম্ম সারিয়া—ভৃত্যের সাহায্যে প্রাঙ্গণে রোপিত ফুলগাছগুলির মূলে জল দিয়া বেশপরিবর্ত্তন করিয়া স্বামীর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। রাধাচরণ হস্তমুখ প্রক্ষালিত করিয়া বারান্দায় আসিয়া বসিল। চারুশীলা জলখাবার আনিয়া দিল। তাহার আহার শেষ হইলে চারুশীলা বলিল, "আজ কোন্ দিকে বেড়াইতে যাইবে ?" রাধাচরণ বলিল, "যে দিকে হয় চল।"—দুঃসংবাদ দিয়া পত্নীর হৃদয়ে আনন্দালোক নির্ব্বাপিত করিতে তাহার মন সরিল না। দুই জনে নদীকূলে বেড়াইতে গেল। কিন্তু রাধাচরণ কেমন অন্যমনস্ক। কিছুক্ষণ পরে যখন পল্লবরাগতাম্র তপন পশ্চিমগগনে মেঘমালায় রক্তাভা বিকীর্ণ করিয়া অস্তগমনোন্মুখ হইল, তখন তাহারা শ্যামায়মান বনপথে গৃহে ফিরিল।

রাত্রিতে ভ্রমণশ্রান্ত চারুশীলা শয়ন করিয়াই গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইল। রাধাচরণের নয়নে নিদ্রা নাই। পত্নীকে সুপ্ত বুঝিয়া সে ধীরে ধীরে কক্ষের বাহিরে বারান্দায় আসিয়া বসিল। বাতাস শীতস্পর্শ—সে দিকে তাহার লক্ষ্য ছিল না। তখনও চন্দ্রোদয় হয় নাই ; কিন্তু দিগন্তের পুঞ্জীভূত মেঘমালার প্রান্তে উদীয়মান চন্দ্রের রজতকিরণ ফুটিয়া উঠিতেছিল। ক্রমে আলোকবিকাশ হইতে লাগিল। দূরে বৃক্ষগুল্ম অচ্ছান্ধকারে গাঢ় অন্ধকারস্তূপবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল ;—ক্রমে তাহারা সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতে লাগিল।

মেঘমালার মধ্য দিয়া চন্দ্রের স্নিগ্ধ মূর্ত্তি গগনে উদিত হইল। রাধাচরণ ভাবিতে লাগিল। তাহার জীবনে চারুশীলা ঐ চন্দ্রেরই মত উদিত হইয়াছে। মাসাধিক কাল যে তাহার স্নিগ্ধোজ্জ্বল প্রেমের কিরণে অসীম তৃপ্তি ও আনন্দ লাভ করিয়াছে। আজ কোথা হইতে কাল মেঘ আসিয়া তাহাকে সে তৃপ্তি—সে আনন্দ হইতে বঞ্চিত করিতে উদ্যত হইয়াছে? তাহার মনে হইল, তাহার জীবনে আনন্দ নির্ব্বাপিত ও তাহার হৃদয় হইতে সুখ নির্ব্বাসিত হইতেছে। তাহার হৃদয় বিষাদবেদনায় যেন কাণায় কাণায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। তাহার নয়নে অশ্রু ফুটিয়া উঠিল। সে তখন আর আত্মসম্বরণে অক্ষম হইয়া দ্রুতপদে কক্ষে ফিরিয়া আসিল।

শয্যায় চারুশীলা নিদ্রিত। রাধাচরণ প্রবল আবেগে—উন্মাদের মত তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া তাহার মুদ্রিত নেত্রে, অধরে, গণ্ডে, কপোলে চুম্বদান করিল। চারুশীলার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তাহার বোধ হইল, স্বামীর নয়ন হইতে অশ্রু ঝরিয়া তাহার আননে পতিত হইল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কাঁদিতেছ?"

তখন রাধাচরণ তাহাকে সব কথা বলিল।

চারুশীলা উঠিয়া বসিল। অশ্রুর উচ্ছ্বাসে তাহার কণ্ঠরোধ হইতেছিল। কিন্তু রোগে—শোকে—বেদনায় রমণীর সান্ত্বনা-দায়িনী কল্যাণী মূর্ত্তি আত্মপ্রকাশ করে। সে আপনার বেদনা গোপন করিয়া স্বামীকে বলিল, "তুমি ভাবিতেছ কেন? আবার চাকরী পাইবে।"

এ আশার কথা এতক্ষণ রাধাচরণের মনে হয় নাই। সে যেন অকূলে কূল পাইল। সে শান্ত হইল।

তাহার পর চাকরীর চেষ্টা করিয়া পশ্চাস্তে বিফলমনোরথ রাধাচরণ সস্ত্রীক কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল। তাহার প্রত্যাবর্ত্তনে ভট্টাচার্য্য মহাশয় আনন্দিত হইলেন। তাহাকে দূরে যাইতে দেওয়া তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না। বিশেষ বিদেশে চাকরী করিতে যাইয়া তাঁহার একমাত্র ভ্রাতা কিরূপে ভগ্ন-স্বাস্থ্য হইয়া ফিরিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া রাধাচরণের জন্য সর্ব্বদাই তাঁহার মনে আশঙ্কা হইত। তাই তাহার প্রত্যাবর্ত্তনে তিনি আনন্দিত হইলেন।

রাধাচরণ লজ্জায় গৃহে থাকিল না—কলিকাতায় আসিয়া চাকরীর চেষ্টা করিতে লাগিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

বজ্রাঘাত।

বৈশাখের প্রভাত। পূর্ব্ব গগনে উষার শোণিমা সঞ্চারে দিবাগম সূচিত হইতে না হইতে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গৃহে ব্যস্তভাব পরিলক্ষিত হইল। গৃহ পূর্ণ; বামাচরণ সপরিবারে গৃহে আসিয়াছে, শৈলজাকে ও পুত্রকন্যাদিগকে লইয়া শৈলজার স্বামী শ্বশুরালয়ে আসিয়াছেন, রাধাচরণও সস্ত্রীক গৃহে আসিয়াছে। নীরজার ও দেবীচরণের বিবাহ। ভট্টাচার্য্য মহাশয় কিছু দিন হইতে "হিসাব নিকাশ" করিতে ব্যস্ত হইয়াছিলেন। দুর্ভাবনায় তাঁহার মনের আশঙ্কা যত বাড়িতেছিল, তিনি আপনার কায শেষ করিবার জন্য তত ব্যাকুল হইতেছিলেন। পাঁচ দিনের ব্যবধানে তিনি কন্যার ও পুত্রের বিবাহ স্থির করিয়াছেন। তিনি জামাতৃদ্বয়কে আসিতে লিখিয়াছেন। শৈলজার স্বামী আসিয়াছেন। যতীশচন্দ্র এখনও আইসে নাই। বৈবাহিকের পত্র পাইয়া কাশী হইতে ধরণীধর নীরজাকে ও দেবীচরণকে আশীর্ব্বাদ জানাইয়াছেন; লিখিয়াছেন—তিনি আসিতে পারিলেন না বলিয়া দুঃখিত; তাঁহার অবস্থা বিবেচনা করিয়া তাঁহার বৈবাহিক অবশ্যই তাঁহার এ ত্রুটি ক্ষমা করিবেন।

দেবীচরণের বিবাহে ভট্টাচার্য্য মহাশয় আপনার মত মতই কার্য্য করিয়াছেন—কোনরূপ যৌতুক চাহেন নাই—নগদ অর্থও

লয়েন নাই। যতীশচন্দ্রের ব্যবহারে তিনি এমনই বিচলিত হইয়াছিলেন যে, সংসারজ্ঞানবিষয়ে অভিজ্ঞ পাত্রে কন্যাসমর্পণ অভিপ্রেত মনে করিয়া যে পাত্র নির্ব্বাচিত করিয়াছেন, সে চাকরী করিতেছে; পশ্চিমে বাস—পশ্চিমে চাকরী, তাই বয়স কিছু অধিক হইয়াছে—বিবাহ হয় নাই।

আজ নীরজার গাত্র-হরিদ্রা। তাই আজ প্রভাত হইতে না হইতেই ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গৃহে ব্যস্ততা পরিলক্ষিত হইতেছে।

বিরজা প্রাতঃস্নান শেষ করিয়া পূজা করিতে বসিল। এ উৎসবে যোগ দিবার অধিকার তাহার নাই। ইষ্ট দেবতাকে প্রণাম করিয়া সে ব্রজেন্দ্রের আলেখ্য পূজা করিল। আজ গৃহে এ উৎসবানন্দের মধ্যে তাহার হৃদয় অব্যক্ত যাতনায় ব্যথিত হইতেছিল। পতির চিত্রপ্রণামকালে তাহার চক্ষু হইতে কয়েক বিন্দু অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। সে ধীরে ধীরে চিত্রখানি চুম্বন করিল। দালান হইতে তারাচরণ ডাকিল, "মেজ পিসীমা!" বিরজা দ্বার খুলিল; তারাচরণ একখানি রেজষ্টারী-করা পত্র আনিয়াছিল। বিরজার বুঝিতে বিলম্ব হইল না—এ তাহার শাশুড়ীর পত্র। সে রসিদে সহি করিয়া রসিদখানি তারাচরণের হস্তে দিয়া কক্ষে প্রবেশ করিল ও বাক্স হইতে কাঁচি লইয়া খাম কাটিয়া ফেলিল। পত্রমধ্যে এক শত টাকার নোট ছিল—তাহা রাখিয়া বিরজা সাগ্রহে শাশুড়ীর পত্র পড়িতে লাগিল। শাশুড়ীর পত্র বিরজার পক্ষে একাধারে বেদনা ও সান্ত্বনার কারণ। তাঁহার পত্রের প্রতি কথায়—প্রতি জিজ্ঞাসায় সে তাহার প্রতি শাশুড়ীর

আন্তরিক অপরিম্লান মাতৃস্নেহের পরিচয় পাইত। তাঁহার সমস্ত স্নেহ যেন এখন বিরজাতেই পর্য্যবসিত হইয়াছিল। তাহার কি দুর্ভাগ্য—সে তাঁহার নিকটে থাকিয়া সে স্নেহ ভোগ করিতে পাইল না—তাঁহার সেবা করিতে পাইল না! আর সেই পত্রে যে স্নেহ আত্মপ্রকাশ করিত, সে স্নেহে সে নিষ্ফল জীবনের বিষম বেদনায় কিছু সান্ত্বনা পাইত। তাই শ্বাশুড়ীর পত্র পাইলেই বিরজা সাগ্রহে তাহা পাঠ করিত—একবার নহে, বার বার পাঠ করিত। এ পত্রেও তিনি পূর্ব্বের সকল পত্রের মত বিরজাকে কত কথা জানাইয়াছেন—কত কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—কত উপদেশ দিয়াছেন। আর তিনি তাহার ভ্রাতাভগিনীর বিবাহে যৌতুকাদির জন্য এক শত টাকা পাঠাইয়া দিয়াছেন। বিরজা দুইবার পত্রখানি পড়িল—তাহার পর পত্র ও নোট বাক্সে রাখিয়া দালানে আসিল।

দালান দিয়া যাইবার সময় বিরজা দেখিল, পার্শ্বের কক্ষে সরোজা একাকিনী বসিয়া আছে। আজ গৃহে উৎসবের সময় তাহাকে একাকিনী সেই কক্ষে দেখিয়া বিরজা সেই কক্ষে প্রবেশ করিল;—দেখিল, সে একখানি পত্র হাতে লইয়া কাঁদিতেছে।

বিরজা যাইয়া ভগিনীর নিকটে বসিল। ব্যথার ব্যথী ভগিনীকে পাইয়া সরোজার অশ্রু দ্বিগুণ ঝরিতে লাগিল। বিরজা পত্রখানি লইয়া পড়িল। পড়িয়া সে-ও কাঁদিল। দুই ভগিনীতে কিছুক্ষণ কাঁদিল। তাহার পর শান্ত হইয়া বিরজা পত্রখানি লইয়া পিতার সন্ধানে গেল। সেই পত্রে সতীশচন্দ্র সরোজাকে

লিখিয়াছিল, সে যখন তাহার কথা শুনে নাই—তখন সে আর পতির কর্ত্তব্যে বাধ্য নহে। সে পুনরায় বিবাহ স্থির করিয়াছে। সেই দিনই তাহার বিবাহ।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় রোয়াকে দাঁড়াইয়া প্রাঙ্গণে সামিয়ানা টাঙ্গাইবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন, এমন সময় বিরজা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। আজ গৃহে আনন্দোৎসব। এই উৎসবের মধ্যে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কেবল পত্নীকে ও ব্রজেন্দ্রকে মনে পড়িতেছিল। তিনি ভাবিতেছিলেন, বিরজার জননী তাঁহার অপেক্ষা কত পুণ্যবতী—তাঁহাকে কন্যার বৈধব্যদুঃখশেল বক্ষ পাতিয়া লইতে হয় নাই। সম্মুখে বিরজাকে দেখিয়া তিনি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তিনি দেখিলেন, বিরজার নয়নপল্লব অশ্রুসিক্ত। তিনি কন্যার বেদনায় আপনার বেদনা বিস্মৃত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি, মা?" বিরজা পিতাকে যতীশচন্দ্রের পত্র দিল।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় পত্র পাঠ করিলেন। তিনি রোয়াকে বসিয়া পড়িলেন—কিছুক্ষণ কোন কথা কহিতে পারিলেন না। যেন তিনি বজ্রাহত—বাহ্যজ্ঞানহত। তাঁহার মনে হইল, ইহার পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হয় নাই কেন?

দেখিতে দেখিতে গৃহে এই সংবাদ প্রচারিত হইয়া গেল—অন্ধকার গৃহ নির্ব্বাপিত দীপের ধূমে আরও অন্ধকার বোধ হইতে লাগিল।

রামাচরণ ও পার্ব্বতীচরণ পিতাকে বলিল, তাহারা কলিকাতায় চলিল। পার্ব্বতীচরণ বলিল, সে যেমন করিয়াই

হউক, যতীশচন্দ্রের বিবাহ বন্ধ করিবে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও যাইতে চাহিলেন,—বামাচরণ বলিল, "আমরা তাহাকে পাইলে না লইয়া আসিব না। আপনার যাইবার প্রয়োজন নাই। বিশেষ আপনি আজ গৃহ হইতে গাইলে গৃহে সব বিশৃঙ্খল হইবে। এ দিকেও ত সব দেখিতে হইবে!"

বামাচরণ ও পার্ব্বতীচরণ কলিকাতায় পৌঁছিয়া যতীশচন্দ্রের বাসায় গেল। যতীশচন্দ্র তথায় নাই। অমূল্যচরণ আশঙ্কা করিয়াছিল, এ বিবাহে বিঘ্ন ঘটিতে পারে। তাহার পরামর্শে যতীশচন্দ্র আপনার বাসা হইতে যাইয়া তাহার বাসায় উঠিয়াছিল।

বাসায় যতীশচন্দ্রকে না পাইয়া বামাচরণ ও পার্ব্বতীচরণ তাহার বন্ধু অমূল্যচরণের গৃহে গেল। তথায় যতীশচন্দ্রের সন্ধান চাহিলে অমূল্যচরণ তাহাদিগকে যেরূপে অপমানিত করিল—পূর্ব্বে কখনও তাহারা সেরূপ অপমান ভোগ করে নাই। বামা-চরণ ক্রুদ্ধ হইল; ভ্রাতাকে বলিল, "যথেষ্ট হইয়াছে। এখন চল।" পার্ব্বতীচরণ ভ্রাতাকে শান্ত করিল; বলিল, "আমাদের অপমানে দুঃখ কি? যদি সরোজার সর্ব্বনাশ নিবারণ করিতে পারি, তবে কোন অপমানই অপমান মনে করিব না।"

দুই ভ্রাতা অনাহারে সমস্ত দিন অমূল্যচরণের গৃহের সম্মুখে রাজপথে দাঁড়াইয়া রহিল। বৈশাখের সূর্য্য অগ্নিময় কর বর্ষণ করিয়া রাজপথ দুঃসহ তাপে তপ্ত করিয়া দিল—পথিপার্শ্বস্থিত গৃহগাত্র হইতে দারুণ উত্তাপ নির্গত হইতে লাগিল। দুই ভ্রাতা দাঁড়াইয়া রহিল।

ক্রমে বৈশাখের দীর্ঘ দিনও শেষ হইয়া আসিল; রাজপথে ছায়া পড়িল, বিরলপথিক পথে আবার পথিকের বাহুল্য লক্ষিত হইল। দুই ভ্রাতা দাঁড়াইয়া রহিল। বামাচরণ বিরক্ত হইতে লাগিল। পার্ব্বতীচরণ স্থির—ধীর।

তাহার পর গৃহদ্বারে দুইখানি গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। কয়-জন যুবক গৃহ হইতে আসিয়া একখানিতে উপবিষ্ট হইল। দুই ভ্রাতা গাড়ীর নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল।

অমূল্যচরণ গৃহদ্বারে বামাচরণের ও পার্ব্বতীচরণের অবস্থান লক্ষ্য করিয়াছিল। তাহার আদেশে গাড়ীর সহিস রুক্ষকণ্ঠে ভ্রাতৃদ্বয়কে সরিয়া যাইতে আদেশ করিল। বামাচরণের ধৈর্য্যসীমা অতিক্রান্তপ্রায় হইয়াছিল। এবার সে সীমা অতিক্রান্ত হইল। রাজপথে দাঁড়াইবার অধিকার সকলেরই আছে বলিয়া সেও রুক্ষকণ্ঠে উত্তর দিল। দুই জনে বচসা আরব্ধ হইল। পার্ব্বতীচরণ আর ভ্রাতাকে স্থির রাখিতে পারিল না।

এই বচসার সুযোগে অমূল্যচরণ যতীশচন্দ্রকে লইয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ত্বরিতপদে শকটে আরোহণ করিল। গাড়ী চলিয়া গেল, সহিস গাড়ীর পশ্চাতে উঠিল। পার্ব্বতীচরণ উন্মাদের মত শকটের পশ্চাদ্ধাবনপর হইল; কিন্তু গাড়ী ধরিতে পারিল না। সে যখন শ্রান্ত হইয়া ফিরিয়া আসিল, তখন বামাচরণ দাঁড়াইয়া আছে—তাহার মুখ বৈশাখের ঝঞ্ঝাভীষণ অপরাহ্ণের মত অন্ধকার, তাহার চক্ষুতে ক্রোধদীপ্তি।

সেই দিনই দুই ভ্রাতা কলিকাতা হইতে গৃহে ফিরিয়া গেল।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় পুত্রদিগের অবস্থা দেখিয়াই তাহাদের অসাফল্যের পরিচয় পাইলেন। পার্ব্বতীচরণ সব কথা বলিতে বলিতে কাঁদিয়া ফেলিল। বামাচরণ কোন কথা কহিল না, বিষম অপমানে তাহার হৃদয় দগ্ধ হইতেছিল।

কোনরূপে নিয়ম রক্ষা করিয়া নীরজার ও দেবীচরণের বিবাহ হইয়া গেল। মনে যখন সুখ থাকে না, তখন গৃহে উৎসবে আনন্দ আসিবে কোথা হইতে? ভট্টাচার্য্য-পরিবারে দুর্দ্দশার ঘন মেঘ ঘনীভূত হইল। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মনে হইতে লাগিল, যে বজ্র সরোজার বক্ষে পতিত হইয়াছে, সেই বজ্রেই তাঁহারও হৃদয় বিদীর্ণ হইয়াছে। বিরজার বৈধব্য বিধাতার শাস্তি—অদৃষ্টের দণ্ড। কিন্তু সরোজার দুর্দ্দশা—এ যে মানুষের স্বকৃত বিষম বেদনা! হায়, বিধাতার দণ্ড অপেক্ষা মানুষের দণ্ড কত অধিক বেদনাদায়ক!

সরোজা এ সংবাদ শুনিল। এ সংবাদ এমনই মর্ম্মভেদী যে, সে আপনার দুর্দ্দশার স্বরূপ সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিল না। সে উপলব্ধি সময়সাপেক্ষ—যত দিন যায়, তত দুর্দ্দশার বেদনা পরিস্ফুট হয়—তত বেদনার স্বরূপ সপ্রকাশ হয়।

তৃতীয় খণ্ড।

বেদন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

নির্ব্বাণ।

যতীশচন্দ্রের বিবাহের সংবাদ ধরণীধর পাইয়াছিলেন। অমূল্যচরণ ইচ্ছা করিয়া—তাঁহার হৃদয়ক্ষতে বেদনার ক্ষার নিক্ষেপ করিবার জন্য কৌশলে সে সংবাদ তাঁহাকে পাঠাইয়াছিল। কিন্তু তাহার এই কার্য্যের গুরুত্ব সে উপলব্ধি করিতে পারে নাই; উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা তাহার ছিল না। যে ধরণীধর পরলোকগতা পত্নীর স্মৃতিতে হৃদয় পূর্ণ রাখিয়া দীর্ঘ জীবন পুণ্যপথে পরিচালিত করিয়াছিলেন; যিনি অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ যেমন যত্নে অগ্নি রক্ষা করেন—তেমনই যত্নে প্রেমাগ্নি জ্বালাইয়া রাখিয়াছিলেন;—যিনি বিজনে পত্নীর ধ্যানে—নিশীথে নয়নজলে প্রেম পুষ্ট করিয়াছিলেন, তাঁহার পক্ষে পুত্রের এই ব্যবহার যে কিরূপ ক্লেশের কারণ হইবে, অমূল্যচরণের তাহা বুঝিবার ক্ষমতা ছিল না। যতীশচন্দ্রও তাহা অনুমান করিতে পারিত না।

অমূল্যচরণ কৌশলে তাঁহাকে এ সংবাদ পাঠাইয়াছিল; আর ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহাকে এ সংবাদ জানাইয়াছিলেন। এ সংবাদ ধরণীধরের পক্ষে বজ্রাঘাতের মত হইল।

ধরণীধর যে দারুণ চেষ্টায় হৃদয়ের সহিত সংগ্রামে জয়ী হইয়াছিলেন, সেই চেষ্টার ফলে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল। তিনি বিদেশে চাকরী করিবার সময় একজন ভৃত্য দীর্ঘ বিংশ

বর্ষকাল তাঁহার সেবা করিয়াছিল। সে তাঁহার সহিত শ্বাপদ-সঙ্কুল কাননে, প্লাবনভীষণ নদীকূলে, জনহীন গিরিগাত্রে বিপদেও শঙ্কা বোধ করে নাই। কত অন্ধকার নিশায় সে প্রভুর শিবির-সম্মুখে অগ্নি জ্বালিয়া জাগিয়াছে! কতবার সে প্রভুর পীড়ায় তাঁহার শুশ্রূষা করিয়াছে! সে ছায়ার মত প্রভুর অনুসরণ করিত। ধরণীধর যখন কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আসিলেন, তখন তাহাকে তাহার বাস-গ্রামে কিছু জমী কিনিবার উপযুক্ত অর্থ দিয়া তাহাকে বিদায় দিয়াছিলেন। প্রভুকে পরিত্যাগ করিয়া গার্হস্থ্য জীবনে প্রবেশ করিতে সে কাঁদিয়াছিল। তাহার মনে হইয়াছিল, যেন এত দিনে তাহার আর কোন কার্য্য নাই। সে প্রভুর সহিত যাইতে চাহিয়াছিল। ধরণীধর অনেক বুঝাইয়া তাহাকে নিরস্ত করিয়াছিলেন। যতীশচন্দ্রের ব্যবহারে তাঁহার আশঙ্কা হইয়াছিল, হয় ত তাঁহাকে কক্ষচ্যুত—লক্ষ্যহীন তারকার দশাগ্রস্ত হইতে হইবে। সে অবস্থায় তিনি আপনার অনিশ্চিত অদৃষ্টের সহিত আর কাহাকেও জড়াইতে চাহেন নাই। কিন্তু বারাণসীতে আসিয়া যখন তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল, যখন তিনি আবার অপরের সাহায্যের প্রয়োজন অনুভব করিলেন, তখন প্রথমেই সেই পুরাতন ভৃত্য হরদয়ালের কথা তাঁহার মনে পড়িল। মনে পড়িবার কারণও ছিল; সে মধ্যে মধ্যে প্রভুকে পত্র লিখিত এবং প্রতি পত্রেই তাঁহার নিকট আসিবার অনুমতি চাহিত। ধরণীধর যখন তাহাকে লিখিলেন, সে তাঁহার নিকট আসিতে পারে, তখন সে যেন স্বর্গ হস্তে পাইল। সে বারাণসীতে

আসিয়া আবার পূর্ব্ববৎ প্রভুর সংসারের সকল ভার লইল—সেই ভারবহনে সে অভ্যস্ত। ধরণীধরও আবার তাহাকে পাইয়া অনেক বিরক্তিকর ঝঞ্ঝাট হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেন। তিনি প্রভাতে ভ্রমণ হইতে ফিরিয়া আসিয়া—অপরাহ্লে কোন ধর্ম্মশিক্ষকের নিকট ধর্ম্মালোচনার পর প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখিতেন, তাঁহার আবশ্যক সকল দ্রব্যই যথাস্থানে ন্যস্ত।

এক দিন হরদয়াল তাঁহাকে দুইখানি পত্র আনিয়া দিল। সে দুইখানিতে যতীশচন্দ্রের বিবাহের সংবাদ ছিল। পত্র দুইখানি পাঠ করিতে করিতে ধরণীধরের মনে হইতে লাগিল, যেন তাঁহার শ্বাসরোধ হইয়া আসিতেছে। পত্রপাঠ শেষ হইল। তিনি কিছুক্ষণ বাহ্যজ্ঞানহতের মত বসিয়া রহিলেন—যেন অতর্কিত দারুণ আঘাতে তাঁহার বেদনানুভবশক্তিও লুপ্ত হইয়াছে। কিছুক্ষণ পরে ধরণীধর আবার পত্র দুইখানি পাঠ করিলেন। পত্রে যে কথা লিখিত ছিল, তাহা সহজে বিশ্বাস হয় না।

ধরণীধর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তাঁহার বক্ষে বিষম বেদনা অনুভূত হইল;—সে বেদনা—যাতনা যেন ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। হরদয়াল দাঁড়াইয়া ছিল। ধরণীধর তাহাকে শয্যা রচনা করিতে বলিলেন। সে ক্ষিপ্রহস্তে প্রভুর শয্যা রচনা করিয়া দিল। ধরণীধর ধীরে ধীরে যাইয়া সেই শয্যায় শয়ন করিলেন।

সে দিন ধরণীধর আর শয্যা ত্যাগ করিলেন না; কেবল

একবার উঠিয়া সন্ধ্যা আহ্নিক শেষ করিয়া আবার শয়ন করিলেন। তিনি জলস্পর্শ করিলেন না।

হরদয়াল প্রভুর এই ভাবান্তরের কারণ জানিতে পারিল না বটে; কিন্তু বুঝিল—পত্রে কোন দুঃসংবাদ আসিয়াছে। সে রাত্রিতে সে ঘুমাইল না; দেখিল, সমস্ত রাত্রি ধরণীধরের নয়ন-পল্লব নিদ্রায় মুদ্রিত হইল না। প্রভাতে ধরণীধর উঠিতে চেষ্টা করিলেন; মস্তকে অত্যন্ত যন্ত্রণা অনুভূত হইল—আর সঙ্গে সঙ্গে বক্ষে কেমন বেদনা বোধ হইতে লাগিল। হরদয়াল প্রভুর অবস্থা দেখিয়া শঙ্কিত হইল।

অনেক বাঙ্গালী কর্ম্মক্লান্ত জীবনের সায়াহ্নে বারাণসীতে আসিয়া বাস করেন। মানুষের একটা বয়স আছে, যখন সংসারই আর মানুষের সমস্ত হৃদয় জুড়িয়া থাকিতে পারে না; যখন জীবনের পর মৃত্যুর কথা মানুষের মনে পড়ে; আর সঙ্গে সঙ্গে পরপারের অনিশ্চিত কথা স্বতঃই হৃদয়ে সমুদিত হয়। তখন নাস্তিকের মনে আস্তিক্য-বুদ্ধির সঞ্চার হয়—মানুষ মনে কেমন একটা আকুলতা অনুভব করে। এ দিকে যৌবনা-পগমে শারীরিক শক্তি যত ক্ষুণ্ণ হয়, সেই অনিশ্চিতের সন্ধানকামনা ততই প্রবল হইয়া উঠে। সে সন্ধানকামনার তৃপ্তির জন্য যে ধর্ম্মালোচনার প্রয়োজন, তাহার সুবিধা বারাণসীর মত আর কোথায় আছে? আবার বারাণসী স্বাস্থ্যকর স্থান। তাই অনেক বাঙ্গালী দীর্ঘকাল অর্থোপার্জ্জন-চেষ্টায় কাটাইয়া কর্ম্মক্লান্ত জীবনের সায়াহ্নে বারাণসীতে আসিয়া বাস করেন।

এই বারাণসীবাস মহাযাত্রার—মহামুক্তির সোপান। ইহাতে মানুষ সংসারী হইয়াও সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে শিখে—সংসারের ঘাতপ্রতিঘাত হইতে দূরে আসিয়া ক্রমে সংসার ত্যাগ করিতে শিখে। এই সকল পরিণতবয়স্ক ব্যক্তি আবার স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে দল গঠিত করেন; কয়েকজন একত্র ভ্রমণ করেন—ভ্রমণান্তে এক স্থানে উপবেশন করেন—একই মঠে বা আশ্রমে ধর্ম্মালোচনা করেন। এইরূপে যাঁহাদিগের সহিত ধরণী-ধরের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে দুই জনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য—রমাপ্রসাদ ও ভবদেব। রমাপ্রসাদ কোন জিলায় উকীল সরকার ও ভবদেব সবজজ ছিলেন। উভয়েই অবসর লইয়া আসিয়া কাশীতে বাস করিতেছিলেন। পূর্ব্বদিন অপরাহ্নে ও পরদিন প্রভাতে ধরণীধরের সাক্ষাৎ না পাইয়া প্রভাতে ভ্রমণান্তে গৃহে ফিরিবার সময় উভয়ে ধরণীধরের গৃহে আসিলেন। তাঁহারা ধরণীধরকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন—একদিনে মানুষের এরূপ পরিবর্ত্তন হয়! কিন্তু কেন এরূপ হইল, তাঁহারা তাহা জানিতে পারিলেন না। কিছুক্ষণ ধরণীধরের নিকট বসিয়া চিকিৎসক ডাকাইতে পরামর্শ দিয়া উভয়ে উঠিলেন। হরদয়াল তাঁহাদের সহিত নিয়ে আসিল এবং তাঁহাদিগকে জানা-ইল, পূর্ব্বদিন দুইখানি পত্র ধরণীধরের হস্তগত হইয়াছে—আর সেই পত্র পাঠ করিয়াই তিনি শয্যাশায়ী হইয়াছেন। শুনিয়া রামপ্রসাদ ও ভবদেব এ উহাঁর মুখে চাহিলেন। ধরণীধর স্বীয় স্বভাবগুণে তাঁহাদিগের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা

ধরণীধরের জীবনের রহস্য ভেদ করিতে পারিতেন না—তাঁহার জীবনে কি রহস্য আছে, বুঝিতে পারিতেন না। তাহার পর হরদয়াল সাশ্রুনয়নে তাঁহাদিগকে বলিল, "আপনারা বাবুর চিকিৎসার ব্যবস্থা করুন।" অপরাহ্ণে পুনরায় আসিবেন বলিয়া উভয়ে প্রস্থান করিলেন—ধরণীধরের কথার আলোচনা করিতে করিতে চলিলেন।

অপরাহ্ণে তাঁহারা আবার আসিলেন। সে দিনও ধরণীধর জলস্পর্শ করেন নাই। তাঁহারা জিদ করিয়া তাঁহাকে সামান্য দুগ্ধ পান করাইলেন। কিন্তু ধরণীধর শয্যায় বসিয়া থাকিতে পারিলেন না—বিষম কষ্টবোধ করিতে লাগিলেন। ধরণীধরের অবস্থা দেখিয়া উভয়েই বিশেষ শঙ্কিত হইলেন। সমস্ত রাত্রি বিনিদ্র হরদয়াল বিনিদ্র প্রভুর সেবা করিল।

পরদিন প্রভাতে রমাপ্রসাদ ও ভবদেব একজন চিকিৎসক সঙ্গে লইয়া আসিলেন। চিকিৎসক রোগীকে পরীক্ষা করিলেন। তাঁহার মুখ অন্ধকার হইল। তিনি ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া রোগীর প্রকৃত অবস্থা বলিবার জন্য ভবদেবকে বারান্দায় ডাকিয়া লইয়া যাইতেছিলেন, এমন সময় ধরণীধর বলিলেন, "ডাক্তার বাবু, আমার অবস্থা আমি অবগত আছি। আমাকে গোপন করিবেন না। আমার মেয়াদ ফুরাইয়াছে। আর ব্যবস্থা? এখন ব্যবস্থা—'নারায়ণ ব্রহ্ম'।"

ডাক্তার অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন, "না। আমি পথ্যের ও শুশ্রূষার কথা বলিতে যাইতেছিলাম। অসুখ সামান্য কেবল, হৃদয় কিছু দুর্ব্বল।"

ধরণীধর হাসিয়া উঠিলেন।

ডাক্তার চলিয়া যাইলে ধরণীধর বন্ধুদ্বয়কে বলিলেন, "জীবনে আপনাদিগকে কষ্ট দিয়াছি, মরিয়াও একটু দিব। আমার একটি অনুরোধ আছে। আমার উইল রেজেষ্টারি করিয়া সরকারী অফিসে জমা আছে; আমার হাতবাক্সে তাহার নকল আছে। আপনারা আমার মৃত্যু-সংবাদ যথাস্থানে দিবেন। আমার দাহের ও শ্রাদ্ধের ব্যয় নির্দ্দিষ্ট করিয়াছি—আর যাহা থাকিবে, তাহা হরদয়ালকে দিয়া দিবেন। আর আমার মৃত্যু-সংবাদ—"

ধরণীধর মুহূর্ত্ত কি ভাবিলেন।

রমাপ্রসাদ বলিলেন, "আপনি কি বলিতেছেন? দুই দিনে সারিয়া উঠিবেন। এত ভয় পাইতেছেন কেন?"

ধরণীধর মৃদু হাসি হাসিলেন; বলিলেন, "জীবনে কখনও মৃত্যুকে ভয় করি নাই; আর শেষে কাশীতে আসিয়া মৃত্যুভয়! এখন মৃত্যুই ত মুক্তি।"

তাহার পর ধরণীধর বলিলেন, "আমার মৃত্যুসংবাদ আমার বৈবাহিককেও দিবেন—তাঁহার ঠিকানা আমার বাক্সে আছে।"

তিনি বন্ধুদ্বয়কে বাক্সের চাবী দিতে উদ্যত হইলেন; তাঁহারা লইলেন না। তখন তিনি সে চাবী হরদয়ালকে রাখিতে দিলেন। ভবদেব তাহাতে অনেক আপত্তি করিলেন ও ধরণীধরকে অনেক আশ্বাস দিলেন। তাহার পর অপরাহ্ণেই আসিবেন বলিয়া বন্ধুদ্বয় প্রস্থান করিলেন।

বন্ধুদ্বয়ের গমনের পরই ধরণীধর হরদয়ালকে বলিলেন, "তুই স্নান আহার করিয়া আয়।"

হরদয়াল অতি অল্পক্ষণমধ্যেই স্নানাহার সারিয়া প্রভুর নিকটে আসিল। ধরণীধর বলিলেন, "দয়াল, দুই দিন ঘরের বাহির হই নাই। বারান্দায় একটা মাদুর বিছাইয়া দে।"

ধরণীধরের বক্ষে যাতনা বর্দ্ধিত হইতেছিল।

হরদয়াল বারান্দাটা ঝাঁট দিয়া তথায় একখানি মাদুর বিছাইয়া তদোপরি একটি বালিস দিয়া প্রভুকে সংবাদ দিল। ধরণীধর ভৃত্যের স্কন্ধে ভর দিয়া অতি কষ্টে কক্ষ হইতে বারান্দায় আসিলেন। বারান্দায় একটি টবে হরদয়াল একটি তুলসীগাছ রোপণ করিয়াছিল। ধরণীধর শয়নকালে দেখিলেন, শিয়রে তুলসীতরু। তিনি হাসিয়া ভৃত্যকে বলিলেন, "দয়াল, শেষ সময় বৈষ্ণবের বড় কায করিলি।" হরদয়াল প্রভুর কথার অর্থ বুঝিতে পারিল কি না, সন্দেহ।

ধরণীধর শয়ন করিলেন। হরদয়াল প্রভুর পদসেবা করিতে লাগিল।

মুদিতনেত্রে ধরণীধর ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে ধরণীধরের যেন শ্বাসরোধ হইয়া আসিল—বক্ষে যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া তিনি উঠিয়া বসিলেন। তাহার পর যাতনাকুঞ্চিত মুখে স্নিগ্ধ প্রশান্ত ভাব ফিরিয়া আসিল—তাঁহার গতপ্রাণ দেহ শয্যায় পতিত হইল। ধরণীধরের সকল বেদনার শেষ হইল।

যে জননীকে তিনি জাগ্রত দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করিতেন, সেই জননীর শুশ্রূষায় বঞ্চিত—যে পুত্রের জন্য তিনি দীর্ঘ জীবন শ্রম করিয়াছিলেন, সেই পুত্রের ব্যবহারে মর্ম্মাহত—ধরণীধর বিশ্বেশ্বরের পুণ্যভূমিতে আশাহত জীবনের সকল বেদনা হইতে মুক্তি পাইলেন। মণিকর্ণিকার মহাশ্মশানে তাঁহার পাঞ্চভৌতিক দেহ ভস্মীভূত হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সংবাদ।

সরোজা শ্বশুরের মৃত্যু-সংবাদ পাইল। সে যখন স্বামীর পুনরায় বিবাহের সংবাদ পাইয়াছিল, তখন সে আপনার দুর্দ্দশার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে নাই। ক্রমে সে সেই দুর্দ্দশার স্বরূপ বুঝিতেছিল। এই সংবাদে তাহার সে উপলব্ধির সহায়তা হইল। সে বুঝিল, নারীজীবনে যে দুর্ভাগ্য সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ, সে সেই দুর্ভাগ্য ভোগ করিবে। তবুও যত দিন শ্বশুর ছিলেন, তত দিন শ্বশুর-গৃহে তাহার দাঁড়াইবার স্থান ছিল অধিকার ছিল, এখন সে স্থান গেল—সে অধিকার শেষ হইল। সঙ্গে সঙ্গে শ্বশুরের স্নেহসিক্ত ব্যবহার মনে পড়িল ; মনে পড়িল, তিনি পুত্রের ব্যবহারে ক্ষত-বিক্ষতহৃদয়ে যখন গৃহ হইতে দূরে—বিদেশে এই মৃত্যুর সন্ধানে গিয়াছিলেন, তখনও তিনি তাহার কথা ভুলেন নাই। তিনি তাহার গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় করিয়া তবে দেশত্যাগী হইয়াছিলেন। সে বিরজাকে বলিল, "দিদি, আমার কপালেই তাঁহার মৃত্যু হইল।" সে শ্বশুরের জন্য অনেক কাঁদিল।

যতীশচন্দ্রের কলিকাতার ঠিকানা ধরণীধরের বাক্সে ছিল না। ভবদেব ও রমাপ্রসাদ শাঁখারীর ঠিকানায় তাঁহাকে পত্র লিখিলেন। পিয়ন ধরণীধরের জননীকে পত্র দিয়া গেল। তিনি অপরাহ্নে গ্রামের ছেলেরা যখন গ্রামের নিকটস্থ বিদ্যালয় হইতে গৃহে ফিরিতেছিল, তখন তাহাদের একজনকে ডাকিয়া পত্রখানি

দিলেন; জানিলেন, পত্র কাশী হইতে আসিয়াছে। এই কথা শুনিয়া তিনি তাহাকে পত্র খুলিতে বলিলেন—বুঝি ধরণীধরের রাগ পড়িয়াছে। আহা! পড়িবারই কথা। যতীশের উপর সে কি রাগ করিয়া থাকিতে পারে? তিনি যতক্ষণ এইরূপ ভাবিতেছিলেন, বালক ততক্ষণ খাম খুলিয়া পত্র পড়িতেছিল। সে তাঁহাকে পত্র পড়িয়া শুনাইল। বৃদ্ধার আর্ত্তনাদে প্রতি-বেশিনীরা আসিলেন; সংবাদ শুনিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দান করিতে সচেষ্ট হইলেন। বালক ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে গ্রামে এ কথা রাষ্ট্র হইয়া গেল। গ্রামের "ঠাকুরদাদা" হরিনাথ প্রভৃতি পরামর্শ করিয়া পত্রখানি কলিকাতায় যতীশচন্দ্রকে পাঠাইয়া দিলেন।

যতীশচন্দ্র পিতার মৃত্যুসংবাদ পাইল। এই সংবাদ তাহার পক্ষে অতর্কিত আঘাতের মত অনুভূত হইল। সে পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিয়াছে—করিয়া তাহার ফলভোগ করিতেছিল। সে মনে করিয়াছিল, সে পিতার সহিত সকল সম্বন্ধ কাটাইয়াছে। কিন্তু আজ যখন শোকের প্রবল বাত্যা তাহার হৃদয়ে সঞ্চিত অভিমানের ও অবিমৃষ্যকারিতার মেঘ উড়াইয়া দিল, তখন তাহার বুঝিতে বিলম্ব হইল না, সে যে দুঃসাহসিকের কার্য্য করিয়াছিল, তাহাও কেবল তাঁহারই ভরসায়। আজ তাহার সমস্ত হৃদয় কেমন একটা অব্যক্ত—অজ্ঞেয় বেদনায় একান্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে আপনার কৃত কর্ম্মের কথা ভাবিতে লাগিল।

আজ যতীশচন্দ্রের মনে হইল, সে যে আশ্রয়ের আশায় এত দিন যাহা ইচ্ছা করিয়াছে ও করিতে পারিয়াছে, সহসা সে সেই আশ্রয়চ্যুত হইল। আর সঙ্গে সঙ্গে শা'নগরের ভবনে তাহার স্নেহশীলা পিতামহীর কথা তাহার মনে হইল। তিনি কেবল তাহারই জন্য পুত্রের সহিতও যাইতে সম্মতা হয়েন নাই। আজ তাঁহার কি দুর্দ্দশা! তাহার ইচ্ছা হইল, সে তখনই শা'নগরে চলিয়া যাইবে।

সে দিন মধ্যাহ্নের পরই অমূল্যচরণ তাহার গৃহে আসিল। তখন যতীশচন্দ্র শা'নগরে যাইবার উদ্যোগ করিতেছে। অমূল্যচরণ সকল কথা শুনিল—কপট বিলাপে যতীশচন্দ্রের বেদনায় সহানুভূতি প্রকাশ করিল; তাহার পর তাহার কর্ত্তব্যসম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিল। সে বুঝাইল, যাহা হইবার—হইয়া গিয়াছে। এখন তাহার পক্ষে কাশী যাওয়াই কর্ত্তব্য। কারণ, ধরণীধরের কোন নির্দ্দেশ থাকিলে তাহা অবগত হওয়া আবশ্যক। আবার তিনি সম্পত্তি প্রভৃতির সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, তাহাও কাশীতে না যাইলে জানা যাইবে না।

শোকের আবেগে এ কথাটা এতক্ষণ যতীশচন্দ্রের মনে হয় নাই। সে স্বীয় কর্ম্মদোষে যে অর্থকষ্ট ভোগ করিতেছে, এইবার সে তাহা হইতে মুক্তি পাইবে।

সে সেই দিনই কাশীযাত্রা করিল। অমূল্যচরণ সঙ্গে গেল। অমূল্যচরণ মনে মনে বড় আনন্দিত; এইবার ধরণীধরের অর্থ যতীশ পাইবে। যতীশ তাহার হস্তগত।

পরদিন যতীশচন্দ্র কাশীতে পৌঁছিল ও খোঁজ করিয়া ভবদেবের বাসায় উপস্থিত হইল। ভবদেব তাহার পরিচয় পাইয়া সাদরে তাহাকে লইয়া তাহার হবিষ্যান্নের ও অমূল্যচরণের আহারের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তাঁহার উপদেশক্রমে সে গঙ্গাস্নান করিয়া আসিয়া হবিষ্যান্ন আহার করিল। জীবনে সে এ অভিজ্ঞতা আর কখনও লাভ করে নাই।

এ দিকে ভবদেব রমাপ্রসাদকে সংবাদ দিয়াছিলেন। তিনি বন্ধুগৃহে আসিলেন। উভয়ে যতীশচন্দ্রকে লইয়া ধরণীধর যে গৃহে বাস করিতেন, সেই গৃহে চলিলেন। অমূল্যচরণ সঙ্গে গেল।

ধরণীধরের মৃত্যুর পর ভবদেব ও রমাপ্রসাদ তাঁহার শয়ন-কক্ষ চাবীবন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। যতীশচন্দ্রের আগমনপ্রতীক্ষায় তাঁহারা তাঁহার দ্রব্যাদির কোন ব্যবস্থাই করেন নাই। হরদয়াল প্রভুর সম্পত্তি আগলাইয়া সেই গৃহে বাস করিতেছিল। সে দ্বারেই বসিয়া ছিল। নগ্নপদ—বিশদবাস যতীশচন্দ্রকে দেখিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল।

তাহার পর রমাপ্রসাদ ও ভবদেব যতীশচন্দ্রকে সকল কথা বলিলেন। উইলের কথা শুনিয়া অমূল্যচরণের কেমন চাঞ্চল্য অনুভূত হইতে লাগিল। ভবদেব হরদয়ালের নিকট হইতে চাবী লইয়া হাতবাক্স খুলিলেন। ধরণীধরের উইল উপরেই ছিল।

রমাপ্রসাদ সেই উইল পাঠ করিতে লাগিলেন। উইলে যতীশচন্দ্রের নামোল্লেখও নাই! ধরণীধর লিখিয়াছেন, তিনি

তাঁহার মাতৃদেবীর ভরণপোষণের আবশুক ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহার সঞ্চিত সমস্ত অর্থে তিনি কোম্পানীর কাগজ কিনিয়াছিলেন। সে অর্থের পরিমাণ যতীশচন্দ্রের অনুমানাতিরিক্ত। সেই অর্থ তিনি স্বগ্রামের উন্নতিকর অনুষ্ঠানে দান করিয়া গিয়াছেন। গ্রামে তাঁহার পিতৃদেবের নামে একটি বিদ্যালয় ও মাতৃদেবীর নামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় সংস্থাপিত হইবে। সমস্ত অর্থ সরকারের হস্তে ন্যস্ত হইবে; সরকার হইতে তাঁহার উইলের নির্দ্দেশ মত কার্য্য করা হইবে। কাগজগুলি ব্যাঙ্কে জমা ছিল।

অমূল্যচরণ আর চাঞ্চল্য গোপন করিতে পারিল না। জিজ্ঞাসা করিল,—"পুত্রকে বঞ্চিত করিয়া কেহ এরূপ উইল করিলে সে উইল কি টিঁকে?"

ভবদেব বলিলেন, "উইলের নির্দ্দেশ বিস্ময়কর বটে; কিন্তু উইল অসিদ্ধ বলিবার কোন উপায় ত দেখিতেছি না। সমস্ত অর্থই ত দেখিতেছি, ধরণীধরের স্বোপার্জ্জিত। এ অর্থের যদৃচ্ছ ব্যবহার করিবার সম্পূর্ণ অধিকার তাঁহার ছিল।"

যতীশ কিছুই বলিল না। কিন্তু অমূল্যচরণ বলিল, "বাঙ্গালীর উইল—রথী মহারথীর উইলও ত দেখি শেষ টিঁকে না।"

ভবদেব হাসিয়া বলিলেন, "তাহা সত্য। আমরাও অনেক উইল নাড়াচাড়া করিয়াছি; কিন্তু এ উইল নাকচ করিবার কারণ ত দেখি না। ইহাতে যে একেবারেই কোনরূপ জটিলতা নাই—সবই সোজা। কি বল, দাদা?"

রমাপ্রসাদ বলিলেন, "ইহা ত একরূপ দানপত্র।"

যতীশচন্দ্র ভাবিতেছিল। তাহার মনে হইতেছিল, সে যে অবলম্বন ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল আজ সে সেই অবলম্বনচ্যুত। এইবার তাহাকে সত্য সত্য স্বাবলম্বন অবলম্বন করিতে হইবে। এতদিন সে সংসার-সংগ্রামের নামে ছেলেখেলা করিয়াছে। এইবার সে সত্য সত্য সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। তাহার হৃদয় শঙ্কাকুল। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ভাবনায় সে বিচলিত। ভবদেব যখন বলিলেন, "শ্রাদ্ধাদির ব্যয়ের জন্য নির্দ্দিষ্ট অর্থ ব্যতীত আর প্রায় দুই শত টাকা রহিয়াছে। এ টাকা ধরণী বাবু ভৃত্য হরদয়ালকে দিতে বলিয়াছেন। দিব কি?" তখন যতীশচন্দ্র কেবল মস্তকসঞ্চালনে সম্মতি জানাইল।

সেই অর্থ লইয়া গৃহে ফিরিবার সময় হরদয়ালের মনে হইল, যেন সে শূন্যহৃদয়ে শূন্য গৃহে ফিরিয়া যাইতেছে।

ধরণীধরের অবশিষ্ট দ্রব্যাদি লইয়া যতীশচন্দ্রও সেই দিনই কলিকাতায় ফিরিয়া চলিল। সে যদি আপনার দুর্ভাবনায় আপনি অভিভূত না থাকিত, তবে স্পষ্টই বুঝিতে পারিত, অমূল্যচরণের ব্যবহারে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। পূর্ব্বে অমূল্যচরণ তাহার জন্য যেরূপ ব্যস্ততা দেখাইত, এখন তাহার ব্যবহারে সে ভাবের অভাব লক্ষিত হইতে লাগিল। ধরণীধরের উইলের নির্দ্দেশ শুনিয়া এবং সেই উইল-সম্বন্ধে রমাপ্রসাদের ও ভবদেবের মত জানিয়া অমূল্যচরণ বুঝিয়াছিল, আর যতীশচন্দ্র হইতে কোন লাভের সম্ভাবনা নাই। বরং এতদিন সে যে

তাহারই আশায় অন্য আশ্রয়ের সন্ধান করে নাই, সে জন্য সে আপনার নির্ব্বুদ্ধিতায় আপনি লজ্জিত ও যতীশচন্দ্রের উপর বিরক্ত হইতেছিল।

কিন্তু যতীশচন্দ্র কপট বন্ধুর ব্যবহারের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতেছিল না; সে কেবল ভাবিতেছিল। সে ভাবনার অন্ত নাই। সে এখন কি করিবে? এতদিন পর্য্যন্ত সে কিছুমাত্র উপার্জ্জন করিতে পারে নাই—ঋণে ও পিতামহীর সাহায্যে সংসার চলিয়াছে। এখন—তাহার অবস্থা জানিলে কে তাহাকে ঋণ দিবে? পূর্ব্বের ঋণ শোধ করিবার ও সংসার চালাইবার উপায় কি? সে ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছিল না।

ক্রমে ট্রেণ কলিকাতায় পৌঁছিল। যতীশ গৃহে উপস্থিত হইলেই অমূল্যচরণ বিদায় লইয়া গৃহে চলিয়া গেল। যতীশচন্দ্র সেই দিনই শা'নগর যাত্রা করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রত্যাবৃত্ত।

গৃহে আসিয়া যতীশচন্দ্র পিতামহীর যে অবস্থা দেখিল, তাহাতে সে অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিল না। এ কয় দিন সে কাঁদিতে পারে নাই—দুশ্চিন্তায় ও আশঙ্কায় বেদনার ভার বর্দ্ধিত হইয়া কেবল অসহনীয় হইয়া উঠিতেছিল। আজ সে যখন পিতামহীর অবস্থা দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, তখন সে ভার যেন কিছু প্রশমিত হইল; সঙ্গে সঙ্গে মনে আত্মগ্লানির আবির্ভাব হইল। তাহার মনে হইতে লাগিল, পিতামহীর এই বেদনার জন্য যেন সে-ই দায়ী। আর পিতার মৃত্যু?—সে হৃদয়ে অজস্র বৃশ্চিকদংশনযাতনা অনুভব করিতে লাগিল। শোকে—দুঃখে হৃদয় কোমল না হইলে মানুষ আপনার কৃত কর্ম্মের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারে না—আপনার অপরাধ বুঝিতে পারে না। আজ শোকে দুঃখে বিপন্ন যতীশচন্দ্র বুঝিল, সে স্বাবলম্বনের নামে যে স্বেচ্ছাচার করিয়াছে, তাহার ফলে সে কেবল আপনার সর্ব্বনাশ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই; পরন্তু তাহার প্রতি স্নেহই যাঁহাদিগের জীবনের প্রবলতম বৃত্তি ছিল—যাঁহাদিগের সকল কার্য্যেরই কারণস্বরূপ ছিল, তাঁহাদিগেরও সর্ব্বনাশ করিয়াছে। তাহার মত পাপী কে?

তখন সরোজার কথাও মনে পড়িল। এত দিন সে যে মিথ্যা অভিমানে সরোজাকে অপরাধী মনে করিত, আজ সে

অভিমান আর তাহার হৃদয়ে স্থান পাইল না; তাই আজ তাহার মনে হইল, সরোজার ত কোন অপরাধই ছিল না! সে যে অসম্ভব প্রস্তাব করিয়াছিল, সরোজার পক্ষে তদনুসারে কার্য্য করা সম্ভবও ছিল না—সঙ্গতও হইত না। দোষ সরোজার নহে—তাহারই। আর সে তাহার কি সর্ব্বনাশই করিয়াছে!

আজ অমূল্যচরণের প্রভাব হইতে দূরে আসিয়া শোকার্ত্ত—ব্যথিত যতীশচন্দ্র আপনার কৃত কর্ম্মের স্বরূপ দেখিয়া বিস্মিত—স্তম্ভিত—শঙ্কিত হইল। তাহার মনে যে বেদনা—যে যাতনা—সে বেদনা কি কখন অপনীত হইবে—সে যাতনা কি কখন জুড়াইবে? যতীশচন্দ্র কেবলই ভাবিত।

এ দিকে দেখিতে দেখিতে ধরণীধরের শ্রাদ্ধের সময় আসিল। গৃহেই শুদ্ধ হইয়া যতীশচন্দ্র কলিকাতায় গেল।

কলিকাতায় সে অমূল্যচরণের ব্যবহারে পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিল। সে আসিবার পূর্ব্বে অমূল্যচরণকে পত্র লিখিয়াছিল; আশা করিয়াছিল, পূর্ব্বের মত সে তাহার বাসায় আসিয়া উপস্থিত থাকিবে। কিন্তু সে আসিয়া জানিল, অমূল্যচরণ আইসে নাই। হয় ত কোন অনিবার্য্য কারণে অমূল্যচরণ আসিতে পারে নাই—ভাবিয়া সে তাহার গৃহে গেল। অমূল্য-চরণ কয়জন বন্ধুর সহিত তাস খেলিতেছিল। তাহাকে সেই বন্ধুরা যেরূপ আগ্রহ সহকারে আহ্বান করিল, অমূল্যচরণের আহ্বানে সে আগ্রহও নাই। অমূল্যচরণের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য যতীশচন্দ্রকে বহুক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল।

তাহার বন্ধুরা সন্ধ্যার সময় উঠিলেন। যতীশচন্দ্র ফিরিবার জন্ম ব্যস্ত হইতেছিল; কিন্তু ফিরিতে পারিল না।

শেষে তাসের আড্ডা উঠিলে যতীশচন্দ্র অমূল্যচরণকে পিতামহীর কথা জানাইল; জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কি করা কর্ত্তব্য?"

অমূল্যচরণ বলিল, "আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আপনার পাওনাদাররা বড়ই পীড়াপীড়ি করিতেছে। তাহাদের তাগাদায় আমি অস্থির হইয়া উঠিতেছি। তাহাদের কি করিবেন?"

যতীশচন্দ্র এতক্ষণে অমূল্যচরণের স্বভাব বুঝিল। তাহার মনে পড়িল, গৃহীত অর্থের অর্দ্ধাংশেরও অধিক অমূল্যচরণই গ্রাস করিয়াছে। আজ সে নিষ্কাসিতরস ইক্ষুদণ্ডের দশাগ্রস্ত—তাই অমূল্যচরণ তাহাকে অবহেলায় ধূলায় ফেলিয়া দিতে ব্যস্ত। শোকের মত শিক্ষক আর নাই। সে শিক্ষায় যতীশচন্দ্র সংযম শিখিয়াছিল। সে মনের ভাব চাপিয়া বলিল, "দেখি, কি করিতে পারি।"

পরদিন যতীশচন্দ্র কলিকাতার বাসা তুলিয়া দিল। আসবাবগুলি বিক্রয় করিয়া সে ভৃত্যদিগের বেতন ও কতক খুচরা দেনা মিটাইয়া আবার শা'নগরে চলিয়া গেল। তথায় সে ভাবিয়া আপনার ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য স্থির করিবে।

যাইবার পূর্ব্বে সে একবার নূতন শ্বশুরালয়ে দেখা করিয়া গেল। সে সকল কর্ত্তব্য পালন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিল।

সে আর কাহারও নিকট কোন কথা গোপন করিবে না; সে তাহার সকল কর্ত্তব্য পালন করিবে।

গৃহে আসিয়া যতীশচন্দ্র দুশ্চিন্তার দারুণ দংশন হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিল না সত্য; কিন্তু আর এক প্রকার যন্ত্রণার কিছু উপশম অনুভব করিল। নিশাশেষে নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে সমাগত দিবসে অনিবার্য্য ব্যয়নির্ব্বাহের ভাবনা—পাওনাদারদিগের তাগাদা—অর্থসংগ্রহের উপায়নির্দ্ধারণের চিন্তা—গৃহে আসিয়া যতীশচন্দ্র সে সকল যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিল। এই মুক্তির শান্তিও সে বহুদিন ভোগ করিতে পায় নাই। ভাবনা রহিল—ভবিষ্যতের, ভাবনা রহিল—ঋণের, ভাবনা রহিল—নবপরিণীতা পত্নী কল্যাণীর। আর রহিল—আত্মগ্লানির মুমু্র্দাহ—পিতার প্রতি ব্যবহারের জন্য আত্মগ্লানি—আর সরোজার প্রতি ব্যবহারের জন্য আত্মগ্লানি। কিন্তু উপায় কি? যতীশ কেবল তাহাই ভাবিত। কেবল পিতামহীর অপরিমেয় অনাবিল স্নেহে যতীশচন্দ্রের মনোবেদনার যেন অর্দ্ধেক উপশম হইত।

এই ভাবে এক মাস কাটিতে না কাটিতে নিদাঘের নিরসতায় সরসতা সঞ্চারিত করিয়া বর্ষা দেখা দিল। পরিপূর্ণ পল্বল ভেক-কলরব-মুখরিত হইল—পতিত জমীতে ঘনশ্যামপত্র তৃণলতাগুল্ম দেখা দিল। সঙ্গে সঙ্গে জ্বরেরও আবির্ভাব হইল। এক দিন যতীশচন্দ্রের পিতামহীর শোকদুর্ব্বল দেহ জ্বরের তাড়নে কম্পিত হইল। জ্বর যায় আইসে—একেবারে যায় না। শরীর দুর্ব্বল হইতে লাগিল। অথচ তিনি কিছুতেই চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে

দিলেন না। যতীশ বিপন্ন হইয়া পড়িল। পিতামহীর শুশ্রূষার —পথ্যাদির ব্যবস্থা কি হইবে? তাহার আহারেরই বা উপায় কি? শুশ্রূষাকার্য্যে সে অনভ্যস্ত। প্রতিবেশিনীদিগের লৌকিক আত্মীয়তায় স্থায়িত্বের কোন চিহ্নই লক্ষিত হইল না। বৃদ্ধার রোগ দুই এক দিনে সারিবার নহে বুঝিয়া তাঁহারা যে যাঁহার গৃহকর্ম্ম লইয়া ব্যস্ত হইলেন। বাস্তবিক কে দশ দিন পরের করিতে পারে? সকলেরই সংসার আছে।

শেষে বৃদ্ধা বলিলেন, "আমার শরীর ক্রমেই ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। তোরও কষ্ট হইতেছে। আমি না হয়, ইচ্ছাপুরে বৌদিদিকে সংবাদ দিয়া পাঠাই। আহা—কত দিন বৌদিদিকে দেখি নাই!"

যতীশচন্দ্র দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল। সে আর কেমন করিয়া সরোজাকে আসিতে বলিবে—কেমন করিয়া তাহার নিকট মুখ দেখাইবে? সুদিনে সে তাহার সহিত যে ব্যবহার করিয়াছে, তাহা স্মরণ করিয়া এ দুর্দ্দিনে সে তাহাকে আনিতে পারিবে না। আর ভট্টাচার্য্য মহাশয় পাঠাইবেন কি?

অনেক ভাবিয়া পরদিন সে কলিকাতায় গেল এবং তাহার নূতন শ্বশুরালয়ে সকল কথা জানাইয়া স্ত্রীকে শা'নগরে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিল। তাহার শ্বশুর-শ্বাশুড়ী এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তাঁহারা দরিদ্র—দরিদ্রের দুঃখ বুঝিলেন; আরও বুঝিলেন, কন্যা কল্যাণীকে ত এই ঘরই করিতে যাইতে হইবে—বিলম্ব করিয়া ফল কি? বিশেষ এখন যদি সে যাইয়া সংসার

অধিকার করে, তবে ভবিষ্যতে তাহার সপত্নীর আসিবার সম্ভাবনাও কমিয়া যাইবে।

যতীশচন্দ্র কল্যাণীকে সঙ্গে লইয়া শা'নগরে আসিল।

কল্যাণীকে দেখিয়া ঠাকুরমা একবার সরোজার জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন। কিন্তু এও যে যতীশের পত্নী! কল্যাণীর আদর-যত্নের ত্রুটি হইল না।

কল্যাণীও কয় দিনেই সেবায়, শুশ্রূষায় ও কার্য্যপটুতায় বৃদ্ধার স্নেহশীল হৃদয় অধিকার করিল। সে দরিদ্রের ঘরে জন্মিয়াছিল, কখনও বিলাসে বা আলস্যে অভ্যস্তা হয় নাই। গৃহকর্ম্মে তাহাকে জননীর সাহায্য করিতে হইত। তাই সে গৃহকর্ম্মে নিপুণা ছিল। ভাই-ভগিনীগুলিকে লালন-পালন করিয়া ও রোগে শুশ্রূষা করিয়া সে শুশ্রূষাকার্য্যেও অভ্যস্তা হইয়া উঠিয়াছিল; তাই সে সেবায় ও শুশ্রূষায় কয় দিনেই বৃদ্ধার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিল।

গৃহ-কর্ম্মের সকল ভারই কল্যাণী লইল এবং সকল কাষও সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে লাগিল। বৃদ্ধার ভাগ্যে বিশ্রাম-সুখলাভ ঘটিল।

যতীশও কল্যাণীর সঙ্গে প্রাণপণে পিতামহীর শুশ্রূষা করিতে লাগিল। এখন যেন তাঁহার প্রতি তাহার ভালবাসা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল।

কিন্তু অক্লান্ত শুশ্রূষায় কিছুই হইল না। ঠাকুরমা'র জ্বর মধ্যে মধ্যে দেখা দিতে লাগিল। শরীর ক্রমে দুর্ব্বল হইতে লাগিল।

আর যতীশচন্দ্র ও কল্যাণী অনেক জিদ করিয়াও তাঁহাকে ঔষধ সেবন করাইতে সম্মতা করিতে পারিল না। পুত্রশোকাতুরা বৃদ্ধা মৃত্যুর আশায় যেন উৎফুল্লা হইতেছিলেন। হিন্দু-বিধবা পতিকে হারাইলেই মনে করেন, জীবনে আর কোনও আকর্ষণ নাই। তাহার পর দুর্ভাগ্যক্রমে যদি তাঁহাকে পুত্রশোক সহিতে হয়, তাহা হইলে তিনি মৃত্যুই কামনা করেন।

এই ভাবে প্রায় দুই মাস কাটিল। দ্বিতীয় মাসের শেষে বৃদ্ধা শয্যা লইলেন। সকলেই বুঝিল, তাঁহার দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে ; দীপনির্ব্বাণ কেবল সময়সাপেক্ষ।

তৃতীয় মাসের মধ্যভাগে এক দিন সকলেই বুঝিল, মৃত্যুর আর বিলম্ব নাই। "ঠাকুরদাদা" নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "আজ মধ্যাহ্নের পর পর্য্যন্ত মেয়াদ।"

বৃদ্ধার নির্ব্বন্ধাতিশয়ে তাঁহাকে গঙ্গাতীরে আনয়ন করা হইল। সেই গঙ্গার কূলেই সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাঁহার শেষ শ্বাস বাহির হইয়া গেল।

পিতামহীর শবপার্শ্বে লুটাইয়া যতীশ কাঁদিল। এমন করিয়া সে আর কখনও কাঁদে নাই। এ শোক যেন তাহার পক্ষে পিতামহীর ও পিতার মৃত্যুশোক। তাহার বেদনা কে বুঝিবে? তাহার শোকের কি সান্ত্বনা আছে?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

যাত্রা।

পিতামহীর মৃত্যুর কয় দিন পরে এক দিন মধ্যাহ্নে যতীশ পিতামহীর শ্রাদ্ধসম্বন্ধে কল্যাণীর সহিত পরামর্শ করিতেছিল। রন্ধনগৃহে কল্যাণী হবিষ্যান্ন রাঁধিতেছিল—আর যতীশ নিকটে বসিয়া ছিল। এখন সংসারে কল্যাণীই তাহার অবলম্বন। মানুষ যখন বিপদে পড়ে—যখন ভাবনার সমুদ্রে কূল পায় না- যখন বুঝিতে পারে, সে আপনার বুদ্ধিবলে বিপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে না—যখন তাহার আত্মশক্তিতে অতিরিক্ত প্রত্যয় চূর্ণ হইয়া যায়, তখন সে ব্যথার ব্যথীর পরামর্শ লইতে চাহে। তখন সে পত্নীর পরামর্শ লয় - কারণ, উভয়ের স্বার্থ সম্পূর্ণরূপে একত্র সম্বদ্ধ।

যতীশচন্দ্র কল্যাণীর সহিত কথা কহিতেছে, এমন সময় তাহাকে ডাকিতে ডাকিতে এক জন ভদ্রবেশধারী মধ্যবয়স্ক লোক একেবারে অন্দরের প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া যতীশচন্দ্র বাহিরে আসিল। তাহাকে সম্মুখে দেখিয়া আগন্তুক কর্কশভাবে বলিলেন, "মহাশয়, আমার কি ব্যবস্থা করিলেন?"

যতীশ বলিল, "আমার অবস্থা দেখিতেছেন। ঠাকুরমা'র শ্রাদ্ধটা হইয়া যাউক; তাহার পর আমি একটা ব্যবস্থা করিব।"

"আমি আপনার চাকর নহি যে. কলিকাতা হইতে কায

ফেলিয়া যাতায়াত করিব। আমার পাওনা টাকা পাইব কি না, বলিয়া দিউন। তাহা বুঝিয়া আমাকে ব্যবস্থা করিতে হইবে। টাকা লইবার সময় সকলের এক চেহারা—আর দিবার সময় আর এক চেহারা। ভাল আপদেই পড়িয়াছি!"

যতীশ যত বিনীত ভাবে কথা কহে, আগন্তুকের কণ্ঠস্বর ততই উচ্চ হয়।

যতীশ তাঁহাকে বহির্ব্বাটীতে লইয়া গেল।

কল্যাণী ভাবিতে লাগিল।

সে দিন আহারের পর যতীশচন্দ্র হর্ম্ম্যতলে কম্বলের উপর শয়ন করিয়া বিশ্রাম করিতেছিল। কল্যাণী কক্ষে প্রবেশ করিল; স্বামীর কাছে বসিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "আজ কলিকাতা হইতে যে লোকটি আসিয়াছিল, সে তোমার কাছে কত টাকা পাইবে?"

যতীশ বলিল, "দুই শত টাকা।"

"তোমার কি আরও দেনা আছে?"

"আছে।"

"মোট কত টাকা হইবে?"

"প্রায় ছয় হাজার।"

টাকার পরিমাণ শুনিয়া কল্যাণী চিন্তিত হইল,—জিজ্ঞাসা করিল, "শোধ করিবার কি করিবে?"

যতীশ বলিল, "তাই ভাবিতেছি।"

"শোধ করিবার কি কোন উপায় নাই?"

"থাকিবার মধ্যে আছে ঠাকুরমা'র সম্পত্তিটুকু।"

"দাম কত হইবে?"

"আট হাজার টাকা হইতে পারে।"

"ঐটা বেচিয়া ফেল।"

"তাহার পর কি খাইব?"

"এখনই বা কি করিবে? আগে তুমি খোলসা হও। সব শোধ করিয়া ত হাতে কিছু টাকা থাকিবে। আর তুমি কি মাসে ২০।২৫ টাকাও আনিতে পারিবে না? তাহাতেই সুখে হউক—দুঃখে হউক, আমাদের চলিয়া যাইবে। এ অপমান—এ অস্বস্তিতে কায নাই।"

"কিন্তু সম্পত্তি বেচিব বলিলেই ত বিক্রয় হয় না। এ দিকে ইহারা যে আর সময় দিতে চাহে না!"

কল্যাণী মুহূর্ত্ত কি ভাবিল, তাহার পর বলিল, "এখন কত টাকা হইলে তুমি সময় পাও?"

যতীশ বলিল, "প্রায় দুই হাজার।"

"ভাল। আমার যে গহনা আছে; তুমি কাল সেগুলি বেচিয়া ফেল—প্রায় দেড় হাজার টাকা পাইবে। আর দিদিরও ত গহনা আছে—আমি তাঁহাকে লিখিতেছি।"

যতীশচন্দ্র ঠিক বুঝিতে পারিল না—জিজ্ঞাসা করিল, "কাহাকে?"

কল্যাণী বলিল, "ইচ্ছাপুরে দিদিকে।"

"সে কি?"

"তুমি রমণীকে চিন না। তুমি যাহাই কয়, তুমি তাঁহার স্বামী। তোমার বিপদ্ শুনিলে তিনি কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিবেন না। আর আমি ঠাকুরমা'র কাছে তাঁহার কথা যাহা শুনিয়াছি, তাহাতে আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, আমি সব কথা লিখিলে তিনি তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব দিতে দ্বিধা করিবেন না।"

যতীশচন্দ্র ভাবিতে লাগিল। বাস্তবিক সে রমণীকে চিনে না। রমণীর এই কল্যাণী মূর্ত্তি সে তাহার স্বার্থসঙ্কুচিত চিত্তে বুঝি ধারণাও করিতে পারে না। রমণীর এই আত্মত্যাগ বুঝি তাহার কল্পনার অতীত। তাহার দুই চক্ষু অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া আসিল। আর সে মনে এক অপূর্ব্ব শান্তির আনন্দ অনুভব করিল। যাহার ভাগ্যে এরূপ পত্নীলাভ ঘটে, তাহার জীবন অভিশপ্ত হইতে পারে না। যাহার জ্বালা জুড়াইবার এমন স্থান আছে, তাহার কিসের দুঃখ? তাহার অবসন্ন হৃদয়ে যেন নূতন শক্তি সঞ্চারিত হইল; সে যে সংসার-সংগ্রামে আপনার পরাজয় ও পতন অনিবার্য্য বোধ করিতেছিল—তাহার মনে হইল, সেই সংসার-সংগ্রামে তাহার জয় হইবেই। সে হৃদয়ে যে শক্তি অনুভব করিল, সে শক্তি বিশ্বাসসঞ্জাত। আজ তাহার মনে হইল, রমণী সত্য সত্যই শক্তিরূপিণী; এ কথা যে না বুঝে, সে সংসার-মরুভূমিতে কেবল মৃগতৃষ্ণিকার অনুসরণ করিয়া শ্রান্ত—ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া শেষে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আর যে ইহা বুঝিতে পারে, সে জয়ী হয়—সুখী হয়।

কিন্তু যতীশ কিছুতেই কল্যাণীর অলঙ্কার লইতে চাহিল না;

বলিল, "আমার একখানি অলঙ্কার দিবার ক্ষমতা নাই, আর আমি তোমার সম্বল নষ্ট করিব? সে কিছুতেই হইবে না।"

কল্যাণী তাহাকে অনেক বুঝাইল; বলিল, "দুর্ভাবনায় তোমার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে—তোমার মনে সুখ নাই। তোমার শরীর—সুখ বড়—না আমার অলঙ্কার বড়? তুমি যদি অসুখী হও, তবে আমি বাক্সে গহনা রাখিয়া কি সুখ পাইব? গহনা ত অসময়ের জন্যই। যখন তোমার অর্থ হইবে, আমি জিদ করিয়া গহনা লইব।"

যতীশ অনেক তর্ক করিল; কিন্তু কল্যাণীর সহিত পারিয়া উঠিল না। কেবল তাহার বিশেষ অনুরোধে কল্যাণী বলিল, সে বর্ত্তমানে সরোজাকে কোন পত্র লিখিবে না।

পরদিন পত্নীর অলঙ্কার লইয়া যতীশচন্দ্র কলিকাতায় গেল ও সেগুলি বিক্রয় করিয়া কতক ঋণ শোধ করিয়া গৃহে ফিরিল।

কলিকাতায় যাইয়া যতীশ আর একটি কায করিল; সংবাদ-পত্রে কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন দেখিয়া কয় স্থানে চাকরীর জন্য দরখাস্ত পাঠাইয়া আসিল।

তাহার পর সে গ্রামের "ঠাকুরদাদা" হরিনাথকে বলিল, "দেখুন, বাবা ত সব টাকাই সৎকর্ম্মে দান করিয়া গিয়াছেন। আমার ত চাকরী না করিলে চলিবে না। কাযেই আমাকে বিদেশ যাইতে হইবে।"

হরিনাথ বলিলেন, "তাহা ত বটে।

যতীশ বলিল, "আমি চলিয়া যাইলে যে সামান্য সম্পত্তিটুকু, আছে, তাহাতে কি আর কোন আয় হইবে?"

হরনাথ বলিলেন, "মহাভারত! আপনি থাকিয়া আদায় করাই দুষ্কর; না থাকিলে কি কখনও আদায় হয়? বিশেষ আজকাল ঘোর কলি—লোক ফাঁকি দিতে পারিলে আর ছাড়ে না।"

"তাই ভাবিতেছি, সম্পত্তিটুকু বিক্রয় করিব। আপনি সাহায্য না করিলে হইবে না।"

"আমিই ত ধরণীকে সম্পত্তি কিনিয়া দিয়াছিলাম। তাহার ভাগ্যে নাই—ভোগে লাগিল না। আমি চেষ্টা করিতেছি, অবশ্যই বিক্রয় হইবে। গ্রামের সম্পত্তি; অনেকেই লইতে চাহিবে।"

বাস্তবিক হরিনাথের চেষ্টায় কয় দিনেই সম্পত্তির গ্রাহক জুটিল। পিতামহীর শ্রাদ্ধ সমাধা করিয়া যথারীতি অধিকারী হইয়া যতীশচন্দ্র সম্পত্তি বিক্রয় করিল ও সেই বিক্রয়লব্ধ অর্থে আপনার সঞ্চিত ঋণ মিটাইয়া দিল। দুঃখের মধ্যে সে যে সুখ পাইল, তাহা অনির্ব্বচনীয়।

এ দিকে সে যে কয়খানি দরখাস্ত করিয়াছিল, তাহার মধ্যে একখানির উত্তর আসিল। দানাপুরে মাসিক ৩০৲ টাকা বেতনে তাহার চাকরী জুটিল।

নূতন স্থান; তাই যতীশচন্দ্র প্রস্তাব করিল, প্রথমে সে একাই যাইবে, পরে কল্যাণীকে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিবে।

তত দিন কল্যাণী পিত্রালয়ে থাকিবে। কিন্তু কল্যাণী সে প্রস্তাবে সম্মতা হইল না। কারণ, সে পিত্রালয়ে আপনাদের দারিদ্র্য-দুঃখ জানাইতে ইচ্ছুক ছিল না; আর ঘটনাপরম্পরায় যতীশচন্দ্র যেরূপ চঞ্চল হইয়াছিল, তাহাতে যতীশচন্দ্রকে একাকী বিদেশে যাইতে দিতে তাহার মন সরিতেছিল না। সে বলিল, "তুমি সঙ্গে থাকিবে, ভয় কি? আমি তোমার সঙ্গে যাইব।" যতীশ আর তাহার কথায় আপত্তি করিল না। সেও ভাবিল, কল্যাণীকে রাখিয়া যাওয়া অপেক্ষা তাহাকে লইয়া যাওয়াই ভাল।

তখন যাত্রার আয়োজন হইল। গৃহের কতক জিনিস বিক্রয় করিয়া, কতক জিনিস আত্মীয়গৃহে রাখিয়া এক দিন যতীশচন্দ্র পত্নীকে লইয়া গৃহের বাহিরে আসিল। গৃহে তালা পড়িল।

অদৃষ্ট-চক্রের এক আবর্ত্তন উদ্ভ্রান্ত যতীশচন্দ্রকে ফিরাইয়া গৃহে আনিয়াছিল; আর এক আবর্ত্তন আজ তাহাকে গৃহত্যাগী করিল। অন্য সময় হইলে এই বিদায়ে তাহার হৃদয় বিষম ব্যথিত হইত। কিন্তু আজ সে কল্যাণীর জন্য নূতন আশায়—নূতন উদ্যমে নূতন জীবনে প্রবেশ করিতেছিল; আজ তাহার নিকট সংসার নূতন শ্রীতে সমুদ্ভাসিত; আজ তাহার হৃদয়ে অননুভূতপূর্ব্ব শান্তি—তাই এই বিদায় আজ তাহার পক্ষে তেমন ক্লেশের কারণ হইল না। বিশেষ তাহার জীবনে কল্যাণরূপিণী পত্নী আজ তাহার সঙ্গে। তাই সে বিদায়কালে বেদনায় অভিভূত হইল না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

অনুভূতি।

দেখিতে দেখিতে এক বৎসর কাটিয়া গেল। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পরিবারে নানারূপ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সংসারে ভাঙ্গন ধরিয়াছিল। নদীর পাহাড়ে ভাঙ্গন ধরিলে যেমন ধ্বংসনিবারণ অসম্ভব—সংসারে ভাঙ্গন ধরিলেও তেমনই ধ্বংসনিবারণ অসম্ভব। ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহা বুঝিলেন। দুর্ভাবনায় তাঁহার দেহও ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। তিনি অনেক ভাবিয়া শেষে যাহা রক্ষা করা সম্ভব তাহাই রক্ষা করিতে সচেষ্ট হইলেন। দেবীচরণ এফ, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। সে সংবাদ প্রকাশিত হইলে ভট্টাচার্য্য মহাশয় এক দিন দেবীচরণকে ডাকিয়া তাহাকে সংসারের অবস্থা বুঝাইয়া দিলেন। দেবীচরণ পিতার কথা শুনিল। তাহার পর ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "আমি মরিলেই সংসার ভাঙ্গিয়া যাইবে। আর আমারও দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে। তোমার বড়দাদা যে তোমাদের সঙ্গে একত্র বাস করিবেন না, তাহা আমি বুঝিয়াছি। রাধাচরণও গৃহে থাকিবে না। রহিল এক পার্ব্বতীচরণ। আমাদের যে সমস্ত শিষ্য আছেন, তাঁহাদের দেখিতেই পার্ব্বতী-চরণের সময় কাটিয়া যাইবে। গৃহে কে থাকিবে? অথচ না দেখিলে গৃহেও যে সামান্য সম্পত্তি আছে, তাহার কিছুই থাকিবে না। শুধু তাহাই নহে। গৃহে একজন না থাকিলে

অদৃষ্ট-চ

চলিবে না। গৃহে তোমার কাকিমা উন্মাদিনী, এক ভগিনী বিধবা, আর একজন—।" বলিতে বলিতে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতে লাগিল। তাঁহার নয়নে অশ্রু উথলিয়া উঠিল।

তাহার পর ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "ইহাদের জন্যই আমার ভাবনা। ভগবান আমাকে যে দুঃখ দিয়াছেন. আমি আপনি সব সহ্য করিয়াছি। কিন্তু আমার মৃত্যুর পর কে এই সংসারের ভার বহিবে; কে ইহাদের ভাবনা ভাবিবে? সেই ভাবনাতেই আমি অস্থির হইয়াছি।"

দেবীচরণ বলিল, "আপনি আমাকে যে আদেশ করিবেন, আমি তাহাই করিব।"

"তোমাদের অন্নকষ্ট নাই। যদি বুঝিয়া চলিতে পার, দুই পুরুষ অন্নকষ্ট ভোগ করিবে না। তোমাদের অন্ন-বস্ত্রের ব্যবস্থা আমি একরূপ করিয়া যাইব। কিন্তু সংসারের কি হইবে? দিন কাল যেরূপ পড়িয়াছে, তাহাতে বি, এ, এম্. এ, পাশ করিলেই উপার্জ্জনের পথ মুক্ত হয় না। আমার ইচ্ছা, তুমি গৃহে আসিয়া বাস কর।"

"আপনি অনুমতি করিলে আমি তাহাই করিব।"

"আমার শরীর আর বহিতেছে না। এখন পার্ব্বতীচরণই যজমান রাখুক। আমি তাহাকে সে কায শিখাইয়াছি। তুমি সংসারের ভার বহিতে শিখ। যে কয়দিন বাঁচিয়া থাকি, তোমাকে সে কায শিখাইব। সব কাযই শিক্ষাসাপেক্ষ। তবে

যত দিন আমি আছি, তত দিন তুমি অন্য কাযও করিতে পারিবে। গ্রামের বিদ্যালয়ে ইংরাজী শিক্ষকের পদ শূন্য হইয়াছে। তুমি এখন সে কায করিতে পার।"

দেবীচরণ আর কোন কথা বলিল না।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের চেষ্টায় দেবীচরণ গ্রামের বিদ্যালয়ে শিক্ষকের কার্য্য পাইল।

এ ব্যবস্থায় বামাচরণ বিশেষ বিরক্তি প্রকাশ করিল। সে তাহার পত্নীকে বলিল, "দেখিতেছি বুড়া হইয়া বাবার বুদ্ধিনাশ হইয়াছে! ছেলেদের লিখাপড়া শিখাইবার জন্য তাঁহার যত্নের অবধি ছিল না; আর তিনি অনায়াসে দেবীকে বাড়ীতে বসাইয়া রাখিলেন!"

বড় বধূ বলিলেন, "আমার গতজন্মের পুণ্য ছিল, তাই তুমি তারাকে কলিকাতায় আনিয়াছিলে। মেজ বৌ তখন কত কথা বলিয়াছিল। আমিও বলিয়াছিলাম,—আখেরে কি হইবে? আমি অন্যায় সহ্য করিতে পারি না।"

বামাচরণ বলিল, "বাবা কি ভাবিতেছেন? পার্ব্বতীকে যজমানের কাযে রাখিয়াছেন; তাহাই যথেষ্ট। আবার দেবীর 'পরকাল' নষ্ট করা কেন?"

বড় বধূ অধর উল্টাইয়া বলিলেন, "কি জানি!"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় যে আখেরের ভাবনা ভাবিয়াই এ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, বামাচরণ তাহা বুঝিতে পারিল না। বড় বধূ স্বামীর মতে মত দিলেন। তাঁহাকে ইচ্ছাপুরে না

যাইতে হইলেই তিনি তুষ্ট। তিনি কাহারও খেঁস সহিতে পারেন না।

বামাচরণ দেবীচরণকে বলিল, "তুমি বড় হইয়াছ, আপনার হিতাহিত বুঝিতে পার। এখন লিখাপড়া ছাড়িয়া দেওয়া কি ভাল বিবেচনা কর? গ্রামের বিদ্যালয়ে চাকরীতে উন্নতির কোনও আশাই নাই। ভিটা কামড়াইয়া পড়িয়া থাকিবার জন্য কি ভবিষ্যৎ উন্নতির সব আশা পরিত্যাগ করিবে?"

দেবীচরণ বলিল, "বাবার ইচ্ছা, আমি বাড়ী যাই। কাযেই আমি বাড়ী যাইব। যদি কপালে না থাকে, কিছুতেই উন্নতি হইবে না। ব্রাহ্মণের ছেলে,—আশার গণ্ডী না বাড়াইয়া অল্পেই তুষ্ট থাকিব। বাবা যাহা বলিতেছেন, তাহা ত করিতেই হইবে।"

বড় বধূ বলিলেন, "ঠাকুরপো, বিবাহটি করিয়াছ; দুই দিন পরে ছেলে হইবে। খরচ ত দিন দিনই বাড়িবে। ঘরে কতই আছে?"

দেবীচরণ হাসিয়া বলিল, "বড় বৌদিদি, বাবা ত ঐ যাহা কিছু আছে তাহা হইতেই আমাদের চার ভাইকে 'মানুষ' করিয়াছেন; চার ভগিনীর বিবাহও দিয়াছেন। কপালে যাহা থাকে হইবে। আমরা কেবল মন বুঝে না বলিয়া ব্যস্ত হই।"

দেবীচরণ চলিয়া যাইলে বামাচরণ পত্নীকে বলিল, "আজ-কালের ছেলেগুলা বড়ই 'ডেঁপো'; কথা কহে, যেন শাস্ত্র আওড়াইতেছে। কত বিজ্ঞ! সংসারের চাপ ঘাড়ে চাপুক, তখন

বুঝিবেন—কত ধানে কত চাউল। তখন বুঝিবেন, অদৃষ্টের মুখ চাহিয়া বসিয়া থাকিলে চলে না। তখন বুঝিবেন, দাদার কথা আপাততঃ তিক্ত হইলেও পরে মিষ্ট।"

বড় বধূ স্বামীকে বলিলেন, "তোমার যেমন 'ভাই-অন্ত' প্রাণ; উহাদের ভাবনা ভাবিয়া দেহপাত কর! উহারা অন্যরূপ ভাবে।"

বামাচরণ অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে বলিল, "আমার কায আমি করি; কেহ শুনুন আর না-ই শুনুন আমার তাহাতে কিছু ইষ্টানিষ্ট নাই।"

বড় বধূ বলিলেন, "তাহা ত বটেই।"

বামাচরণ ভাবিল, তাহার পত্নী সত্য সত্যই তাহাকে স্বার্থত্যাগী মনে করে। বড় বধূ মনে মনে হাসিলেন, তিনি স্বামীকে বিশ্বাস করাইয়াছেন, তিনি তাঁহার প্রকৃতির স্বরূপ জানেন না।

দেবীচরণ গৃহে আসিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহাকে সংসারের কায শিখাইতে লাগিলেন। যজমানগৃহে তাঁহার গতায়াত ক্রমেই কমিয়া আসিতে লাগিল। এসকল ব্যবস্থার কারণ বিরজা বুঝিল। দুঃখের মত শিক্ষক আর নাই। তাহারই শিক্ষকতায় বিরজা সংসার চিনিয়াছিল; সে আশা অপেক্ষা আশঙ্কাই অগ্রে দেখিত। সে দেখিতেছিল, জরায় ও দুর্ভাবনায় পিতার স্বাস্থ্য নষ্ট হইতেছিল। সে বুঝিতেছিল, পিতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সংসার ভাঙ্গিয়া যাইবে। সে শঙ্কিত

ও চিন্তিত হইতেছিল। সে আশঙ্কা তাহার আপনার জন্য নহে; সে ভাবনা অপরের জন্য। সে জানিত, পিতৃবক্ষচ্যুত হইলেও তাহার আর এক আশ্রয় আছে। সে আশ্রয়ও স্নেহস্নিগ্ধ। পিতৃবক্ষে থাকিয়াও তাহার মন মধ্যে মধ্যে শ্বাশুড়ীর জন্য ব্যাকুল হইত। জীবনের সায়াহ্নে তিনি নিঃসঙ্গ প্রবাসে রহিয়াছেন। সে কেন তাঁহার নিকট থাকে না? বিশেষ বারাণসীবাস—সে-ই ত তাহার পক্ষে স্পৃহনীয়। সে ভাবিত, পিতার সংসারের জন্য; সে কাঁদিত সরোজার জন্য। সে বুঝিত, পিতার অবর্ত্ত-মানে সে সরোজাকে ছাড়িয়া কোথাও যাইতে পারিবে না—মাতৃহীনা ভগিনীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার যে তাহার। মানুষের হৃদয় একটা অবলম্বন নহিলে থাকিতে পারে না—সে একটা কিছু আঁকড়িয়া ধরিয়া হৃদয়ের শূন্যভাব দূর করিতে চাহে। প্রেম ও স্নেহ রমণীর পক্ষে একান্তই স্বাভাবিক। পতিপ্রেম-বঞ্চিতা—অপত্যস্নেহ-স্বাদ-সুখহীনা বিরজার হৃদয় দুঃখিনী ভগিনীকেই জড়াইয়া ধরিয়াছিল। সে ভগিনীর ভালবাসা ও জননীর স্নেহ—সবই সরোজাকে দিয়াছিল। আর সে যতই তাহার বিপদের সম্ভাবনা দেখিতেছিল, তাহার হৃদয় যেন ততই তাহাকে সাগ্রহে নিবিড় স্নেহবন্ধনে বদ্ধ করিয়া সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিতে প্রয়াস পাইতেছিল। কত নিশায় সে বিনিদ্র হইয়া সুপ্তা ভগিনীর মুখে চাহিয়া কাঁদিয়াছে; কিন্তু পাছে সে জানিতে পারে এই আশঙ্কায়, তাহার নিদ্রাভঙ্গের পূর্ব্বলক্ষণ দেখিলেই নয়ন মুছিয়াছে—সে জাগিলেই তাহার

সহিত হাসিয়া কথা কহিয়াছে! কিন্তু ভগিনীর জন্য দুশ্চিন্তা তাহার হৃদয়ে ভারের মত চাপিয়া ছিল।

বিরজা ভগিনীকে কিছু বলিত না বটে; কিন্তু সরোজাও যে কিছু কিছু বুঝিত না, এমন নহে। যে অনুভূতি সময়সাপেক্ষ তাহার হৃদয়ে ক্রমে ক্রমে সেই অনুভূতি হইতেছিল। সে-ও আপনার ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবিতেছিল। তাহারও মুখে চিন্তার ছায়া।

সরোজা ভাবিত কাঁদিত; কিন্তু কিছুতেই যতীশচন্দ্রকে অপরাধী মনে করিতে পারিত না। বরং কেহ যতীশচন্দ্রের নিন্দা করিলে—তাহার প্রতি ঘৃণাসূচক বাক্য প্রয়োগ করিলে তাহার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিত। কিশোরীর অনাবিল প্রেম ধর্ম্মের নামান্তর মাত্র। হৃদয়ে স্বার্থপরতা স্থায়ী স্থানলাভ করিবার পূর্ব্বে—প্রেমের পার্থিবভাবের অনুভূতিলাভের পূর্ব্বে—প্রেমে কামনাসঞ্চারের পূর্ব্বে কিশোরীর প্রেম ধর্ম্ম ব্যতীত আর কিছুই নহে। কবির ও সাধকের ভাব ব্যতীত তাহার স্বরূপ উপলব্ধি করা সম্ভব নহে। এই প্রেম বাস্তবের মধ্যে মানব হৃদয়ে ঈপ্সিত আদর্শের আভাস দান করে। এ প্রেম প্রবঞ্চিত করা মহাপাপ। ইহার ক্রমবিকাশ-সন্দর্শন হৃদয়ে স্বর্গীয় আনন্দ প্রদান করে। যখন আমাদের কণ্ঠে কৈশোরের কুসুমহার কালবশে শুকাইয়া যায়—তখনও কৈশোরের প্রেমস্মৃতি সমুজ্জ্বল রাখিতে পারিলে আমরা ধন্য হই। তাই সরোজা স্বামীর দোষ দেখিতে পাইত না। উপাসিকা কি কখনও দেবতার ত্রুটি কল্পনা করিতে পারে?

সে কল্পনাই যে দেবতার দেবত্ব-বিশ্বাসের বিরোধী! যতীশচন্দ্র তাহাকে ত্যাগ করিয়াছে, সে আবার বিবাহ করিয়াছে—কিন্তু সরোজা তাহার দোষ দেখিতে পাইত না। লোক কেন যতীশ-চন্দ্রের নিন্দা করে—সে বুঝিতে পারিত না। সে ভাবিত, তিনি যদি আর একজনকে বিবাহ করিয়া থাকেন—আমার উপর বিরক্ত হইয়া থাকেন—তাহাতেই বা তাঁহার দোষ কি? তাহার নিকট যতীশচন্দ্র দেবতা! যতীশ যে কারণেই হউক তাহার সংবাদ লইতে কুণ্ঠিত হইত। কিন্তু তাহার সংবাদ না পাইলে সরোজা স্থির থাকিতে পারিত না। সেই জন্য বিরজার উপদেশে দেবীচরণ যতীশের সংবাদ লইত। দেবীচরণ, বিরজা ও সরোজা ব্যতীত গৃহে আর কেহ সে কথা জানিতেন না।

দেবীচরণের সহিত যতীশের এই পত্রব্যবহারে দুই পরিবারের মধ্যে—এবং পরোক্ষভাবে পতিপত্নীর মধ্যে যোগসূত্র ছিন্ন হইতে পায় নাই তাই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও পতিপত্নীর হৃদয়ের যোগ বিনষ্ট হয় নাই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

শেষ।

আশ্বিনের শেষে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের শরীর অসুস্থ হইল। তিনি সেদিকে মন দিলেন না; শরীর ক্রমেই দুর্ব্বল হইতে লাগিল। পার্ব্বতীচরণ তাহা লক্ষ্য করিল; স্বয়ং কিছু বলিতে সাহস করিল না, কিন্তু বিরজাকে সে কথা বলিল। বিরজাও পিতার দৌর্ব্বল্য লক্ষ্য করিতেছিল। আলস্য কাহাকে বলে তিনি তাহা জানিতেন না; কিন্তু এখন তাঁহার দেহে জড়তার চিহ্ন সপ্রকাশ! আর নিত্য বাগানে যাওয়া ঘটে না—ঘরে আর রোয়াকেই সময় কাটে। বিরজা পিতাকে বলিল, "বাবা আপনার শরীর খারাপ হইয়াছে। ডাক্তার দেখাইতে হইবে।" ভট্টাচার্য্য মহাশয় হাসিয়া বলিলেন, "আমার ত কোন অসুখ নাই।" বিরজা বলিল, "আপনি দুর্ব্বল হইতেছেন।" ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "চিরকালই কি দেহে সমান বল থাকে? তোর বাবার কি বয়স বাড়ে না।" বিরজা বলিল, "কিন্তু তাই বলিয়া কোন অসুখ না হইলে দুই চারি মাসে মানুষ এত দুর্ব্বল হয় না।" ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "দেখ্, বিরজা, এ সংসারে আমাদের কেহই মৌরশীপাট্টা লইয়া আইসে না; সকলেরই মেয়াদী বন্দোবস্ত; মেয়াদ ফুরাইলে কাহারও থাকি-উপায় নাই।" বিরজা তবুও জিদ্ করিল—ডাক্তার দেখাইতে হইবে। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "বিরজা, আমার উপর

দিয়া শোকের—দুঃখের অনেক আঘাত গিয়াছে। বুড়া মানুষের পাকা হাড়, তাই এত দিন টিঁকিয়া ছিল। কিন্তু আর কত দিন টিঁকিবে? যখন তোর কাকীমা'র কথা, তোর কথা, আর সরোজার কথা ভাবি, তখন এক একবার মনে হয়, এ জীর্ণ দেহ-তরী যদি আরও কিছু দিন থাকে, তবে হয় ত ভাল হয়। কিন্তু সে কেবল মায়া। সংসারে যে যাহার অদৃষ্ট লইয়া আইসে। আমরা কেবল মোহে মত্ত হইয়া মনে করি, আমরা অদৃষ্টের কায নিয়ন্ত্রিত করিতে পারি। যাহারা ভাবে, সব গুছাইয়া রাখিয়া —কায সারিয়া তবে পার-ঘাটে উপস্থিত যাইবে, তাহাদের গুছান শেষ হয় না—কায থাকিয়াই যায়। যখন পারে যাইবার ডাক পড়ে তখন সব ফেলিয়াই যাইতে হয়। আমার ডাক পড়িয়াছে। এবার যাইতে হইবে। কাহারও বাবা চিরস্থায়ী হয় না।"

বিরজা তবুও জিদ্ করিতে লাগিল। স্নেহশীল পিতা শেষে বলিলেন, "তোর তৃপ্তি হয়, ডাক্তার দেখাইব। কিন্তু জানিস্ 'ঘটিলে অসাধ্য ব্যাধি, বৈদ্যে নাহি পায় বিধি।' এই সেই অসাধ্য ব্যাধি।"

রাধাচরণ বামাচরণের কথায় তাহার ব্যবসায়ে যোগ দিয়া-ছিল। বামাচরণ তাহাকে হস্তগত করিবার চেষ্টায় ছিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহাকে একবার বাটীতে আসিতে পত্র লিখিলেন।

রাধাচরণ গৃহে আসিল। সন্ধ্যার পর রাধাচরণকে ডাকিয়া

াইত; কিন্তু শ্বাশুড়ীর অনুমতির অভাবে তাহাকে দেখিতে াসিতে পারিত না।

নীরজা যে সরোজার ভগিনী, কল্যাণী তাহা জানিত; কিন্তু নীরজা তাহার পরিচয় জানিত না। কল্যাণী নীরজাকে দেখিয়া ভাবিত, সরোজা কেমন? অমনই কি ভগিনীর মত গৌরবর্ণা— রূপবতী? অমনই কি শান্তস্বভাব? সে এক দিন যতীশকে জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি কি দেখিতে তাঁহার ভগিনীর মত?" যতীশ তাহার এ প্রশ্নে বিস্মিত হইল; বলিল, "আমি যখন নীরজাকে দেখিয়াছিলাম, তখন সে বালিকা। কিন্তু তখনও দুই ভগিনীতে যেন অনেক সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যাইত।" কল্যাণী বলিল, "দিদিকে দেখিতে আমার বড় ইচ্ছা করে।" তাহার কথা শুনিয়া যতীশ ভাবিল, সংসারের স্বার্থপর কুটিলতা কি কখনও এই সরলাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না? বাস্তবিকই কল্যাণীর পত্নীকে দেখিতে ইচ্ছা হইত। সে সকলকে ভালবাসিত; ভাবিত, সকলে তাহাকে ভালবাসে—সংসারে ভালবাসাই স্বাভাবিক। তাই সে মনে করিত, সরোজা কেন পতিপ্রেমে বঞ্চিতা রহিবে; কেন সে স্বামীর কাছে থাকিতে পাইবে না? ইহা লইয়া সে যতীশের সহিত ঝগড়া করিত। সপত্নীর আগমনে তাহার সংসারে যে পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত হইতে পারে—শান্তির স্থানে অশান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, সে তাহা ভাবিতেও পারিত না।

যতীশ যখন কল্যাণীর কথা শুনিত, তখন সে মনে করিত,—

কোন্ জন্মার্জ্জিত সুকৃতিবলে বিধাতা আমার দুরদৃষ্টদাবানলদগ্ধ জীবনে এই শান্তির স্নিগ্ধ স্রোতঃ প্রবাহিত করিয়াছেন? আমি কল্যাণীর উপযুক্ত নহি—তবে আমি তাহার উপযুক্ত হইবার চেষ্টা করিব। আমার দীনতা—হীনতা তাহার পুণ্যপ্রভাবে দূর হইয়া যাইবে; আমার অসম্পূর্ণতা সে সম্পূর্ণ করিয়া দিবে।

কল্যাণী যে দুঃখসময়ে তাহার সমস্ত অলঙ্কার সানন্দে—স্বেচ্ছায় তাহাকে দিয়াছিল, যতীশ সে কথা ভুলে নাই। কিন্তু সে সে কথা উত্থাপিত করিলেই কল্যাণী অন্য কথা পড়িয়া সে কথা চাপা দিত। যতীশ কল্যাণীকে না বলিয়া কোন কায করিত না; কিন্তু তাহাকে না বলিয়া তাহার জন্য একখানি অলঙ্কার প্রস্তুত করিতে দিয়াছিল। সূতিকাগৃহ হইতে বাহির হইয়া স্নানান্তে কল্যাণী যখন পুত্রকে অঙ্কে লইয়া বসিয়া ছিল, যতীশ তখন সেই অলঙ্কার লইয়া আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "দেখ, একটা কথা তোমাকে জানিতে দিই নাই।" কল্যাণী বলিল, "তুমি কেন অত পয়সা খরচ করিলে? এখন অনেক খরচ বাড়িল। আমাদের সাবধান হইয়া চলিতে হইবে।" তবুও যখন যতীশ তাহাকে সেই অলঙ্কার পরাইয়া দিয়া তাহার মুখচুম্বন করিল, তখন সে হৃদয়ে অত্যন্ত সুখ অনুভব করিল—সে অলঙ্কার পরিলে যতীশ যখন সুখী হয়, তখন অলঙ্কার পরিয়া সে সুখী হইবে না কেন?

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ভাঙ্গা-গড়া।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের শ্রাদ্ধ হইয়া গেল। তিনি সমস্ত সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ রাধাচরণকে দিয়াছিলেন। তাঁহার অর্দ্ধাংশ তাঁহার তিন পুত্রের; তাহার মধ্যে গৃহে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রী ও পুত্রীদিগের বাসের অধিকার ছিল। এ সব ব্যবস্থা বামাচরণের মনঃপূত হয় নাই। সে বুঝিয়াছিল, এখন রাধাচরণকে হস্তগত করাই আবশ্যক—একে সে অর্দ্ধাংশের মালিক—তাহাতে তাহার নগদ টাকাও রহিয়াছে। সুতরাং সে রাধাচরণকে বুঝাইয়া টাকাটা ব্যবসায়ে ফেলিবার বন্দোবস্ত করিতে লাগিল; রাধাচরণকে বলিল, "বসিয়া থাকিলে ত আর চলিবে না। কলিকাতায় চল। কায ত করিতে হইবে।" কিন্তু রাধাচরণের প্রতি তাহার অতিরিক্ত স্নেহ শৈলজার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিল না। শৈলজার সন্দেহ উদ্দীপ্ত হইল।

শৈলজা রাধাচরণকে ডাকিয়া বলিল, "জ্যেঠা মহাশয় নাকি তোমাকে কয় হাজার টাকা দিয়া গিয়াছেন?"

রাধাচরণ বলিল, "হাঁ।"

"তুমি টাকা লইলে কেন?"

রাধাচরণ জ্যেঠতাতের সহিত তাহার কথোপকথন বিবৃত করিল।

শৈলজা জিজ্ঞাসা করিল, "সে টাকা কোথায়?"

রাধাচরণ বলিল, "বড় দাদার কাছে।"

"কেন ?"

"ব্যবসায়ে দেওয়া হইবে।"

"তোমার ব্যবসা করিয়া কায নাই।"

"কি করিব ?"

"চাকরী করিয়া দেখিয়াছ; রাখিতে পার নাই। ব্যবসা তোমার কায নহে। কেবল হইবার মধ্যে ভ্রাতায় ভ্রাতায় মনোমালিন্য হইবে। ঐ টাকা দিয়া একটু সম্পত্তি কিন। দেবী চাকরী করিতেছে করুক, তুমি সংসার দেখ—সম্পত্তি দেখ। তিল কুড়াইয়া তাল হয়—কয় জনে যাহা আনিবে, তাহাতে সংসারে কষ্ট হইবে না।"

রাধাচরণ কি করিবে স্থির করিতে না পারিয়া বামাচরণের পরামর্শ লইতে গেল।

বামাচরণ সব শুনিয়া শঙ্কা গণিল—বুঝি জাল ছিঁড়িয়া মাছ পলায়। যাহা হউক, সে ভাবিল, সে শৈলজাকে বুঝাইয়া রাধাচরণকে লইয়া যাইতে পারিবে। আপনার বুদ্ধিতে তাহার অতিরিক্ত বিশ্বাস ছিল। আর শৈলজার সহজ বুদ্ধি যে তাহার ক্রূর বুদ্ধিকে পরাজিত করিতে পারে, তাহা সে ভাবিতেও পারিল না।

অপরাহ্ণে অন্তঃপুরের দালানে শৈলজা, বিরজা, পিসীমা ও বড় বধূ বসিয়া ছিলেন। বামাচরণ রাধাচরণকে লইয়া তথায় আসিল। বড় বধূ মাথার কাপড় টানিয়া দিলেন।

বামাচরণ বলিল, "শৈল, তুই কি রাধাচরণকে বাটী থাকিতে বলিয়াছিস্?"

শৈল কোলের ছেলেকে দুধ পান করাইতেছিল, মুখ তুলিয়া বলিল, "হাঁ।" তাহার পর ছেলেকে আবার দুধ দিতে লাগিল।

বামাচরণ বলিল, "পার্ব্বতী আর দেবী ত বাড়ীতেই থাকিল।"

শৈল মুখ না তুলিয়াই বলিল, "মেজদাদা যজমান দেখিবেন, দেবীর চাকরী আছে।"

"কিন্তু বসিয়া থাকিলে কয় দিন চলিবে?"

"চলিবার ব্যবস্থা জ্যেঠা মহাশয় একরূপ করিয়া গিয়াছেন। তিনি যে টাকা রাধুকে দিয়া গিয়াছেন, সে টাকায় একটু সম্পত্তি কিন। রাধু সংসার দেখুক—সম্পত্তি দেখুক। টাকা রাধুর নহে—তোমাদের চারি ভ্রাতার।"

"আমি বলি, রাধাচরণ আমার সঙ্গে ব্যবসায় থাকুক। আমি একলা সব পারিয়া উঠি না।"

"রাধুর কি ব্যবসা বুঝিবার যোগ্যতা আছে? আর ঐটুকু ব্যবসাতেই বা কি হইবে?"

"না—এই টাকাটা ফেলিলে ব্যবসাটাও বড় করা যায়।"

শৈল হাসিয়া বলিল, "তুমি এত বড় বুদ্ধিমান্, তুমি ব্যবসায়ে বড় লাভ করিতে পারিলে, তা রাধু লাভ করিবে! আমি ত জানি, কলিকাতার বাসার খরচ পাই পয়সা হিসাব করিয়া জ্যেঠা মহাশয় পাঠাইতেন।"

কথা কাটাকাটিতে বামাচরণ একটু রাগ করিতেছিল—

বিশেষ সে শৈলজাকে যুক্তিতে পরাস্ত করিতে পারিতেছিল না; ইহাতে তাহার রাগ আরও বাড়িয়া যাইতেছিল। সে বলিল "লাভ করি কি না করি, এই বার বুঝিবে।"

শৈলজা বলিল, "এত দিন যদি বুঝি নাই, এইবারই বা বুঝিব কেন?"

"এত দিন সংসারে অভাব হয় নাই—তাই কিছু দিই নাই; এখন বোধ হয়, আমাকেও দিতে হইবে, তোমাদেরও লইতে হইবে।"

শৈলজা ঝনাৎ করিয়া ঝিনুকখানা দুগ্ধের বাটিতে ফেলিয়া দিল; বিস্ফারিতনয়নের তীব্র দৃষ্টি বামাচরণের মুখে স্থাপিত করিয়া বলিল, "দাদা, আমি চার ছেলের মা—কচী খুকী নহি। বাবা যে জ্যেঠা মহাশয়কে টাকা পাঠাইতেন—সে কি সংসারের অভাব বুঝিয়া? দেখিতেই ত পাইলে, সে টাকা বাড়িয়াছে বই কমে নাই। রাধু ব্যবসা করিলে টাকা কি সংসারে আসিবে?"

বামাচরণ বলিল, "আমি যাহা ভাল বুঝিয়াছি—বলিয়াছি। আমার কায আমি করিয়াছি। এখন তোমরা যাহা ভাল বুঝ কর।"

"আমাদের বুঝাবুঝিতে আর কি আইসে যায়। তোমাদের ভাল হইলেই ভাল। যাঁহার জোরে—যাঁহার যত্নে বাপের বাড়ীতে জোর ছিল, তিনি গিয়াছেন। বাপের বাড়ীতে আর যত্ন করিয়া কেহ আনিবে না। বাপের বাড়ী আসিবার পাট উঠিল। তবে তোমাদের দুঃখকষ্টের কথা শুনিতে না হয়।"

"কেন, তোমরা আসিবে না কেন? বাটীতে তোমাদের ত আমাদের সমানই অধিকার।"

বারুদের স্তূপে যেন অগ্নিযোগ হইল। শৈল বলিল, "বাপের বাড়ী থাকিলেই মেয়েরা আসিয়া থাকে। জ্যেঠা মহাশয় যে সে জন্য আবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, সে কি তোমাদের গুণে নহে? আমি সবই জানি। আমার পত্র পাইতে এক দিন বিলম্ব হইলে জ্যেঠা মহাশয় পত্রের জন্য ঘর আর বাহির করিতেন। তুমি কি কোন দিন একখানা পত্র লিখিয়া সংবাদ লইয়াছ? তুমি ত বড় ভাই—সে কায ত তোমারই।"

ক্রোধে ও অভিমানে শৈলজার নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল।

বামাচরণ পরাজিত হইয়া স্থানত্যাগ করিল।

শৈলজা বিরজার কোলে ছেলে দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বড় বধূ গজরাইতেছিলেন। তাঁহার একটি মেয়ে আসিয়া বিরজার কাছে খাবার চাহিল। "কেবল লোককে বিরক্ত করা"—বলিয়াই বড় বধূ তাহার পৃষ্ঠে চপেটাঘাত করিলেন। সে কাঁদিতে না কাঁদিতে শৈলজা তাহাকে বক্ষে তুলিয়া লইয়া বড় বধূকে বলিল, "বড় বৌ, পিসী মাসী ত কুটুম্ব নহে যে, খাবার চাহিলে তাহাদের বিরক্ত করা হয়। ছেলেদের অমন শিক্ষা দিও না।"

বড় বধূ বলিলেন, "জানি গো, জানি। সময়গুণে সবই হয়।"

"আমিও তাহা জানি। যখন জ্যেঠা মহাশয় গিয়াছেন, তখন তোমরা সেই সময়ই আনিবে। তবে যে কয় দিন সে সময় না আইসে—সে কয় দিন তোমারও মঙ্গল—আমারও

মঙ্গল। সে কয় দিন ছেলেমেয়েরা পিসীদের আপনার বলিয়া জানুক।"

শৈলজা ভ্রাতুষ্পুত্রীকে বক্ষে লইয়া কক্ষান্তরে গেল।

পরদিন প্রভাতেই বামাচরণ সপরিবারে কলিকাতায় চলিয়া গেল; বলিয়া গেল, "আমার খরচ আমি চালাইব। সে জন্য আর কাহারও কথা শুনিব না।" সে পিসীমা'কেও লইয়া গেল না।

শৈলজা বিরজাকে বলিল, "এবার কি এমন পোড়া কপাল লইয়াও আসিয়াছিলাম! কাঁদিয়া চলিলাম। আর বুঝি, সংসারও ভাঙ্গাইয়া গেলাম।"

বিরজা বলিল, "এ ভাঙ্গা ত আগেই ভাঙ্গিয়াছিল। বাবা এ ভাঙ্গা জুড়িতে পারেন নাই। তুমি বরং রাধুকে আনিতে পারিলে গড়িয়া যাইতে পারিবে।"

সেই দিন শৈলজা সেজ বধূকে ডাকিয়া অনেক বুঝাইল। সে বলিল, "রাধুর বুদ্ধি প্রকৃতি আমার জানিতে বাকি নাই। একে কোন দিনই উহার মতি স্থির নহে; তাহার উপরে জ্যেঠা মহাশয়ের আদরে ও একেবারে কাযের বাহির হইয়াছে। জ্যেঠা মহাশয় তাই বুঝিয়াই উহার ভাগেই অধিক দিয়া গিয়াছেন। দাদার বুদ্ধিতে প্রবেশ করে, উহার এমন সাধ্য নাই। দাদা উহাকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিবে—আবশ্যকমত অর্থ যোগাইবে ও সেই টাকা আপনার আতর-সাবানে আর তোমার সেমিজ-জ্যাকেটে ফুটকড়াই করিয়া ফেলিবে। সে আমি ভাল জানি।

কিন্তু খরচ এখন বাড়িতেই চলিল। টাকা লইয়া আর ছিনিমিনি খেলা চলিবে না। আমি বলিয়াছি, যে টাকা আছে, তাহা দিয়া সম্পত্তি কিন। সম্পত্তি এক দিনে নষ্ট করা যায় না। ঘরে বসিয়া সম্পত্তি দেখ—সংসার দেখ। তুমি শক্ত না হইলে হইবে না। বুঝিলে ?"

সেজ বধূ ঘাড় নাড়িল।

শৈলজা আবার বলিল, "আর দেখ—মা পাগল। মা'কে ছাড়িয়া যদি কলিকাতায় যাও—তবে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত থাকিবে না। আমার সংসারে আর স্ত্রীলোক নাই। তাই আমাকে যাইতে হইতেছে; নহিলে আমি আরও কিছু দিন থাকিতাম; তোমাকে বাপের বাড়ী পাঠাইতাম না। বিরজাও ছেলে মানুষ—আর সে সূতিকাগারের ব্যবস্থা কিছুই জানে না। পিসিমা'র বয়স হইয়াছে। সেই জন্যই তোমাকে বাপের বাড়ী পাঠাইতেছি। তুমি সূতিকাগার হইতে বাহির হইয়াই চলিয়া আসিও; বিলম্ব করিও না। বিরজা থাকিতে মা'র কোনরূপ অযত্ন হইবে না। ভগবান্ কেন যে তাঁহার অদৃষ্টে এত দুঃখ লিখিয়াছিলেন!" শৈলজার নয়নে অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

তাহার পর বিদায়ের পালা পড়িল। নীরজার শ্বাশুড়ীর কড়া হুকুম, তাহাকে ফিরিতে হইবে। পার্ব্বতীচরণ বলিল, এ হুকুম না মানিলে চলিবে না। শৈলজারও না যাইলে নহে। বৈশাখের প্রথমেই সেজ বধূকে ও নীরজাকে পাঠাইয়া শৈলজা যাত্রার আয়োজন করিল। এবার যাইবার সময় সে অনেক

কাঁদিল—জ্যেঠা মহাশয়ের জন্য কাঁদিল—বিরজার জন্য কাঁদিল—সরোজার জন্য কাঁদিল—সংসারের জন্য কাঁদিল—দাদার জন্য কাঁদিল—তাহার সঙ্গে সঙ্গে বিরজাও কাঁদিল—সরোজাও কাঁদিল।

যাইবার সময়ে শৈলজা বিরজাকে বলিল, "বাপের বাড়ী হইতে যাইবার সময় পূর্ব্বে কখন তোমাদের কি হইবে, ভাবি নাই। এবার হইতে সে ভাবনার আরম্ভ হইল।"

বিরজা বলিল, "দিদি, মধ্যে মধ্যে আসিও। আমি কাশী যাইতাম; কিন্তু সরোজাকে কোথায় রাখিয়া যাইব?"

শৈলজা বলিল, "না, তোমার যাওয়া হইবে না। এখন উহার সকল ভার তোমার। ভগবান্ যদি উহার অদৃষ্ট ফিরান, তখন তোমার ছুটী হইবে। আমি আসিব বৈ কি? যত দিন মা আছেন—পিসীমা আছেন তোমরা আছ, ততদিন কি না আসিয়া থাকিতে পারিব?"

নবম পরিচ্ছেদ।

সপত্নী-সম্ভাষে।

জ্যৈষ্ঠের প্রথমে এক দিন ইচ্ছাপুরে সংবাদ আসিল, নীরজা অসুস্থা—তাহার বিসূচিকার মত হইয়াছিল; রোগ কিছু উপশমিত হইয়াছে—আরোগ্য হয় নাই। এই সংবাদে ভট্টাচার্য্য-গৃহে আশঙ্কার নিবিড় ছায়াপাত হইল। রাধাচরণ পার্ব্বতীচরণের সহিত পরামর্শ করিয়া দানাপুর-যাত্রার উদ্যোগ করিল। পিসীমা বলিলেন, তিনি যাইবেন। বিরজার হৃদয় ভগিনীর জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু বিধবা হইয়া সে আর কোথাও যায় নাই; সেই জন্য সে যাইবার কথা বলিল না। সরোজা বলিল, সে যাইবে।

সরোজা যাইতে চাহিলে বিরজা বারণ করিল না। তাহার কারণ দ্বিবিধ—প্রথম, নীরজার শুশ্রূষার আবশ্যক হইতে পারে; দ্বিতীয়, যতীশ দানাপুরে; কে জানে, অদৃষ্ট কখন্ কোন্ পথে, কাহাকে কোথায় লইয়া যায়?

সেই দিনই সরোজাকে লইয়া রাধাচরণ দানাপুরে যাত্রা করিল। বিরজা গোপনে রাধাচরণকে যতীশের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিতে বলিয়া দিল।

সমস্ত রাত্রি ট্রেণ চলিল; প্রভাতে দানাপুরে পৌঁছিল। তাড়াতাড়ি নামিয়া রাধাচরণ ভগিনীকে নামাইল; তাহার পর তাহাকে লইয়া বাহিরে আসিয়া গাড়ী ভাড়া করিল। তখন

রাধাচরণ শুনিল, ষ্টেশনের নাম দানাপুর হইলেও খাস দানাপুর দুই মাইল পথের কম নহে।

গাড়ী চলিতে লাগিল। পথ কঙ্করাস্তৃত—সুরক্ষিত। পথের পার্শ্বে কণ্টকগুল্ম। বৃক্ষলতা নূতন—প্রান্তর ধূলিধূসর। সেই তৃণহীন প্রান্তরে মহিষদল তৃণ সন্ধান করিতেছে—আর প্রান্তর-মধ্যবর্ত্তী খালের জলে কয়টি মহিষ দেহ ডুবাইয়া আছে—তাহাদের মুখমাত্র জলের উপর রহিয়াছে। কোথাও বা রাখাল-বালক একটি মহিষের পৃষ্ঠে শয়ন করিয়া অন্যগুলিকে লক্ষ্য করিতেছে। প্রান্তরে এক প্রকার চিল ঘুরিতেছে; তাহাদের দেহ পক্ষবিরল—কদাকার। সরোজার নিকট এ সকলই নূতন। সে মুগ্ধনেত্রে এই নূতন দৃশ্য দেখিতে লাগিল; আর মধ্যে মধ্যে রাধাচরণকে কোন বৃক্ষের নাম বা স্থানের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। রাধাচরণ যে সে সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে পারিতেছিল, এমন নহে।

ক্রমে গাড়ী আসিয়া গোরা-বারিকে পৌছিল। পোষ্ট অফিসের সম্মুখে গাড়ী থামাইয়া চালক রাধাচরণকে তাহার গন্তব্য স্থানের কথা জানিয়া লইতে বলিল।

রাধাচরণের প্রশ্ন শুনিয়া পোষ্টমাষ্টার বাবু বারান্দায় বাহির হইয়া আসিলেন এবং চালককে তাহার গন্তব্য স্থান লালকুটীর কথা বলিয়া দিলেন। তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া রাধাচরণ আসিয়া গাড়ীতে উঠিল। গাড়ী গন্তব্য স্থানাভিমুখে চলিল।

শরৎচন্দ্র "বসু কোম্পানীর" বৈঠক হইতে ফিরিয়া সংবাদপত্র

পাঠ করিতেছিলেন বাহিরে ফটকের সম্মুখে গাড়ী থামিল দেখিয়া তিনি কাগজ রাখিয়া বাহির হইলেন। তিনি খুড়তাতের বিবাহের সময় রাধাচরণকে দেখিয়াছিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া যাইয়া প্রণাম করিলেন,—জিজ্ঞাসা করিলেন "সঙ্গে কে ?"

রাধাচরণ বলিল, "আমার সেজ ভগিনী।"

শরৎচন্দ্র তাহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "আসুন, ছোট কাকীমা ভাল আছেন।"

রাধাচরণ যান চালককে ভাড়া দিল ও ব্যাগটি নামাইয়া লইল।

শরৎচন্দ্র রাধাচরণের নিকট হইতে ব্যাগটি লইয়া আগন্তুক-দ্বয়কে গৃহে লইয়া চলিলেন।

নীরজার শ্বাশুড়ী দালানে বসিয়া কুটনা কুটিতেছিলেন। নীরজা নিকটেই বসিয়া ছিল। শরৎচন্দ্র পিতামহীকে জানাইলেন, তাঁহার ছোট কাকীমা'র দাদা ও দিদি আসিয়াছেন। শুনিয়া বৃদ্ধার মুখে বিরক্তিভাব ফুটিয়া উঠিল ; তিনি বলিলেন,—"এ কি, বাপু! বলা নাই—কহা নাই, ঢং করিয়া কুটুম্ব-বাড়ী আসা কেন ?"

শরৎচন্দ্র বলিলেন,—"চুপ কর, ঠাকুরমা।"

শ্বাশুড়ীর কথা শুনিয়া নীরজা কাঁদিয়া ফেলিল। সরোজা শরৎচন্দ্রের পশ্চাতেই ছিল ; সেও সে কথা শুনিতে পাইয়াছিল।

সরোজা ভগিনীর শ্বাশুড়ীকে প্রণাম করিল। তিনি বলিলেন,

—"আইস, মা! ছোট বৌমা, তোমার দিদিকে তোমার ঘরে লইয়া বসাও—হাত-মুখ ধুইতে দাও।"

নীরজা ভগিনীকে আপনার ঘরে লইয়া গেল; ঘরে যাইয়াই বাষ্পজড়িতকণ্ঠে বলিল, "দিদি, কেন তোমরা আসিলে?"

সরোজা সস্নেহে ভগিনীর অশ্রু মুছাইয়া বলিল,—"তুই কাঁদিস কেন? আমাদের কাছে তুই বড়, না তোর শাশুড়ীর দুইটা কথা বড়? কই, তাঁহার কথায় আমার ত কোন কষ্ট হয় নাই!"

নীরজা তবুও কাঁদিতে লাগিল।

তাহার পর সরোজা ভগিনীর অসুস্থতার কথা জিজ্ঞাসা করিল; জানিল, কয় দিন হইতে নীরজা কিছু অসুস্থ ছিল - ক্ষুধা ছিল না; কিন্তু খাবার নষ্ট হইলে শাশুড়ী বড় রাগ করেন বলিয়া সে আহার করিয়াছিল। তাহাতেই সে অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়ে। আর সে অসুস্থ হওয়াতে তাহার শাশুড়ী বড় রাগ করিয়াছেন; কারণ, অসুখ হইলেই ডাক্তার ডাকিতে হয়—তাহা হইলেই অর্থব্যয়।

সরোজা হাসিয়া বলিল, "এ দোষ তোরই। শাশুড়ী আদর করিয়া খাইতে দিবেন, আর তুই খাইয়া অসুখ বাধাইবি?"

তাহার পর সরোজা ভগিনীকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোকে একবার লইয়া যাইবার কথা বলিব কি?"

ব্যস্ত হইয়া নীরজা বলিল, "না, না। এই সে দিন আসিয়াছি, আবার যাইবার কথা? তাহা হইলে আর রক্ষা রাখিবেন না। আর তোমরা কল্যই চলিয়া যাও। আমি জানিলে কিছুতেই তোমাদের আসিতে দিতাম না।"

সরোজা বলিল, "তবে দেখিতেছি, তোকে না জানাইয়া আসিয়াই ভাল করিয়াছি।"

সরোজা ক্রমে ক্রমে ভগিনীর সংসারের সকল সংবাদ লইতে লাগিল। সব শুনিয়া সে বলিল, "দেখ্, নীরজা, তোর শাশুড়ী লোক মন্দ নহেন। তিনি টাকা ভালবাসেন; তা সে-ও তোদেরই জন্য। তিনি হয় ত একটু অধিক বকেন;—কিন্তু তোদেয় অযত্ন করেন না;—আদরও নাই—অনাদরও নাই।"

সেই দিন মধ্যাহ্নে দুই ভগিনীতে আবার কত কথা হইল। তখন নিদাঘের উত্তপ্ত পবনে অনলের স্পর্শ—আকাশ তাম্রবর্ণ রজতরেণুর মত ধূলিকণা বাতাসে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। অদূরে নদীগর্ভের বালুবিস্তার; মধ্যে যে যে স্থানে একটু জল বাধিয়া আছে বা শীর্ণ জলস্রোতঃ শাণিত ছুরিকার মত দেখাইতেছে, সেই সেই স্থানে পাখীরা আসিয়া জল পান করিতেছে—পানান্তে এক বার ঊর্দ্ধমুখে চাহিতেছে—তাহার পর উড়িয়া কোন বৃক্ষের পল্লবচ্ছায়াস্নিগ্ধ আশ্রয় সন্ধান করিতেছে। পথে পথিক নাই—নদীপারে দেয়াড়া জমীতে পশুরাও আর চরিতেছে না,—বৃক্ষতলে ছায়ায় শয়ন করিয়া অলসভাবে রোমন্থ করিতেছে। গৃহে গৃহে বাতায়ন রুদ্ধ।

সরোজা ভগিনীর নিকট দানাপুরের বাঙ্গালীদিগের সংবাদ লইল। নীরজা জানাইল, যে সকল বাঙ্গালী সপরিবারে দানাপুরে বাস করেন, তাঁহাদের অধিকাংশেরই গৃহ নিকটে। পোষ্ট অফিস, বসুভ্রাতৃদ্বয়ের গৃহ, রসদ-বিভাগের কর্ম্মচারী যতীশচন্দ্রের গৃহ সবই

নিকটে। পোষ্টমাষ্টার মহাশয়ের পত্নী, "ডাক্তার সাহেবের" গৃহিণী, "উকীল সাহেবের" ঘরণী, যতীশ বাবুর স্ত্রী সকলেই যে তাহার অসুখ শুনিয়া তাহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন, তাহাও সে ভগিনীকে বলিল; সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিল যে, হয় ত তাঁহারা অপরাহ্নে আসিবেন, গ্রীষ্মকালে এ স্থানে প্রভাত ও অপরাহ্ন ব্যতীত মধ্যাহ্নে গতায়াত দুঃসাধ্য। প্রাতে গৃহকার্য্যবশতঃ মহিলাদিগের পক্ষে গৃহত্যাগ সম্ভব হয় না; তাই দেখা সাক্ষাৎ অপরাহ্নেই হইয়া থাকে। সরোজা ভগিনীর নিকট সকলের সংবাদ লইতে লাগিল; কে কেমন আলাপী, কাহার বাড়ী কোথায়—কাহার কয়টি সন্তান, সে সেই সব সংবাদ লইল। তাহারই মধ্যে সে যে কল্যাণীর কথাটা বিশেষ ভাবে জানিয়া লইল, নীরজা তাহা ধরিতে পারিল না। তাহার কারণ নীরজার সন্দেহের কোনই কারণ ছিল না। কল্যাণী সরোজার কে, সে তাহা জানিত না। সরোজা শুনিল, কল্যাণী স্বভাবগুণে সকলের প্রিয়। কল্যাণীর ছেলেটি দেখিতে কেমন—কত বড়, সে কথাও সরোজা জানিয়া লইল।

নীরজার দিদি কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন, সে সংবাদ দানাপুরের প্রায় সব বাঙ্গালী পরিবারে প্রচারিত হইয়াছিল। সেই সঙ্কীর্ণ সমাজে আগন্তুকের আবির্ভাব সচরাচর হয় না। তাই যে সকল মহিলা সে সংবাদ শুনিয়াছিলেন—তাঁহারা তাহাকে দেখিতে আসিবেন, স্থির করিয়াছিলেন। বেলা পড়িতে না পড়িতে উকীল-গৃহিণী ডাক্তার-গৃহিণীকে বলিলেন, "দিদি! লাল-

কুটীতে যাইবে না?" তিনি বলিলেন, "যাইব। এই খোকাকে দুধ খাওয়াইয়া—খুকীকে কাপড় পরাইয়া—তোমার ভাশুরের আর বরের জল খাবার গুছাইলেই হয়।" উকীল-গৃহিণী দিদির অবশিষ্ট কাযের ফিরিস্তি শুনিয়াই বুঝিলেন, সন্ধ্যার পূর্ব্বে কায শেষ হওয়া দুর্ঘট। তিনি বলিলেন, "আমি খুকীকে কাপড় পরা-ইয়া, জলখাবার গুছাইতেছি। তুমি খোকাকে দুধ খাওয়াও।" দিদি ইহাতে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া দুধ গরম করিতে উঠিলেন এবং ব্যস্ততা বশতঃ যাইতে দুগ্ধের বাটিতেই পদের আঘাত লাগা-ইয়া অনেকটা দুগ্ধ ফেলিয়া দিলেন। তাঁহাদের কায শেষ হইতে না হইতে পোষ্টমাষ্টার-ঘরণী আসিয়া উপস্থিত হইলেন—"কি গো, তোমরা আজ লালকুটীতে যাইবে না? ছোট বৌর দিদি আসি-য়াছে।" উকীল-গৃহিণী বলিলেন,—"আমরা যাইবার উদ্যোগই করিয়া আছি। অপেক্ষা কেবল তোমার। তোমার কর্ত্তা যে বড় আজ সকাল সকাল ছুটী দিলেন?" তিনি বলিলেন, "হাঁ গো হাঁ। বলে, 'অনেক মেয়ে সতী আছেন, ধরা পড়েছেন রাধা'। আমি ত আসিয়াই উপস্থিত। তোমাদের যে সবই অস্থিত। চল—একটু শীঘ্র কর। কল্যাণীকে আমি খবর দিয়া আসিয়াছি।

সরোজার আগমন-সংবাদ কল্যাণী পূর্ব্বে পায় নাই; পোষ্ট-মাষ্টার বাবুর পত্নী বাহির হইবার সময় দাসীকে দিয়া তাহাকে সে সংবাদ দিয়া আসিয়াছিলেন। সে সংবাদ পাইয়া—সংসারের কায সারিয়া লালকুটীতে যাইতে কল্যাণীর কিছু বিলম্ব হইল। সে যথাসম্ভব শীঘ্র উপস্থিত হইল; কারণ, নীরজার দিদি আসিয়া-

ছেন। তিনি কে? তিনিই কি সরোজা? সে এই কথা যত ভাবিতেছিল—সে প্রশ্নের মীমাংসার জন্য তাহার ব্যগ্রতা ততই বর্দ্ধিত হইতেছিল।

কল্যাণী যখন লালকুটীতে উপস্থিত হইল, তখন আগন্তুক ও গৃহস্থাদিগের সঙ্গে নীরজা অন্তঃপুরে দালানে বসিয়া ছিল। তাহার শাশুড়ীও তখন তথায় ছিলেন। কল্যাণী আসিয়া দাঁড়াইলেই নীরজা সরোজাকে বলিল, "দিদি! ইঁহারই কথা তখন তোমাকে বলিতেছিলাম। ইনি যতীশ বাবুর স্ত্রী।"

সরোজা কল্যাণীর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। সে উঠিয়া দাঁড়াইল; মুহূর্ত্তের জন্য তাহার মুখে পাণ্ডুবর্ণ ব্যাপ্ত হইল—নয়নে বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্য। তাহার পর সে অকম্পিতকরে স্বীয় কণ্ঠ হইতে হার খুলিয়া লইয়া কল্যাণীর অঙ্কস্থ শিশুর কণ্ঠে পরাইয়া দিল ও তাহাকে মাতৃবক্ষ হইতে লইয়া আপনার বক্ষে ধারণ করিল।

কল্যাণী সরোজাকে ভাল করিয়া দেখিল,—এই সপত্নী! ইহাকে ভয়? ইহাকে যে দেখিলেই শ্রদ্ধা করিতে ভালবাসিতে ইচ্ছা করে! সরোজা কল্যাণীকে দেখিল, এই সরলা সপত্নী! ইহাকে স্নেহ না করিয়া কি থাকা যায়? দুইটি রমণীহৃদয়ে পরস্পরের স্বরূপ প্রতিভাত হইল; পরস্পরের প্রতি স্নেহের আকর্ষণ অনুভূত হইল। কল্যাণী সরোজাকে প্রণাম করিল; সরোজা কল্যাণীকে আশীর্ব্বাদ করিল।

মহিলাদের মধ্যে কেহই সরোজার কার্য্যের অর্থ উপলব্ধি

করিতে পারিলেন না। সকলেই বিস্ময়ে নির্ব্বাক্। তাহার পর নীরজার শ্বাশুড়ী তাঁহার পার্শ্বস্থা জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূকে বলিলেন, "এ কি বাপু? যাহাকে জানি না, চিনি না, তাহার ছেলের মুখ দেখিতে পাঁচ শত টাকার হার দেওয়া! অবাক্ কাণ্ড!"

সরোজা সে কথা শুনিতে পাইল; বলিল, "মা, এ যে আমারই ছেলে। আমার সবই ইহার।"

নীরজার ভগিনীর যে সপত্নী আছে এবং সে পিত্রালয়বাসিনী, সকলে তাহা জানিতেন; কিন্তু কল্যাণীই যে তাহার সপত্নী, কেহই তাহা জানিতেন না। সরোজার কথায় সকলে তাহা বুঝিলেন। এই অপ্রত্যাশিত মিলনে সকলেই বিস্মিত এবং কেহ কেহ শঙ্কিত হইলেন। নীরজার শ্বাশুড়ী সরোজার কথা শুনিয়া আরও বিস্মিত ও বিরক্ত হইলেন; বলিলেন, "তাহা হউক। মা, তোমরা—আজকালের মেয়েরা বড় অবুঝ—বড় অসাবধান। গহনা যে সময় অসময়ের জন্য, তাহাও বুঝ না।" স্বামীর অনাদৃতা রমণী যে সপত্নীপুত্রকে দেখিয়া এমন স্নেহ জানায় তাহা তাঁহার নিকট ভাল বোধ হইতেছিল না।

শিশু তখন সরোজার কাপড়ের পাড় লইয়া খেলা করিতেছিল। তাহার মুখচুম্বন করিয়া—আপনার নিষ্ফল বক্ষে তাহাকে ধরিয়া সরোজা মনে করিতেছিল, সে অননুভূতপূর্ব্ব অসীম সুখ লাভ করিতেছিল। সে শিশু যেন একান্তই তাহার।

কল্যাণীকে বসিতে বলিয়া সরোজা বসিল। শিশু সরোজার কাছেই রহিল। সরোজা সকলের সহিত নানা কথা কহিতে

লাগিল। কিন্তু নীরজা কেমন অন্যমনস্কা! সে কেবলই কি ভাবিতেছিল।

যত ক্ষণ অন্য সকলের সঙ্গে কল্যাণীও গমনোদ্যতা না হইল, তত ক্ষণ শিশু সরোজার কাছেই থাকিল। কল্যাণী বিদায় চাহিলে সরোজা শিশুকে দিল। যাইবার সময় কল্যাণী বলিয়া গেল, "দিদি, ছেলে তোমার—সংসার তোমার। আমি সকালেই আসিব। তোমাকে বাড়ী যাইতে হইবে।"

দশম পরিচ্ছেদ।

এত দিনে!

সন্ধ্যার পর ভগিনীর কক্ষে প্রবেশ করিয়া সরোজা দেখিল, নীরজা একা বসিয়া ভাবিতেছে। ভগিনীকে দেখিয়া নীরজা কাঁদিয়া ফেলিল; বলিল, "দিদি, কেন তুমি আমাকে দেখিতে আসিলে!"

সরোজা ভগিনীর কাছে আসিল—হাসিয়া বলিল, "দেখ, আমার কথা তুই ত সবই জানিতিস্; কেবল জানিতিস্ না যে, তোদের কল্যাণী আমার সপত্নী। ইহাতে কাঁদিবার কি আছে?"

সত্যই ইহা ত কিছুই নূতন নহে। তবুও নীরজার মনে হইল, যেন বহুদিনের বিস্মৃতপ্রায় বেদনা আজ নূতন করিয়া অনুভূত হইতেছে—যেন পুরাতন ক্ষত আজ নূতন হইয়া উঠিয়াছে। সে কাঁদিল। তাহার পর সরোজার কথায়—আর সরোজার ব্যবহারে নীরজা আপনার ক্রন্দন যে অকারণ—তাহা বুঝিল; স্থির হইল।

সরোজা ভগিনীকে শান্ত করিল বটে; কিন্তু সে আপনি শান্ত হইতে পারিল কি? সমস্ত রাত্রি সে ঘুমাইতে পারিল না; কেবল ভাবিতে লাগিল। অদৃষ্ট-চক্রের এ কি অপ্রত্যাশিত আবর্ত্তন এ আবর্ত্তন তাহাকে কেমন করিয়া কোথায় আনিল? কল্যাণী তাহাকে লইয়া যাইবে বলিয়াছে। সে যাইবে কি? পতিপুত্র

লইয়া কল্যাণী সুখে আছে, সে তাহার পথে পদার্পণ করিবে কি? নূতন সংসারে যতীশচন্দ্র ত তাহাকে ভুলিয়াছে। তবে—? কিন্তু যতীশচন্দ্র তাহাকে ভুলিয়াছে, ভাবিতেও তাহার নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। স্বামী তাহাকে গ্রহণ করুন, আর নাই করুন—ভুলিয়াছেন কি? তাহার পর সে আবার ভাবিল, সে ত কল্যাণীর সুখের পথে কণ্টক হইবে না; সে ত সে সংসারে থাকিবে না। তাহার দুঃখের ভার লইয়া সে ত আবার পিতৃ-গৃহেই ফিরিয়া যাইবে! তবে—তবে সে একবার স্বামীকে দেখিবে না? হয় ত জীবনে আর দেখিবার সুযোগ ঘটিবে না। সে কি ইচ্ছা করিয়া এ সুযোগ হারাইবে? পিপাসিত হৃদয় জুড়াইতে পাইবে না; কিন্তু তৃষিত নয়ন ত জুড়াইতে পারে! এ কি প্রলোভন! বিরজা কাছে থাকিলে সে তাহার পরামর্শ লইত—তাহার উপদেশ-মত কায করিত। আজ সে একাকিনী—অস্থিরচিত্তা—কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া। হায়! রমণীর জীবনে কি বিষম পরীক্ষার সময় সমাগত!

সরোজা সারা রাত্রি ভাবিল। কিছুই স্থির করিতে পারিল না। বিনিদ্র রজনীর বিশুষ্ক মলিনতা মুখে মাখিয়া সে প্রভাতে শয্যা ত্যাগ করিল। তাহার পর কল্যাণী আসিয়া যখন বলিল, "দিদি, চল, আমি সব কায ফেলিয়া রাখিয়া আসিয়াছি"—তখন সে আর কিছুই ভাবিতে পারিল না। স্বামিসন্দর্শনের আশায় সে চিন্তাশক্তিহীনার মত তাহার সঙ্গে গেল। সে নীরজাকে বলিয়া গেল। নীরজা ভগিনীর কথা শুনিয়া কাষ্ঠ-

পুত্তলিকার মত দাঁড়াইয়া রহিল। সরোজা স্বামিসন্দর্শনে গেল।

সরোজা যখন যতীশচন্দ্রের বাসায় আসিল, যতীশ তখন বাসায় নাই। গ্রীষ্মের কয় মাস প্রভাতেই আফিস হয়; যতীশ আফিসে গিয়াছিল। সরোজার কাছে ছেলেকে দিয়া কল্যাণী সংসারের কায করিতে লাগিল; আর এত দিনের সব কথা বলিতে লাগিল। যেন সরোজার নিকট তাহার গোপন করিবার কিছুই নাই; তাহার সব কথা জানিবার সম্পূর্ণ অধিকার সরোজার আছে। পিতামহীর মৃত্যু—যতীশের অর্থাভাব—তাহার অলঙ্কার ও সম্পত্তি বিক্রয়—বিদেশে চাকরী-প্রাপ্তি, কল্যাণী সব কথাই সরোজাকে বলিল। শুনিতে শুনিতে সরোজারও মনে হইতে লাগিল, যেন সে সব কথা জানিতেই তাহার অধিকার। যতীশের অর্থাভাব ও কল্যাণীর স্বার্থত্যাগের কথা শুনিয়া সে যেন আত্মবিস্মৃত হইয়া বলিল, "আমাকে জানাইলে না কেন?" কল্যাণী বলিল, "আমি লিখিতে চাহিয়াছিলাম; উনি বারণ করিয়াছিলেন।" শুনিয়া সরোজার মনে অভিমানের উদয় হইল। হায় প্রেম! তোমার মোহন স্পর্শ মুহূর্তে কত বেদনার—কত যাতনার উপর বিস্মৃতির যবনিকা ফেলিয়া দেয়, কালের দীর্ঘতা দূর করিয়া দেয়, স্বার্থের নিগড় দূরে নিক্ষেপ করে, সংসার স্বর্গে পরিণত করে। তোমার অসাধ্য কার্য্য নাই—তোমার তুলনা দিবার কিছুই নাই—তোমার মত শক্তি কাহারও নাই। তুমি বিশ্বজয়ী—আর তদপেক্ষাও অজেয় মানব-হৃদয়ও

তুমি অবহেলায় জয় করিতে পার। সর্ব্বত্র তোমার গতি—সর্ব্বত্র তোমার অপ্রতিহত প্রভাব।

কল্যাণী রন্ধন শেষ করিল। আবার দুই জন আসিয়া বিরল-কক্ষ গৃহের মধ্যবর্ত্তী কক্ষে বসিল। তাহার পর অদূরে পদশব্দ শুনিয়া কল্যাণী বলিল, "তিনি আসিতেছেন।" সে পুত্রকে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সরোজাও দাঁড়াইল।

যতীশ কক্ষে প্রবেশ করিল।

সরোজা দেখিল, সম্মুখে—স্বামী। যে মূর্ত্তি সে হৃদয়ে অহরহঃ ধ্যান করিয়াছে—আজ সেই মূর্ত্তি যেন তাহার হৃদয় হইতে আসিয়া তাহার চক্ষুর সম্মুখে দণ্ডায়মান। তাহার রমণী-হৃদয় কত ভাবের ঘাতপ্রতিঘাতে চঞ্চল হইয়া উঠিল।

যতীশ দেখিল, সম্মুখে—সরোজা।

মুহূর্ত্ত উভয়েই নির্ব্বাক্—নিশ্চল হইয়া রহিল। কিন্তু এরূপ অপ্রত্যাশিত অবস্থায় রমণী যত সত্বর প্রকৃতিস্থ হইয়া কর্ত্তব্য কার্য্যে অগ্রসর হয়েন, পুরুষ তত সত্বর তাহা পারে না। সরোজা স্বামীকে প্রণাম করিল—যেন সে হৃদয়ের সকল বেদনা—সকল আকাঙ্ক্ষা পতি-পদে স্থাপিত করিল।

যতীশ জিজ্ঞাসা করিল, "ভাল আছ?" তাহার হৃদয়ে আজ তাহার সমস্ত জীবনের কত কথা জাগিয়া উঠিতেছিল!

সরোজার মনে হইল, সে স্বরে যেন তাহার হৃদয়ে জন্ম-জন্মান্তরের আকুল আহ্বান ধ্বনিত হইয়া উঠিল! সে উত্তর দিতে পারিল না। আর সে কেন জানে না—তাহার দুই নয়ন পূর্ণ

হইয়া গণ্ড বহিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। সে অশ্রু সুখের, কি বেদনার, সরোজা তাহা বুঝিতে পারিল না, বুঝিতে চাহিল না! কল্যাণী দেখিল, সরোজা কাঁদিতেছে। সে যতীশকে বলিল, "তুমি স্নান করিয়া আইস। বেলা হইয়াছে।"

যতীশ কক্ষান্তরে যাইতেছিল। এমন সময় নীরজার এক ভাশুরপুত্র আসিয়া বলিল, "ঠাকুরমা মাসীমা'কে ডাকিতে পাঠাইয়াছেন।"

কল্যাণী সরোজাকে বলিল, "দিদি, তুমি থাক।"

সরোজা বলিল, "না। আমি যাই।" সে কল্যাণীর নিকট হইতে পুত্রকে লইয়া পুনঃ পুনঃ তাহার মুখচুম্বন করিল; তাহার পর তাহাকে কল্যাণীর নিকট দিয়া বিদায় লইল।

সরোজা জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে ভগিনীর গৃহে ফিরিয়া গেল। তাহার চক্ষুর সমক্ষে যতীশচন্দ্রের মূর্ত্তি অবস্থিত ছিল,—তাহার কর্ণে যতীশচন্দ্রের কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হইতেছিল।

আপনার হৃদয়ের শক্তিতে যে বিশ্বাসবশে সে মনে করিয়াছিল, সে ত থাকিতে আইসে নাই—তবে স্বামীকে একবার দেখিবে না কেন?—যতীশকে দেখিয়া—যতীশের কণ্ঠস্বর শুনিয়া তাহার সে বিশ্বাস চূর্ণ—বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সে বুঝিয়াছিল, মানুষের হৃদয় দুর্ব্বল—রমণীর হৃদয়ে শক্তিতে বিশ্বাস করিতে নাই। সে সরলা কল্যাণীর কথা মনে করিল, তাহার প্রেমপ্রফুল্ল সংসারের কথা স্মরণ করিল, আপনার হৃদয়ের দিকে চাহিল, ভাবিল—এ কি প্রলোভন!

তাই সে গৃহে আসিয়াই রাধাচরণকে বলিল, "চল, আমরা [illegible] করিয়া যাই।"

রাধাচরণ পূর্ব্বদিন অপরাহ্ণে যতীশচন্দ্রের নিকট শুনিয়াছিল, তাহার একজন সতীর্থ নিকটবর্ত্তী বাঁকিপুর সহরে আসিয়াছে। সে মনে করিয়াছিল, সেই দিন অপরাহ্ণে যাইয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবে। বাঁকিপুর দেখাও হইবে, বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎও হইবে। তাই সে বলিল, "আজই যাইবে?"

সরোজা বলিল, "হাঁ।"

"কল্য হইলে হয় না?"

"না। কুটুম্ববাড়ী অধিক দিন থাকা ভাল দেখায় না।"

রাধাচরণ আর কিছু বলিল না।

কিন্তু সে দিন সরোজার যাওয়া হইল না। নীরজার শাশুড়ীকে যাইবার কথা বলিলে তিনি বলিলেন, "পথ ত অল্প নহে—পরশ্ব সারা রাত জাগিয়া আসিয়াছ, আবার আজই যাইবে! না, সে হইবে না। অন্ততঃ আর এক দিন থাকিয়া—সুস্থ হইয়া যাও। দুই দিন থাকিতে বলিতাম; কিন্তু দেশের যে অবস্থা, বলিতে সাহস হয় না। এই পোড়া রোগ আসিয়া দেশের সর্ব্বনাশ করিল—নহিলে এ স্থানের এমন অবস্থা ছিল না। সে তোমরা শুনিয়াছ।"

তিনি প্লেগের কথা বলিতেছিলেন। তখন বিহারে প্লেগের আবির্ভাব হইয়াছে; প্রতি বৎসর বসন্তের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামে গ্রামে শোকার্ত্ত গৃহস্থের আর্ত্তনাদে তাহার বিজয়-ডঙ্কা

বাড়িয়া উঠে, আর বর্ষার বারিপাত না হইলে তাহার তিরো-ভাব হয় না।

অপরাহ্নে কল্যাণী আবার আসিল, জিদ করিয়া সরোজাকে বলিল, "দিদি, তুমি যাইতে পাইবে না তুমি কেন যাইবে ?"

সরোজার হৃদয়ে প্রবল সংগ্রাম চলিতেছিল। এক দিকে রমণীর প্রেম—আর এক দিকে স্বার্থত্যাগবুদ্ধি; সে কি করিবে ? কল্যাণী যাহাই বলুক, সে কেমন করিয়া তাহার সাজান সংসারে আসিয়া বসিবে ? বিধাতা তাহার অদৃষ্টে সুখ লিখেন নাই, সে দুঃখ ভোগ করিবে; কিন্তু তাই বলিয়া অপরের সুখ নষ্ট করিবার অধিকার তাহার নাই। স্বামিসন্দর্শনের সৌভাগ্য—স্বামীর সম্ভাষণ শ্রবণের সৌভাগ্য সে লাভ করিয়াছে; তাহার স্মৃতি লইয়া সে অবশিষ্ট জীবন যাপন করিবে। সে-ই তাহার নিয়তি; সে প্রবল বলে প্রেমপ্রণোদিত বাসনাকে পরাভূত করিল; কিছুতেই কল্যাণীর অনুরোধ রাখিল না। সে কল্যাণীকে বলিল, "তুমি চিরসুখিনী হও। তোমার স্নেহ-ঋণ আমি শোধ করিতে পরিব না। তুমি আমাকে দেবদর্শন করাইয়াছ—আমার জীবন সার্থক করাইয়াছ। কিন্তু আমি থাকিতে পারিব না।"

কল্যাণী বলিল, "তুমি আমাদের ছাড়িয়া থাকিতে পারিবে না; কারণ আমরা তোমার। স্বামী তোমার—ছেলে তোমার—সংসার তোমার—আমি তোমার। তোমাকে আসিতে হইবে—সংসারে সুখ পাই—ভাগ করিয়া লইব, দুঃখ পাই—ভাগ করিয়া ভোগ করিব। তুমি আসিবে না কেন ?"

সরোজা যুক্তিতে কল্যাণীকে পরাস্ত করিতে পারিল না; কল্যাণীর যুক্তিই তাহার হৃদয়ে উদ্গত হইতেছিল। কিন্তু সে তাহার কর্ত্তব্য স্থির করিয়াছিল—সে যাইবে, থাকিবে না।

কল্যাণী শেষে বলিল, "তুমি যাইবে যাও; কিন্তু তোমাকে আসিতেই হইবে। তোমাকে আনিতে আমি যাইব;- খোকাকে লইয়া যাইব; উনি যাইবেন। তুমি কি না আসিয়া থাকিতে পারিবে?"

সরোজা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। তাহার হৃদয়ে দারুণ চাঞ্চল্য।

কিন্তু কল্যাণীর স্বার্থত্যাগ—আত্মত্যাগ দেখিয়া তাহার হৃদয়েও স্বার্থত্যাগবুদ্ধিই প্রবল হইয়া উঠিল।

চতুর্থ খণ্ড।

মিলন

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মরণাহতা।

পরদিন প্রাতে যাইবার সব উদ্যোগ করিয়া সরোজা ভগিনীর সঙ্গে বাড়ীর কথা বলিতেছিল। সরোজা আসিয়াছিল বলিয়া নীরজা রাগ করিয়াছিল; কিন্তু আজ সে যাইবে বলিয়া নীরজার মুখ অন্ধকার—তাহার অন্তরে বিদায়ের বেদনা অনুভূত হইতেছিল! দুই ভগিনী বসিয়া ছিল, এমন সময়ে পোষ্টমাষ্টার বাবুর দাসী আসিয়া সংবাদ দিল, কল্যাণীর "বিমার" হইয়াছে। নীরজা ভগিনীর দিকে চাহিল—তাহার নয়নে ভীতিভাব। সরোজা ভগিনীকে জিজ্ঞাসা করিল, "প্লেগ?"

নীরজা বলিল, "হাঁ।"

সরোজা উঠিয়া দাঁড়াইল, দাসীকে বলিল, "আমাকে সে বাসায় লইয়া চল।" সে গমনোদ্যতা হইলে নীরজা দিদির অঞ্চল ধরিল; বলিল, "তুমি কোথাও যাও?"

সরোজা বলিল, "কল্যাণীর কাছে।"

"কেন?"

সরোজা বলিল, "আমার পীড়া হইলে, তুই যাইতিস্ না?" সে স্তম্ভিতা ভগিনীর শিথিল মুষ্টি হইতে অঞ্চল মুক্ত করিয়া লইয়া দাসীর সঙ্গে গেল—সে-ই অগ্রে গেল, দাসী তাহার সঙ্গে চলিল। নীরজা পীড়িতা শুনিয়া সে যেরূপ ব্যস্ত হইয়া দানাপুরে আসিয়াছিল, কল্যাণী পীড়িতা শুনিয়া সে তেমনই ব্যস্ত হইয়া যতীশ-

চন্দ্রের গৃহে চলিল। দারুণ দুশ্চিন্তায় তাহার হৃদয় চঞ্চল—সে হৃদয়ে [illegible] কোনরূপ বিচার-বিবেচনার স্থান নাই। কল্যাণী যাহা বলিয়াছিল, তাহাই হইল—তাহাকে ফিরিয়া যাইতেই হইল! সরোজার মনে হইতে লাগিল, তাহার মস্তিষ্ক ঘুরিতেছে। সে অতি দ্রুত পথ অতিক্রম করিয়া যাইয়া কল্যাণীর শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল।

কল্যাণী শয়ন করিয়া ছিল,—যতীশচন্দ্র তাহার শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্ট। যতীশের মুখ ম্লান। ডাক্তার আসিয়াছিলেন; বলিয়া গিয়াছেন,—রোগ প্লেগ। সরোজা কল্যাণীর পার্শ্বে বসিল; কল্যাণীর কপালে করতল সংস্থাপিত করিল। জ্বর প্রবল—উত্তাপ অত্যন্ত অধিক।

সরোজাকে দেখিয়া কল্যাণী হাসিল; হাসিয়া বলিল, "দিদি, তুমি যাইতে পারিবে না। ভগবান্ বড় সময় তোমাকে আনিয়াছেন। আমি চলিলাম!"

সরোজা বলিল, "ছিঃ, অমন কথা বলিতে নাই। তুমি আজই সারিয়া উঠিবে।"

কল্যাণী আবার হাসিল; বলিল, "আমাকে যম ধরিয়াছে।" সে যতীশের দিকে চাহিয়া বলিল, "খোকা কোথায়?"

যতীশ দাসীকে ডাকিয়া পুত্রকে আনিতে বলিল। পুত্র আসিলে কল্যাণী তাহার হস্ত লইয়া সরোজার হস্তে দিল, আর যতীশকে দেখাইয়া বলিল, "দিদি, তোমার সর্ব্বস্ব—আমার সর্ব্বস্ব আমি তোমার হাতে দিয়া যাইতেছি। তুমি ইহাদের ফেলিয়া দিও না।"

বলিতে বলিতে কল্যাণীর গলা ধরিয়া আসিল। সরোজার অশ্রুর উৎস উৎসারিত হইল। সে আর হৃদয়ের চাঞ্চল্য চাপিয়া রাখিতে পারিতেছিল না। এই কল্যাণী কি তাহারই জন্মান্তরের সুকৃতি? সে কি তাহারই জন্য সংসার সাজাইয়া লইয়া তাহারই আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল; আর অদৃষ্ট-চক্রের অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিত আবর্ত্তনে তাহাকে পাইয়াই আজ নিরুদ্দেশ যাত্রা করিতেছে?

প্রবল চেষ্টায় চিত্তচাঞ্চল্য নিবৃত্ত করিয়া সরোজা বলিল, "তুমি কেন ভয় পাইতেছ? কলিকাতায় সংবাদ দিব কি?"

কল্যাণী বলিল, "না। আমার আর কাহাকেও প্রয়োজন নাই। মা—" কল্যাণী একটু ইতস্ততঃ করিল; বুঝি তাহার হৃদয়ে একবার মাতৃদর্শন-বাসনা জাগিয়া উঠিল। কিন্তু সে বাসনা সংযত করিল; বলিল, "মা শুনিলে ব্যস্ত হইয়া আসিবেন। কিন্তু আসিয়া কি হইবে?" তাহার পর সে আবার বলিল, "দিদি, খোকাকে তুমি ফেলিও না।"

যতীশ কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিয়া বারান্দায় গেল। দাসীও শিশুকে লইয়া বাহিরে গেল। সরোজা কল্যাণীর মস্তক অঙ্কে তুলিয়া লইয়া তাহার তপ্ত কপালে হস্ত বুলাইতে লাগিল। যেন কল্যাণী সত্যই তাহার ভগিনী। সরোজা ভাবিতে লাগিল, কল্যাণীর মত আপনার তাহার কয় জন আছে?

স্থানীয় বাঙ্গালীরা পরামর্শ করিয়া কল্যাণীর পুত্রকে স্থানান্ত-

স্থিত করাই সঙ্গত স্থির করিলেন। পোষ্টমাষ্টার বাবুর পত্নী তাহাকে আপনার গৃহে আনাইলেন।

সরোজা ও যতীশ কল্যাণীর শুশ্রূষা করিতে লাগিল। অপরাহ্ণেই কল্যাণীর জ্বর বাড়িয়া উঠিল। জ্বরঘোরে সে এক একবার চমকিয়া উঠিতে লাগিল; আর সরোজার হাত চাপিয়া ধরিতে লাগিল। এক একবার সে ডাকিতে লাগিল, "দিদি!" সরোজা উত্তর দিতে লাগিল, "কি, দিদি?" কিন্তু সে উত্তর সে শুনিতে পাইতেছিল কি না সন্দেহ—শুনিতে পাইলেও বুঝিতে পারিতেছিল না। সে তখন জ্বরঘোরে সংজ্ঞাশূন্য। জ্বর বাড়িতে লাগিল—সঙ্গে সঙ্গে বিষম যন্ত্রণায় কল্যাণী ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল।

ডাক্তার আসিয়া দেখিলেন; বুঝিলেন, আর আশা নাই। যতীশচন্দ্র একান্ত কাতর হইয়া পড়িল। মনেও বল নাই, তাহার দেহেও যেন বল নাই। আজ সে হৃদয়ে যেরূপ যাতনা অনুভব করিতেছিল, সেরূপ যাতনা সে কখনও অনুভব করে নাই। তাহার জীবনে সে চারিটি শোক পাইয়াছে; মাতা, পিতার মাতামহী, পিতা, পিতামহী—চারিজন তাহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। মাতার মৃত্যুকালে সে শিশু, তাহার শিশু-হৃদয়ে জননীর কোন স্মৃতিই মুদ্রিত হয় নাই; সে শোক সে অনুভব করে নাই। ধরণীধরের মাতামহী তাহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। তাহার বাল্যকালে তাঁহার মৃত্যুশোক তাহার পক্ষে বেদনার কারণ হইয়াছিল; কিন্তু পিতামহীর স্নেহে সে অল্পদিনেই

সে শোকের কথা ভুলিয়াছিল—বিশেষ সে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নানা কাযে সে কথা ভুলিয়াই গিয়াছিল। তাহা পিতৃ-শোক। যে বজ্রাঘাতে পুত্র-হৃদয় বিদীর্ণ হয়, তাহার অভিমান-কঠোর হৃদয় সে শোকের আঘাতেও বিচলিত হয় নাই। আবার বেদনার যাতনা অনুভূত হইতে না হইতে দুশ্চিন্তা-দহন হইতে মুক্তির আশার আনন্দ তাহার স্থান অধিকার করিয়াছিল। তাহার পর যে বেদনা, সে শোকের নহে—হতাশার। কেবল পিতামহীর শবপার্শ্বে লুটাইয়া সে কাঁদিয়াছিল। তখন তাহার ভুল ভাঙ্গিয়াছে, মোহ কাটিয়াছে। তাই পিতামহীর জন্য শোক তাহার পক্ষে মাতৃশোক হইয়াছিল; আর সঙ্গে সঙ্গে পিতৃশোকের বিষম বেদনাও অনুভূত হইয়াছিল। তিনি মাতৃহীন শিশুকে মাতৃস্নেহে বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন; তিনি তাহার জন্য পুত্রকেও পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; সে-ই তাহার সর্ব্বস্ব ছিল। তাই পিতামহীর শবপার্শ্বে লুটাইয়া সে বিষম বেদনায় কাঁদিয়াছিল। তিনি তাহার শেষ অবলম্বন ছিলেন। তবুও সে শোকের সান্ত্বনা ছিল। পিতামহী জরাজীর্ণ—শোকদুর্ব্বল—রোগকাতর দেহভার বহন করিতেছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর সময় হইয়াছিল। আর আজ এ কি? পিতামহীর মৃত্যুদিন হইতে যে তাহার অবলম্বন ছিল; যে সম্পদে সখী, বিপদে মন্ত্রী ছিল; যাহার স্বার্থত্যাগ—আত্মত্যাগ তাহার সংসার সুখময় ও জীবন আনন্দময় করিয়াছিল; যে পূত প্রেম-প্রবাহে তাহার আত্মগ্লানির দাবানল নির্ব্বাপিত করিয়াছিল;

যাহাকে না পাইলে সে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া জীবন-মরুপথে ভ্রমণ করিত—যে তাহার জীবনে কল্যাণদায়িনী ছিল, আজ সাজান সংসার ফেলিয়া, অতৃপ্ত সুখ-তৃষ্ণা লইয়া সে কোথায় চলিল? পিতৃদ্রোহী পুত্রের পাপের প্রায়শ্চিত্ত এইবার সম্পূর্ণ হইবে। তাহাদের অল্পকালব্যাপী বিবাহিত জীবনের কত কথা আজ যতীশের মনে পড়িতে লাগিল! সে কখন কল্যাণীকে সুখী করিতে পারে নাই। যখন বালিকা বধূ স্বামীর প্রেমস্বপ্নে বিভোর থাকে—সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণা জানিতেও পায় না, সেই সময় হইতে কল্যাণী সংসারের ভাবনা ভাবিয়াছে, সেই সময়েই সে স্বেচ্ছায়—সাগ্রহে—সানন্দে আপনার যাহা কিছু ছিল, দিয়া স্বামীকে বিপন্মুক্ত করিয়াছে। যে দিন সে সদর্পে বলিয়াছিল, স্বামীর সুখের অপেক্ষা তাহার নিকট আর কিছুই বড় নহে, সে দিন যতীশ রমণীর যে কল্যাণী মূর্ত্তি দেখিয়াছিল, তাহা সে পূর্ব্বে কখনও কল্পনাও করিতে পারে নাই। আর সেই দিন হইতে এ পর্য্যন্ত কল্যাণী আপনি সব অসুবিধা ভোগ করিয়া তাহাকেই সংসারের সকল সুখ সাজাইয়া দিয়াছে। কল্যাণীকে না পাইলে তাহার গতি কি হইত—ভাবিলে সে শিহরিয়া উঠিত। আর আজ সেই কল্যাণী তাহাকে ফেলিয়া মহাযাত্রা করিতেছে। আজ যতীশচন্দ্রের বেদনার—যাতনার স্বরূপ কে উপলব্ধি করিতে পারে? আজ যেন জগৎ তাহার পক্ষে শূন্য বোধ হইতেছিল। তাহার মনে বল ছিল না। আর সঙ্গে সঙ্গে তাহার দেহেও যেন বল ছিল না।

আশঙ্কায়—উৎকণ্ঠায়—উদ্বেগে রাত্রি কাটিল। কিন্তু কল্যাণীর আর চৈতন্যোদয় হইল না। নিশাশেষ হইতে তাহার চাঞ্চল্য আরও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। সে ঘন ঘন চমকিয়া উঠিতে লাগিল—যন্ত্রণায় ছটফট্ করিতে লাগিল। সরোজা তাহার মস্তক অঙ্কে লইয়া বসিয়া রহিল, তাহাকে ঔষধ সেবন করাইতে লাগিল আর তাহার পিপাসা-শুষ্ক ওষ্ঠাধরে জল দিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে তাহার চাঞ্চল্য অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিলে, সে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "কি, দিদি! কি কষ্ট হইতেছে?" কিন্তু সে সেই সস্নেহ জিজ্ঞাসার কোন উত্তর পাইল না। তাহার হৃদয় বিষম বেদনায় ব্যথিত—সে আর অশ্রুসম্বরণ করিতে পারিতেছিল না। আর সে ভাবিতেছিল, কল্যাণী তাহার কে? দুই দিনের পরিচয়ে সে তাহার একান্তই আপনার হইয়াছে! সে কেন তাহাকে পাইতে না পাইতে হারাইতেছে?

ক্রমে দিবালোকবিকাশ হইল। ডাক্তার আবার আসিলেন; দেখিয়া বলিলেন, রোগীর অবস্থা অত্যন্ত ভয়প্রদ।

সরোজা তাহা পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিল; কারণ, কয় ঘণ্টার পর কল্যাণীর চাঞ্চল্য কমিয়া আসিতেছিল। এই চাঞ্চল্য-নিবৃত্তি জীবনীশক্তি ক্ষয়ের লক্ষণ—জীবনান্তের পূর্ব্ববর্ত্তী।

কল্যাণী যেন ঘুমাইয়া পড়িতেছিল। তাহার মস্তক ক্রোড়ে লইয়া সরোজা আর তাহার পার্শ্বে বসিয়া যতীশচন্দ্র তাহার মুখপানে চাহিয়া ছিল, তাহার অবস্থার পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতেছিল।

অল্পকাল পরেই কল্যাণীর চাঞ্চল্য শেষ হইয়া গেল; সে

ঘুমাইয়া পড়িল। তাহার পর—তাহার পর তাহার শ্বাস গভীর হইতে লাগিল—ক্রমে শ্বাসপ্রশ্বাস বিলম্বিত—দীর্ঘ হইতে লাগিল—তাহার পর নিশ্বাস বন্ধ হইল।

সরোজা ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

যতীশ কম্পিত রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে "কল্যাণী" বলিয়া ডাকিল। তাহার পর তাহার সংজ্ঞাশূন্য দেহ পত্নীর শবের উপর পতিত হইল।

সরোজা কল্যাণীর মস্তক উপাধানন্যস্ত করিয়া স্বামীর মস্তক ক্রোড়ে তুলিয়া লইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

না।

গৃহে প্লেগ হইয়াছিল, সেই জন্য যতীশচন্দ্রকে গৃহান্তরে গমন করিতে হইয়াছিল যতীশ সেই গৃহের বারান্দায় বসিয়া ভাবিতেছিল। সে বিনিদ্র হইয়া দীর্ঘ রজনী ক্রন্দনে কাটাইতেছে, তখন তাহার হৃদয়ে ভাবনার অবকাশ ছিল না। আজ সে ভাবিতেছিল ;—যে বাঁচিয়া থাকিতে মনে হয়, তাহাকে ছাড়িয়া জীবনধারণ অসম্ভব, যাহার মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে বসিয়া মনে হয়, তাহার সঙ্গে মরিতে না পারিলে জ্বালা জুড়াইবে না, তাহাকে ছাড়িয়াও বাঁচিতে হয়। তখন জীবনের ভার বহিতে হয়। আর সঙ্গে সঙ্গে ভাবনার ভারও বাড়িয়া যায়। যতীশ আজ ভাবিতেছিল—অতীত—বর্ত্তমান—ভবিষ্যৎ কত দিনের কত কথা তাহার মনে পড়িতে লাগিল। তাহার ভাবনার শেষ নাই।

সরোজা কক্ষমধ্যে বসিয়া ছিল। কল্যাণীর পুত্র- তাহার পুত্র তাহার নিকটে বসিয়া খেলা করিতেছিল। সরোজা তাহার খেলানাগুলি গুছাইয়া দিতেছিল আর সে সেগুলি ছড়াইয়া ফেলিতেছিল—আর সরোজার দিকে চাহিতেছিল। মাতৃহীন শিশু—সে তাহার অবস্থা বুঝিতে পারে নাই ; কিন্তু পরিচিত গৃহ হইতে গৃহান্তরে আনিয়া আর জননীকে দেখিতে না পাইয়া সে যেন কি ভাবিতেছিল। সে কিছুতেই সরোজার কাছ-ছাড়া হইতেছিল না। আর সরোজা—সে-ও কিছুতেই তাহাকে কাছ-

ছাড়া করিতে পারিতেছিল না। আজ তাহার হৃদয়ে মাতৃস্নেহ [illegible] উঠিতেছিল। এই বিশ্বে সৃষ্টিরক্ষা-কৌশল দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। ভ্রমরকে আকৃষ্ট করিয়া এক ফুলের পরাগ অন্য ফুলে লইতে হয়—তাই ফুলের দলে সৌরভ—তাই কুসুম-গর্ভে মধু। আর বীজ রক্ষা করিবার জন্যই ফলের সৃষ্টি। বিহঙ্গীকে মুগ্ধ করিবার জন্য বিহঙ্গের অঙ্গে বিচিত্র বর্ণসঞ্চার—তাহার কণ্ঠে কাকলী। সেই জন্যই জোয়ারের সময় যেমন নদীবক্ষে জল উছলিয়া উঠে, যৌবনে তেমনই রমণী-হৃদয়ে প্রেম উচ্ছ্বসিত হয়। তখন ভালবাসিবার ও ভালবাসা লাভ করিবার জন্য—প্রিয়তমের নিকটে থাকিবার ও প্রিয়তমকে নিকটে পাইবার জন্য রমণী-হৃদয়ে যে ব্যগ্রতা আত্মপ্রকাশ করে, তাহার বেগ অনেক সময় রমণীর পরবর্ত্তী জীবন নিয়ন্ত্রিত করে। রমণী তখন প্রেমকেই ইহকাল-পরকাল-সর্ব্বস্ব বিবেচনা করিয়া থাকে। তাহার পর মাতৃস্নেহে সেই প্রণয়ের পরিণতি। আত্মত্যাগ তখন আত্মোৎসর্গে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। এই প্রেম—এই মাতৃস্নেহ রমণীর পক্ষে সহজাত সংস্কারেরই মত স্বাভাবিক—তাহারই মত প্রবল। ইহার আত্মপ্রকাশ অবশ্যম্ভাবী—হৃদয় বিকৃত বা বিচ্ছিন্ন করিতে না পারিলে ইহার আবির্ভাব-পথ রুদ্ধ করা যায় না।

সরোজার প্রেমতৃষ্ণা তৃপ্ত হয় নাই—উদ্ভিন্ন যৌবনেই সে স্বামি-প্রেমবঞ্চিতা—পতি-পরিত্যক্তা। কিন্তু সে ত হৃদয়ে প্রেমপ্রকাশ রোধ করিতে পারে নাই! সে যে সর্ব্বপ্রযত্নে যতীশকে নিরপরাধ প্রমাণ করিয়া প্রেমকে ভক্তিসীমায় আনিতে প্রয়াস পাইয়াছে!

সে ত কল্যাণীর স্বামি-সন্দর্শন-আহ্বান অবহেলা করিতে পারে নাই! সে প্রেম তাহার হৃদয়ে বদ্ধ হইয়া কূলে কূলে ভরিয়াছিল; পরিণতিপ্রাপ্তির সুযোগ পায় নাই। আজ কল্যাণীর পুত্রকে পাইয়া সেই লাঞ্ছিত—উচ্ছ্বসিত প্রেম পরিণতিপ্রাপ্তির পথ পাইয়া সাগ্রহে কখন্ সেই পথ অবলম্বন করিয়াছিল, সরোজা তাহা জানিতেও পারে নাই। কল্যাণীর বক্ষে স্বামীর সন্তানকে দেখিয়া যখন তাহার হৃদয়ে স্নেহ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল; সেই শিশুর মুখচুম্বন করিয়া—আপনার নিষ্ফল বক্ষে তাহাকে ধরিয়া সে যখন অননুভূতপূর্ব্ব অসীম সুখ অনুভব করিয়াছিল, তখনই তাহার অজ্ঞাতে তাহার প্রেম পরিণতির পথে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাই স্বামীকে দেখিয়া ফিরিবার সময় সে যখন কল্যাণীর পুত্রকে তাহার মাতৃবক্ষে ফিরাইয়া দিয়াছিল, তখন তাহার বক্ষে বেদনা বোধ হইয়াছিল। আজ এ শিশু তাহার। কল্যাণী শিশুকে তাহাকেই দিয়া গিয়াছে। কিন্তু কল্যাণী কিছু না বলিয়া যাইলেও সে তাহার পুত্রকে ফেলিতে পারিত না! কারণ, তখন কল্যাণীর পুত্র তাহার হইয়া গিয়াছে—তাহার রমণী-হৃদয়ের মাতৃস্নেহ তখন তাহাকে তাহারই করিয়া লইয়াছে। তাই সে শিশুকে কাছ-ছাড়া করিতে পারিতেছিল না। সে তাহাকে বক্ষে লইয়া তপ্ত বক্ষ শীতল করিতেছিল।

বারান্দায় পদশব্দ শুনিয়া সরোজা সেই দিকে চাহিল—মুক্ত দ্বারপথে দেখিল, রাধাচরণ বারান্দায় আসিল। যতীশ ভাবিতে-ছিল। সে রাধাচরণের আগমনবিষয় জানিতেও পারিল না।

তাহা লক্ষিয়া তাহার মনোযোগ আকৃষ্ট করিবার জন্য রাধাচরণ যখন জিজ্ঞাসা করিল, "আজ কি আফিসে যাইতে হইবে?"—তখন সে চমকিয়া উঠিল। রাধাচরণ আবার প্রশ্ন করিলে সে উত্তর করিল, "না। আজ যাইব না।"

রাধাচরণ যতীশচন্দ্রের পার্শ্বে উপবেশন করিল। রাধাচরণ গৃহে ফিরিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিল। আজ সে সরোজাকে লইবার জন্য আসিয়াছিল। কিন্তু এরূপ অবস্থায় সহসা কোন প্রস্তাব করিতে স্বভাবতঃই বাধ বাধ বোধ হয়; বিশেষ যতীশচন্দ্রের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া সে প্রস্তাব করিতে আরও ইতস্ততঃ করিতেছিল। যাহা হউক, কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া অন্য দুই একটি কথা বলিবার পর সে বলিল, "আমি আজই ইচ্ছাপুরে ফিরিয়া যাইব।"

যতীশ অন্যমনস্কভাবে বলিল, "আজ?"

রাধাচরণ বলিল, "হাঁ। তাই সরোজাকে লইতে আসিয়াছি।"

যতীশ রাধাচরণের দিকে ফিরিল। সরোজা দেখিতে পাইল—তাহার ম্লান মুখে সহসা পাংশুবর্ণ ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল; সে কোন কথা কহিতে পারিল না।

রাধাচরণ জিজ্ঞাসা করিল, "সরোজা কি এখন যাইবে, না অপরাহ্ণে যাইবে?"

যতীশ কি ভাবিতেছিল। সে উত্তর দিল না।

রাধাচরণ বলিল, "বৈকালে তাড়াতাড়ি করিতে হইবে। নীরজাও ব্যস্ত হইয়াছে। আমার সঙ্গে এখন যাইলেই হয় না?"

এবার যতীশ উত্তর দিল। সে কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "আমি আর কি বলিব? আমার বলিবার পথ নাই। কিন্তু—ছেলেটির -" সে আর কিছু বলিতে পারিল না। তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। সে কাঁদিতে লাগিল।

কক্ষমধ্যে সরোজা তাহার সহানুভূতিসিক্ত হৃদয়েও যেন ক্রন্দন শুনিতে পাইল; তাহার নয়নেও অশ্রু দেখা দিল।

যতীশের এই অবস্থা দেখিয়া রাধাচরণ কিছু বিব্রত হইয়া পড়িল। সে বলিল, "অত ছোট ছেলে 'মানুষ করা' পুরুষের পক্ষে কষ্টকর—বিশেষ আপনার অবসর কোথায়? আমার বোধ হয়, উহাকে উহার মাতুলালয়ে দিলেই ভাল হয়।"

রাধাচরণের কথা সরোজার হৃদয়ে তীক্ষ্ণ অস্ত্রের মত আঘাত করিল। সে বাঁচিয়া থাকিতে তাহার স্বামীর সন্তান কি সত্য সত্যই মাতৃহীন? সে কি কল্যাণীর শেষ অনুরোধ রক্ষা করিবে না? সে যে তাহাকেই তাহার সর্ব্বস্ব দিয়া গিয়াছে! আর তাহার হৃদয়ে কি মাতৃস্নেহ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল না?

যতীশচন্দ্র যেন আপনার মনে আপনি বলিল, "উহাকেও ছাড়িয়া থাকিতে হইবে!" সে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল। সে দীর্ঘশ্বাস যেন সরোজার হৃদয় বিদ্ধ করিল।

রাধাচরণ বলিল, "কি করিবেন; উপায় নাই।"

যতীশ কোন কথা কহিল না।

রাধাচরণ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বলিল, "চলুন, সরোজা কখন্ যাইবে—একবার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসি।" রাধা-

চরণ উদ্বিগ্ন কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। যতীশ তাহার অনুসরণ করিল।

নূতন লোক দেখিয়া বিস্মিত শিশু সরোজার অঞ্চল ধরিয়া রাধাচরণের দিকে চাহিল, তাহার পর যতীশকে দেখিতে পাইয়া অপর হস্ত প্রসারিত করিয়া তাহার বস্ত্র ধরিল।

রাধাচরণ সরোজাকে বলিল, "আমি আজ যাইবার ব্যবস্থা করিয়াছি।"

সরোজা একবার পুত্রের দিকে চাহিল। তাহার পর সে যতীশের দিকে চাহিল। যতীশের ম্লান মুখের বিবর্ণতা ও নত নেত্রের অনুনয়কাতর দৃষ্টিতে কি যেন তাহাকে আকৃষ্ট করিতেছিল। সে সহসা দৃষ্টি ফিরাইতে পারিল না। তখনই কল্যাণীর কথা তাহার মনে পড়িল—"দিদি, তোমার সর্ব্বস্ব—আমার সর্ব্বস্ব আমি তোমার হাতে দিয়া যাইতেছি। তুমি ইহাদের ফেলিয়া দিও না।" সে রাধাচরণকে বলিল, "তুমি যাও।"

রাধাচরণ বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "তুই যাইবি না?"

শিশু রাধাচরণের শেষ কথায় পুনরাবৃত্তি করিল—"না।"

সরোজার মনে হইল, সেই কথায় সে বিধাতার আদেশ শুনিতে পাইল। তাহার সকল সন্দেহ মিটিয়া গেল। সে বলিল, "না।"

রাধাচরণ সে দিন যাইবার পূর্ব্বে আবার সরোজার সহিত কথা কহিয়া গেল। ভগিনীর এই ভাগ্যপরিবর্ত্তনে তাহার আনন্দের আর সীমা ছিল না। যাইবার সময় সে যতীশকে